মরু সাহারায়

ন্যূড হলাম্বো

খালেকদাদ চৌধুরী

অনূদিত

ন্যূড হলাম্বো

মরু-সাহারায়

খালেকদাদ চৌধুরী
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

মরু-সাহারায়

ন্যূড হলাম্বো

খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত

ইফা প্রকাশনা : ৩০৫/১
ইফা গ্রন্থাগার : ৮৯১.৪৪৩
ISBN : 984-06-1175-5

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

তৃতীয় (ইফা দ্বিতীয়) সংস্করণ
মে ২০১০
জৈষ্ঠ্য ১৪১৭
জমাদিউস সানি ১৪৩১

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

শব্দ সংযোজনে : **আর.এম.ডট.কম**
২৩১ পূর্ব ধোলাইরপাড়, শ্যামপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৬০.০০ (ষাট) টাকা

MORU-SAHARAI (In the Desert of Sahara) : Bangla version by Khaleqdad Chowdhury of 'Desert Encounter', written by Knude Hollambo and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication Department, Islamic Foundation Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 May 2010

Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-mail : Islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk 60.00 ; US Dollar : 2.00

সূচিপত্র

যাত্রা হলো শুরু	৯
গুহাবাসী ও যাদুকর	২৫
ত্রিপোলীর উপর রোমান ঈগল	৪৩
লিবিয়ার মরু-প্রান্তরে	৫৭
সাহারার রহস্য–কুফ্‌রা	১১২
জেনারেল গ্রাজিয়ানী	১২২
বেদুইনদের বন্দী	১৩৩
কয়েদ ও নির্বাসন	১৫৩

প্রকাশকের কথা

বাংলা ভাষায় বিদেশী ভ্রমণ কাহিনীর অনুবাদের সংখ্যা একেবারেই কম। এর মধ্যে প্রখ্যাত লেখক অনুবাদক খালেকদাদ চৌধুরী অনূদিত 'মরু সাহারায়' গ্রন্থটিকে একটি অনন্য কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এ গ্রন্থটি ডেনিশ তরুণ নওমুসলিম মুহাম্মদ ন্যুড হলাম্বো লিখিত 'Desert Encounter'-এর অনুবাদ। জন্মসূত্রে খ্রিস্টান ন্যুড হলাম্বোর কাছে তরুণ বয়সেই খ্রিস্টধর্মের অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম গ্রহণ করেন। বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ন্যুড হলাম্বো ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পরিব্রাজক।

ইসলাম গ্রহণের সূত্রে তিনি আরবদের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বাইশ বছর বয়সে মরক্কো ভ্রমণে বের হন। এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয় তাঁর গ্রন্থ 'Between the Devil and the Deep Sea' পরবর্তীতে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিনি আরব আফ্রিকায় যান। এবার তিনি নিজের মোটরগাড়িতে করে মরক্কো থেকে ত্রিপোলি (লিবিয়া), সাহারা মরুভূমির ভেতর দিয়ে মিসর পর্যন্ত ভয়ংকর দুর্গম ও বিপদসংকুল পথ পাড়ি দেন। তার আগে কেউ মোটরে করে এ পথ পাড়ি দেননি।

উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অঞ্চল এ সময় ইতালীয় ও ফরাসী দখলে ছিল। স্বাধীনতাপ্রিয় আরবরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। অন্যদিকে দখলদার শক্তি তাদের দমনের জন্য গ্রহণ করে নির্মম পন্থা। ন্যুড হলাম্বো তার যাত্রাপথে আরবদের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট ইতালী কর্তৃপক্ষের নির্মমতা ও নৃশংসতার ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। বিশ ও ত্রিশের দশকে ইতালীয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বিধির কারণে বহির্বিশ্বের কাছে বর্বরতার সে অধ্যায় ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এ গ্রন্থের মাধ্যমে তা বহির্বিশ্বের কাছে উন্মোচিত হয় ও ইতালীয়দের মুখোশ খুলে পড়ে। মিসর থেকে তিনি হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফের পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জর্দানের আকাবার কাছে নৃশংস আরব দস্যুদের হাতে মাত্র ২৯ বছর বয়সে এই প্রতিভাবান ও উদ্যমী যুবক নিহত হন।

ন্যুড হলাম্বো না থাকলেও তাঁর অতুলনীয় পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধির ফসল এ মূল্যবান সাহিত্য কর্ম– ভ্রমণকাহিনী পরববর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যান। এ গ্রন্থে তাঁর ঈমানের দৃঢ়তা, ইসলামের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অবিচল আস্থা, মুসলিম আফ্রিকায় পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের বর্বরতার নগ্ন রূপ, স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত আরবদের প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতার দ্বিধাহীন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়, যা একে শুধু অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনীই শুধু নয়, উপরন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক মহিমময় মর্যাদা প্রদান করেছে।

এ বিষয়টি বিবেচনা করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি ১৯৮০ সালে নতুন করে প্রকাশ করে। প্রকাশের সাথে সাথে তা পাঠক সমাজের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। পাঠকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এটি পুনঃ প্রকাশ করা হলো। আশা করি, পূর্বের মতই গ্রন্থটি পাঠকদের সমাদর লাভ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা দেশ-জাতি-সমাজের জন্য কল্যাণকর গ্রন্থ প্রকাশে আমাদের সদিচ্ছাকে কবুল করুন। আমীন।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আমার সাহিত্য-জীবনে
প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম যাঁর কাছে, সেই
জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের
দস্ত মোবারকে

গ্রন্থকার-পরিচিতি

'মরু-সাহারায়' ন্যূড হলাম্বো নামক একজন নও-মুসলিমের লেখা Desert Encounter নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বাংলা অনুবাদ। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল ন্যূড হলাম্বোর জন্ম হয় ডেনমার্কের হরসেন্স শহরে। প্রথম জীবনেই তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছিলো সত্য, ন্যায় ও যুক্তির প্রতি একটা অসামান্য দৃঢ়তার মনোভাব। প্রচলিত জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করেও তিনি যা সত্য, যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয় বলে মনে করতেন সামাজিক বা অন্য কোন রকম ভয়, ভীতি বা প্রলোভনই তাঁকে সে ধারণা থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তাঁর চরিত্রের এ অসামান্য দিকটার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর ইসলাম গ্রহণে। এক সময়ে একটি ফরাসী আশ্রমে বাসকালে খ্রিস্টধর্মের ব্যর্থতা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হলাম্বোর পিতা ছিলেন ছোটখাটো একজন শিল্পপতি। কাজেই হলাম্বোর জীবন ছিলো প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠিত জীবনকে উপেক্ষা করে তিনি বেছে নিলেন ভ্রাম্যমাণ সাংবাদিকের কঠোর জীবন।

সাহিত্যচর্চায়ও অনুরাগ জন্মে তাঁর প্রথম জীবনেই। উনিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার কিছুকাল পরেই তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু।

তাঁর প্রথম ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হয় কোপেনহেগেনের বিখ্যাত এক পত্রিকায়। নরওয়ের উত্তর সীমান্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণের বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এতে। তারপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথমবার মরক্কো ভ্রমণে বের হন। সেখানেই তিনি তাঁর Between the Devil and the Deep Sea বইটি লিখেন।

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ন্যায়ের পক্ষপাতী। তাই আজীবন তিনি দুর্বল এবং উৎপীড়িতের পক্ষ সমর্থন করেছেন। রীফ যুদ্ধে মরক্কোবাসীদের প্রতি উৎপীড়ন, নির্যাতন ও তাদের অসীম দুঃখ-দুর্দশা তাঁর প্রাণে গভীর বেদনার সৃষ্টি করে। একে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যা দেন। তাছাড়া মূর সভ্যতাকে ধ্বংস করার মনোবৃত্তিকেও তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন।

ইসলাম গ্রহণের এক বছর পর তিনি এশিয়া মাইনর ও পারস্য ভ্রমণ করেন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি আফ্রিকায় আসেন। মরক্কো থেকে ত্রিপোলী, সিরিয়া ও সাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়ে মোটরে করে কায়রো ভ্রমণে বের হন। তাঁর আগে এই দুর্গম পথে মোটরে আর কোন ভ্রমণকারী ভ্রমণ করেন নাই। সেই ভ্রমণবৃত্তান্তই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় Desert Encounter নামে।

পরের বছর বসন্তকালে তিনি আবার এশিয়া মাইনরে যান। সেখান থেকে আরবদেশ ভ্রমণ করে মক্কায় হজ্জ করবার মনস্থ করেন। সেই বৎসরই ১৩ই অক্টোবর আকাবার কয়েক মাইল দক্ষিণে আরব দস্যুদল কর্তৃক তিনি নিহত হন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বৎসর।

নেত্রকোনা
১৪ই আগস্ট, ১৯৬০

খালেকদাদ চৌধুরী

যাত্রা হলো শুরু

সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম ভাঙলো। কুয়াশাচ্ছন্ন তিতুয়ান শহর ক্রমে ফরসা হয়ে আসছে। মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসছে আযান-ধ্বনি।

মুয়াযযিনের কণ্ঠধ্বনি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি করুণ ধ্বনি আমার কানে এসে বাজলো। মনে হলো একটি আরব-গৃহে কে যেন গান গাইছে। বড় করুণ–বড় কোমল সুর। কান পেতে আমি তা' শুনতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম এ শোক-গীতি। হয়তো মৃত পুত্রের জন্য কোনো পিতা শোক করছে; অথবা কোনো পুত্র তার পিতার মৃতদেহের কাছে বসে কাঁদছে। সন্ধ্যায় কালো রীফ পর্বতের পিছনে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন থেকে সারারাত এ কান্না চলছে।-------

ইউরোপীয় হিসাবে এইটিই আমার শেষ দিন। আর যাদেরে জানবার জন্য, যাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার জন্য এতো উৎসুক ছিলাম এই দিনটি তার প্রথম। দীর্ঘ দিন ধরে এদের সঙ্গে বাস না করে এদের জানবার উপায় নেই।

আমি মরক্কোবাসী আরবের পোশাক পরলাম। মুহূর্ত মাত্রে আরব বনে গেলাম। কেউ এখন আমায় সহজে চিনতে পারবে না। আমার গায়ের রং আর নীল চোখ বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারবে না, কারণ উত্তর মরক্কোর আরবদের গঠন প্রায় এইরূপ।

খুব তাড়াতাড়ি আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে, তাই আমার পাওনা চুকিয়ে দিতে হোটেলের কাউন্টারে গেলাম। হোটেলের বালক-ভৃত্য খুব ব্যস্ত ছিলো। তাজ্জব হয়ে অনেকক্ষণ সে আমার দিকে চেয়ে রইলো। অবশেষে সে চিনতে পারলো। বললো: আরব পোশাকে কেন হুযুর?

আমি তোদের দেশ ভ্রমণে যাচ্ছি।

অনেক বিপদে পড়তে হবে আপনাকে।

এই সময় দু'টি স্পেনীয় অফিসার সেখানে এলো। আগের দিন মাত্র এদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের ব্যবহার বেশ ভদ্র। এখন তারা আমায় চিনতেই পারলো না। আমি কাউন্টারে যে জায়গাটিতে ছিলাম তাদের প্রয়োজনও ছিলো সেখানে। কনুই দিয়ে ঠেলে তারা আমায় একপাশে সরিয়ে দিলো। বুঝলাম আমি এখন অপাংক্তেয়–কারণ এখন আমি মূর। এরূপ ব্যবহারই আমার প্রাপ্য।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো রীফ-নেতা আবদুল করীম সম্বন্ধে একটি গল্প। একদিন একটি স্পেনীয় অফিসার তাঁর কানে ঘুষি মেরেছিলো। তিনি অপমানে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মুর বিপ্লবীদের আক্রমণ স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবার উপক্রম করেছিলো। স্পেনীয় বাহিনীকে সেদিন সমুদ্রের অতল তলে ডুবে মরতে হতো যদি না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্শালের পরিচালনাধীনে ফ্রান্স তার এক বিরাট বাহিনী দিয়ে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো।

আমি আমার গাড়ী আনতে গ্যারেজে গেলাম। তিন শো পঁচাত্তর মাইল একটানা চলবার মতো পেট্রোল গাড়ীতে ভর্তি করে হোটেলে ফিরে এলাম। ভৃত্য বললো, একজন আরব আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই সে লোক। আমি ঘুরে আগন্তুকের দিকে চাইলাম। মরক্কোবাসী এক যুবক কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার কাছে এগিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো: আপনি আলজিরিয়া হয়ে তিউনিস যাচ্ছেন, সিদি?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি করে তা জানলে?

শহরে জানতে পারলাম। আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

কি করে যাবে?

আমার টাকা নেই, গাড়ীতে আপনার সাহায্য করতে পারি। আমি তিউনিস যেতে চাই।

তোমার নাম?

আবদুস সালাম।

বয়স?

উনিশ।

এখানে তোমার কেউ নেই?

না। আমার বাবা আবদুল করীমের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। মার নিকাহ হয়ে গেছে আর একজনের সঙ্গে।

তাকে বেশ তেজস্বী বলে মনে হলো। তাই পথের সাথী হিসাবে তাকে সঙ্গে নিলাম। তাছাড়া তিউনিসের পর্বতমালা আর মরুভূমির ভিতর দিয়ে আমার ভ্রমণের প্রথম অংশটি বেশ আনন্দদায়কও হবে। জিজ্ঞেস করলাম: পাসপোর্ট আছে তোমার?

আবদুস সালাম মাথা নেড়ে পাসপোর্ট দেখালো। ঠিক আছে। ত্রিপোলী পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধাই হবে না।

নয়টার সময় আমরা রওনা হলাম। স্পেনীয় ও ফরাসী সংরক্ষিত ফেজ দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে আলজিরিয়া সীমান্তে উজদা পর্যন্ত এভাবে যাওয়া ঠিক করলাম। আমার প্রকৃত ভ্রমণ সেখান থেকেই শুরু হবে। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে রওনা

হয়ে এটলাস পর্বত পার হয়ে উত্তর সাহারার ফিগিগি মরূদ্যানে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

নিতান্ত দরকারী জিনিস ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নেই নাই। আমাদের কোনো তাঁবু ছিলো না। অবশ্য একটি কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা করি নাই। প্রথম ক'দিন তার প্রয়োজনও হবে না, কারণ দক্ষিণে এট্‌লাস পর্বত আর উত্তরে রীফ্ পর্বতের মধ্যবর্তী মরক্কোর উর্বর উপত্যকায় ছোট-বড় অনেক শহর আছে।

দু'টার সময় আমরা সীমান্ত অতিক্রম করলাম। এখান থেকে মরক্কোর রাজধানী ফেজের দিকে পূর্বমুখী গাড়ী চালালাম। পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়ে পথ। গাঢ় বরফের উপর দিয়ে আমাদের অনেক সময় চলতে হয়েছে। পাঁচটায় ফেজে পৌঁছলাম। গাড়ী থামালাম শহরের বাইরে।

সেদিন সন্ধ্যায় ফেজে ইসাওভী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে শুনলাম। ইসাওভী সম্বন্ধে কিছুই জানাতাম না। যে গৃহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কোন ইউরোপীয়েরই সেখানে যাওয়ার অধিকার নাই। কিন্তু আমার জন্য এখন অবারিত দ্বার।

ফেজ শহরের এ সংকীর্ণ গলির এক বাড়ির খোলা আঙ্গিনায় উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আঙ্গিনার এক কোণে আগুন জ্বলছে; তার আলোতে উপস্থিত লোকদের ছায়া বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

উৎসব আরম্ভ হওয়ার আগেই আমি সেখানে উপস্থিত হই। অনেকেই তাদের নিজ নিজ তাম্বুরার চামড়া আগুনে তাতিয়ে নিচ্ছে। আঙ্গিনার কিনারা ঘেঁষে দর্শকের ভিড় জমেছে।

পনর থেকে আশি বছরের দশ বারোটি লোক বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতে একটি করে তাম্বুরা। একসঙ্গে সবাই তাম্বুরা বাজিয়ে গান গেয়ে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগলো:

তোমার বৃহৎ সত্তা।
আমার মানুষের মন দিয়ে বুঝতে
আমায় সাহায্য কর, হে আল্লাহ!

তোমার পাক দুনিয়ায়
আমায় তুমি দাস করে নাও, হে আল্লাহ!

আমার সকল সত্তা দিয়ে
তোমার নির্দেশ শুনবার জন্য
আমার কর্ণদ্বার খুলে দাও, হে আল্লাহ!

তোমার সেবায়
তোমার সেবক করে নাও,
তোমার নিজস্ব সেবক,–হে আল্লাহ!

তোমার কুল্ মখ্লুকের উপর
প্রভুত্ব করবার ইচ্ছাকে
ধূলায় মিশিয়ে দাও, হে আল্লাহ!

গানের প্রত্যেকটি লাইনের শেষে তাম্বুরায় ঘা দিয়ে তারা ঘুরতে লাগলো–যেনো তারা সে গানের কোনো শব্দ বা তার মানে বুঝতে পারছে না– তালটিই শুধু তারা শুনতে পাচ্ছে।

বার কয়েক গানটি গাওয়া হলে এক বৃদ্ধ তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। সবাই বসে পড়লো। বৃদ্ধ সুর করে তালে তালে চিৎকার করছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। সবাই সমস্বরে তা উচ্চারণ করছে–প্রথম খুব ধীরে ধীরে। প্রতি একশত বার উচ্চারণের পর খুব দ্রুত উচ্চারণ করতে থাকে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরে সবাই উন্মত্তের মতো চিৎকার করতে লাগলো। বিদ্যুৎগতিতে তারা তাদের মস্তক আন্দোলিত করতে লাগলো–শরীরও তাদের দুলতে লাগলো। হঠাৎ বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো বৃদ্ধ লোকটি ও একটি ছোট ছেলে।

হাজারবার তারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" উচ্চারণ করলো। তারপর আবার শুরু করলো প্রথম থেকে। দুইজন নর্তকের মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসছে। অবশেষে বৃদ্ধ লোকটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কয়েকজন লোক তাকে ধরাধরি করে সরিয়ে নিলো।

দর্শকদের মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ লোক ছিলেন। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে মাঝে মাঝে তিনি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ছিলেন। আমি তাঁকে এই নাচের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম।

তিনি বললেন: এই লোকগুলিকে মোটেই আমি বুঝতে পারি না। এরা কেউ ইসলামের বিধান পালন করে না। ইসলামের সঙ্গে এ-নাচেরই বা কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

কিন্তু তারা হাজার বার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" উচ্চারণ করলো কেন?

এরা বুজুর্গ পীর বিন্ইসাও মেক্কোনীকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছে। তাঁর শিক্ষা ছিলো, আল্লাহর নাম অনবরত উচ্চারণ করলে অন্তরে তাঁর মূর্তি অঙ্কিত হবে। এদের ধারণা যে হাজার বার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" উচ্চারণ করলেই তারা বেহেশ্তে যাবে। এ বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ই জানেন উত্তর আফ্রিকার কী দশা হবে! ইসলামের পবিত্র শিক্ষার কদর করা হচ্ছে না এখানে।

বলে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

অন্তর দিয়ে আল্লাহর নাম একবার বলাও এর চেয়ে ঢের ভালো।

পরদিন ভোরে রওনা হবার আগে মসজিদে গিয়ে নামায পড়লাম। ফেজের কোন মসজিদে কোন ইউরোপীয়কে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমায় কেউ বাধা দেয় নাই। যথারীতি জামাতের সঙ্গে নামায পড়া হলো।

এক ঘন্টা পর ফেজ ত্যাগ করে উজ্‌দার দিকে রওনা হলাম। পথ এতো সোজা ও ভালো যে দুঘন্টার মধ্যেই আমরা উজ্‌দা পৌঁছে গেলাম। পরক্ষণেই আমরা দক্ষিণ দিকে গতি পরিবর্তন করলাম। এট্‌লাস পর্বতের উত্তর দিকে এক ছোট মরূদ্যানে এসে সন্ধ্যা হলো–এখান থেকেই শুরু হবে আমাদের মরু-যাত্রা।

এখান থেকে পেট্রোল নিয়ে পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই একশো পঁচিশ মাইল দূরবর্তী সাহারার মরূদ্যান ফিগিগি রওনা হলাম। আসমানে তখনো চাঁদ ছিলো। কয়েক মিনিট পরই পর্বত চূড়ার পিছনে প্রদোষের গোলাপী আভার প্রথম বিকাশ দেখা দিলো। ভীষণ শীত। বালুকারাশির উপর গাঢ় কুয়াশা।

সব নীরব। একটি মেষরক্ষক ফজরের নামায পড়ছিলো। আমাদের দিকে সে ফিরেও তাকালো না। কন্‌কনে শীত। সূর্য অনেকখানি উপরে উঠলে তবে বালুকারাশির উপর থেকে গাঢ় কুয়াশা অন্তর্হিত হলো। কিন্তু আকাশ ছিলো স্বচ্ছ পরিষ্কার।

মাইলের পর মাইল চলেও জনমানবের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দও এ পর্যন্ত শোনা যায় না। পথের অবস্থা ভালো নয়, বিশেষ করে পর্বতে তা ভীষণ খারাপ। গভীর গর্ত আর বড় বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে পথ করে চলছি। নদীগুলিতে পানি রয়েছে–স্রোতের বেগ খুব প্রবল। মাঝে মাঝে মনে হয় এই সব খরস্রোতা নদী পার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পানির গভীরতা অত্যন্ত কম। জুতা খুলে পায়ে হেঁটে একবার পার হয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। তারপর গাড়ী পার করে নিলাম। ইঞ্জিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে যাওয়া সত্ত্বেও পূর্ণবেগে গাড়ী চালিয়ে নদী পার হয়ে এলাম।

আরও কয়েক মাইল এগিয়েই প্রকৃত বরফ দেখা গেলো। সূর্যের তেজে তা গলে অনেকটা পাতলা হয়ে আসছে, কোনো রকমে এগিয়ে চলেছি। চার ঘন্টা পর আমরা কিবিলি ত্যাগ করলাম। এট্‌লাস পর্বতের শাখার উচ্চ-ভূমিতে পৌঁছলাম। বন্ধুর পথ এখান থেকে খাড়া ঢালুর দিকে চলে সীমাহীন অনন্ত বালু-সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এখানে এসেই পথ শেষ হয়ে গেছে। মানচিত্র খুলে দেখলাম ফিগিগি মরূদ্যান বহু মাইল দক্ষিণে। পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু মোটরের চাকার পাঁচ জায়গায় ফুটো হয়ে যাওয়ায় তা মেরামত করতে ঘন্টা দুয়েক এক স্থানে থামতে হলো।

কিছুদূর পর পর রাস্তার অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। সামনেই পথের মাঝে পাথরের বড় বড় টুকরা। তার পাশ কাটিয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

সূর্যাস্তের সময় এক কাফেলা নযরে এলো। উটগুলি ধীরে শাহী চালে এগিয়ে আসছে। গাড়ী থামিয়ে বেদুইনদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। তারা ফিগিগি থেকে কিবিলির বাজারে যাচ্ছে।

কাফেলার সরদারের দেহ শক্তিশালী, মজবুত ও উন্নত। তার শান্তস্থির চোখে মরু জীবনের দৃপ্ত প্রতিচ্ছবি। তার দুই স্ত্রী একটা উটের পিঠে তাঁবুতে বসে আছে। চার পাঁচটি নগ্নপদ ছেলেমেয়ে উটগুলির পাশে ছোটাছুটি করছে। এই সব উট বোঝাই করে বহু মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে বাজারে বিক্রি করতে।

ছেলেমেয়েদের আমন্ত্রণ জানালাম মোটরে চড়বার জন্য। অনেক সাধাসাধির পর তাদের গাড়ীতে চড়াতে সমর্থ হলাম। সবার বড় ছেলেটি তালায় হাত দিয়ে দরজা বন্ধ করতে আমার নিষেধ করলো। বৃত্তাকারে কয়েক মিনিট চালিয়েই দেখি গাড়ী শূন্য। ভয়ে তারা লাফিয়ে পড়েছে মোটর থেকে।

সরদার তার প্রধান উটে চড়ে তার ছোট লাঠি দিয়ে উটের মাথায় মৃদু আঘাত করলো। কাফেলা চলতে লাগলো। ছেলেরা হৈ হুল্লোড় করতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেলা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সূর্য অস্ত গেলো। প্রতি মুহূর্তে পথ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। শীঘ্রই ভীষণ অন্ধকার হয়ে এলো। হেড লাইট জ্বেলে দিলাম। দূর বালুকারাশির উপর আলো ছড়িয়ে পড়লো। মাঝে মাঝে আলোতে দেখতে পেলাম হায়েনার দল স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমরা কাছে যেতেই এক লাফে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। তাদের উজ্জ্বল চোখ আমাদের গতিপথের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে।

কিছুদূর এগিয়েই বামদিকে বহু দূরে একসার আলো দেখা গেলো। এ আলো ফিগিগি থেকে আসতে পারে না। কারণ গতিমান যন্ত্রে ফিগিগি তখনো আরো ষাট মাইল দূরে। আমরা সেদিকেই ঘুরলাম। খানিক পরেই দেখতে পেলাম চারটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। যতোই এগিয়ে চলেছি ততোই ভীষণ শব্দ কানে আসতে লাগলো। হঠাৎ একদল হল্‌দে রং-এর বড় কুকুর আমাদের দিকে ছুটে এসে গাড়ীতে লাফিয়ে উঠতে চাইলো। আমরা তাদের লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। হেড লাইটের আলোতে অগ্নিকুণ্ডের পিছনে একসার তাঁবু দেখতে পেলাম।

কয়েকটি লোক আমাদের কাছে এলো। হাতে তাদের রাইফেল–আঙ্গুল টিগারের উপর। আমরা থামলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কুকুরদের সাথে হাতাহাতি লড়াই শুরু হলো। খানিক পরেই তারা একটু পিছিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা একটু নড়লেই তারা চিৎকার করে উঠে। দলের শেখ দুইজন লোকসহ মোটরের কাছে এলেন।

আমাদের আরব পোশাকে দেখেই আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে আমাদের অভিনন্দন জানালেন। 'ওয়ালাইকুমুস সালাম' বলে আমরা তার জবাব দিই। দূরে নীরবে দাঁড়িয়ে যারা আমাদের লক্ষ্য করছিলো, এ দেখে তারা কুকুরদের তাড়া করলো। তারা আমাদের মেহমানরূপে দাওয়াত জানালো। এখন আমরা তাদের তাঁবুতে, কেউ আমাদের আর অনিষ্ট করতে পারবে না।

আমরা কোথা হতে আসছি এবং কোথায় যাবো শেখ তা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে আমরা বললাম যে, আমরা ফেজ থেকে আসছি আর যাবো ফিগিগি, কিন্তু এটাই ঠিক রাস্তা কিনা সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই।

হ্যাঁ, আল্লাহর নামে বলছি আপনারা ঠিক পথেই এসেছেন। কিন্তু আপনি তো আমাদের মতো করে কথা বলতে পারেন না। কোথাকার লোক আপনি?

আমি বললাম যে, আমি দেনমার্ক দেশের লোক। এখান থেকে আরব ও হেজাজে যাবো।

তিনি মুচকি হাসলেন।

আল্লাহকে ধন্যবাদ যে আপনি পবিত্র মক্কায় যাচ্ছেন। আপনি বড় ভাগ্যবান ব্যক্তি, আপনি হযরত মুহম্মদ (সা)-এর পবিত্র জন্মস্থান দেখতে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার দেশ কোথায়? সে দেশের লোক কি সাচ্চা মুসলিম?

আমি তাঁকে বললাম যে, সে দেশ বহু দূরে–উত্তরে যে দেশে শীতকালে দিন কয়েক ঘন্টা মাত্র।

শেখ মাথা নাড়লেন। আমি বললাম: হয়তো সে দেশে আমিই একমাত্র মুসলিম।

স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েই কি তবে আপনি এখানে এসেছেন?

না, সে দেশের লোক তার ইচ্ছা মতো যে-কোন ধর্ম-গ্রহণ করতে পারে। ধর্মান্তর গ্রহণ করলে তাকে শাস্তি পেতে হয় না।

তা হলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কেন?

মুহম্মদ (সা)-র শিক্ষা অনুসরণ করলে প্রকৃত সুখ ভোগ করা যায় বলেই আমি বিশ্বাস করি।

আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি সেই সুদূর উত্তর অঞ্চলেও সত্যের আলোক সম্পাত করেছেন। আজকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে।

আমায় তিনি সমাদর করে তাঁর সবচেয়ে বড় তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। তাঁবুর ভিতর মস্তবড় একটা কার্পেট ও অনেকগুলি ভেড়ীর চামড়া। তাতেই আমরা বসলাম।

সারা ক্যাম্পে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেলো। সমস্ত ছেলেমেয়ে এসে গাড়ীর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো। শেখ তাদেরে দূরে দূরে যেতে বললেন। শেখের প্রতি তাদের এতো প্রগাঢ় শ্রদ্ধা যে মোটর দেখার অদম্য কৌতূহল সত্ত্বেও তার সে নির্দেশ তারা অমান্য করলো না। তারা তখন তাঁবুর ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখতে লাগলো।

শেখের পাশেই আমাদের বসতে দেওয়া হলো। তাঁর ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। আমরা চুপ করে গোল হয়ে বসলাম। কেউ কথা বলেনি। কেউ একজন প্রথম আলাপ শুরু করুক সবারই সে ভাব।

নীরবতা ভাঙবার জন্য আমি আমার সিগারেট কেস খুলে সকলের সামনে ধরলাম। সবাই মাথা নাড়লো। তারা কেউ সিগারেট খায় না। আমি আশ্চর্য হয়ে শেখকে জিজ্ঞেস করলাম: ধূমপান কি আপনাদের নিষিদ্ধ?

জওয়াবে তিনি বললেন: না, ধূমপান না করাকেই আমরা ভালো মনে করি। এসব খেয়ে আল্লাহর দেওয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করবো কেন?

তাই বলে জীবনের সকল আনন্দ থেকে বিরত থাকা কি ভালো?

এটাকে আমি জীবনের সব আনন্দ বলে মনে করি না। বরং আমার ধারণা যে আমি যদি ধূমপান করি তাহলে জীবনের অনেক আনন্দ থেকেই আমি বঞ্চিত হবো। আচ্ছা, আপনি বলছিলেন যে, আপনার দেশে বছরে এক সময় সূর্য মাত্র দু'ঘন্টার জন্য উদয় হয়, সে কি রকম?

এ কথাটা যেনো তিনি ভুলতে পারছেন না।

একজন বেদুইন মুচকি হেসে বললো: আপনার দেশে তাহলে রোযা রাখা তো খুব সহজ।

আমার দেশের উত্তরে আর একটি দেশ আছে যেখানে বৎসরে পুরো একটি মাস সূর্য অস্ত যায় না। তারও উত্তরে ছ'মাস দিন–আর ছ'মাস রাত।

শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠলো। মনে হলো অতিথির প্রতি ভদ্রতার খাতিরেই যেনো তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে বিরত থাকছে।

আমি প্রশ্ন করলাম: যে দেশে কোনোদিন সূর্য উঠেনি, যেখানে ভীষণ শীত আর গাঢ় অন্ধকার–সে দেশে আপনারা রোযা রাখবেন কি করে বলুন?

বেশ মনোজ্ঞ আলোচনা শুরু হলো। একজন বললো: সূর্য না উঠলে তো শীতে রোযা রাখাও স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।

আলোচনা অনেকক্ষণ ধরে চললো। বললাম: আপনারা জানেন সৌর-বৎসর আর চন্দ্র-বৎসরে কোনো সামঞ্জস্য নেই। এমনও তো হতে পারে যে, যখন ছ'মাস আকাশে সূর্য থাকে তখন রমযান আসতে পারে, তখন কি করবেন?

এক তরুণ বেদুঈন বললো: তখন না খেয়ে মরতে হবে আর কি?

শেখ এবার আলোচনায় যোগ দিলেন। বললেন: আমি বিশ্বাস করি যে, মেহমান যা বলছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। তোমরা কি দেখছো না যে গ্রীষ্মকালে দিন বড় আর শীতকালে তা ছোট? কুরআনের গভীর জ্ঞানগর্ভের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? স্বাস্থ্য যদি খারাপ হয় তাহলে রোযা রাখতে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য-সম্পন্ন লোক তৈরীর জন্যই কুরআনে এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রমে উত্তর দিকে গেলে,

ছোট দিনে রোযা কম রাখতে হবে সত্য কিন্তু দিন যখন বড় তখন মক্কার দিনের অনুপাতে বারো ঘণ্টা করে রোযার সময় নির্দিষ্ট করে দিলেই হয়।

শেখের কথায় সবাই একমত হলো। অনেকের ধারণা যে মক্কার অনুপাতে ছ'টা থেকে ছ'টা পর্যন্ত দিন গণনা করলেই হয়।

শেখের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম।

পরদিন বিকাল চারটায় সদাশয় মেজবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিগিগির দিকে রওনা হলাম।

রাস্তায় খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। ঘন ঘন মোটরের টায়ার ফুটো হতে লাগলো। রাত যখন খুব বেশি অন্ধকার হয়ে উঠলো আমরা মোটরেই শোয়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় হেড্ লাইটের আলোয় বালুকারাশির উপর একটা পথ-নির্দেশক থাম দেখতে পেলাম। আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা এক ঘুমন্ত শহরে এসে উপস্থিত হলাম। খানিকক্ষণ মোটর চালিয়েও কোনো জনমানবের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। তারপর একটি লোক দেখতে পেলাম। তার কাছে জানতে পারলাম যে ফিগিগি শহরে কোনো হোটেল নেই। সবচেয়ে কাছে যেটি, সেটি হচ্ছে তিন মাইল দূরে আলজিরিয়ার ওউনিফ শহরে।

গভীর অন্ধকারেই আমরা মরক্কো ও আলজিরিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করলাম। মোটরটি সম্পূর্ণ মেরামত করবার জন্য চৌদ্দ দিন ওউনিফে থাকতে হবে। কারণ, তার পরই সুদীর্ঘ মরুভূমি পার হয়ে আমাদের টার্গাট যেতে হবে। কিন্তু নানা কাজে ও একটা তাঁবু কিনবার জন্য আরো কয়দিন বাধ্য হয়ে সেখানে থাকতে হলো।

অবশেষে একদিন সকালে আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিলাম না। বেদুইনদের মতো কিছু খেজুর আর মোরগের বাচ্চা নিলাম। আর নিলাম চারটা শূন্য পেট্রোলের টিন ভর্তি খাবার পানি। গাড়ীর পিছনে ভর্তি করলাম অতিরিক্ত টায়ার, তৈল ও পেট্রোলের টিন আর এক ড্রাম ভর্তি পেট্রোল। এতে করে সহজেই আমরা ছ'শো মাইল পথ চলতে পারবো।

কয়েক মাইল রাস্তা বেশ ভালোই ছিল। তারপর পথের আর কোনো চিহ্ন নেই। কম্পাসের সাহায্যে আমরা উত্তরমুখী চলতে লাগলাম। সেদিকে একশো পঁচিশ মাইল দূরে একটি মরূদ্যান আছে।

চলা ক্রমেই কমেই কঠিন হয়ে আসছে। এখানকার মরুভূমিটি একটু আলাদা ধরনের। বিস্তৃত সমতল ভূমি জুড়ে বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে–আর লম্বা তীক্ষ্ণধার কণ্টকময় গাছপালায় সেইসব পাথর ঢাকা। আশ্চর্য হলেও এখানে পানীয় জল প্রচুর পাওয়া যায়। সমতল ভূমিটি ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে। উপরের পাহাড় থেকে অনেক নালা বেরিয়ে এসেছে। তা পার হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই সব নালার তল খুব শক্ত এবং কোনটিতেই দু'তিন ফুটের অধিক পানি নেই। সহজেই তা পার হয়ে গেলাম।

বেলা প্রায় তিনটার সময় আমাদের বড় শত্রু হালকা বালুতে এসে পড়লাম। মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত হয়ে যায় এবং কোথাও বা উঁচুনীচু হয়ে যায়। এইসব সুন্দর বালির উপর দিয়ে চলতে গিয়ে মোটরের চাকা অনেক খানি ডেবে যায়। মাঝে মাঝে আমাদের নেমে যেতে হয়। আবদুস সালাম নেমে গিয়ে গাড়ি ঠেলে পিছনে নিয়ে যায়। দু'বার গাড়ির চাকা এমনভাবে বালিতে ঢুকে যায় যে গাড়ি আর কোনদিকেই চালানো সম্ভব হয় নাই। চালাতে গেলে চাকাই শুধু ঘোরে। শেষে গাছের ডাল, আমাদের কম্বল, শুকনো ঘাস চাকার নীচে দিয়ে তবে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি।

বেলা অনুমান চারটার সময় বাতাস উঠলো। প্রথমে বাতাস বেশী টের পাই নাই। উঁচু স্থানগুলির সুন্দর বালু-গুড়ো তুষারের মতো উড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশ জ্বলন্ত আগুনের মতো লাল হয়ে উঠলো। বাতাস বইছে সেদিক থেকে। সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে। বালুকারাশি তার সামনে উঁচু পর্বতের মতো জড়ো হতে লাগলো। কালো দেয়ালের পিছনে মাটিরাঙা মলিন আলোকের মতো দেখাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সে রং উবে গেলো। সব অন্ধকার হয়ে এলো। বালুকারাশি একটা প্রাচীরের মতো আকাশের দিকে উঠতে লাগলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে শুরু হলো ঝড়। পর মুহূর্তে বালুকারাশি আমাদের চারদিকে মেঘের মতো ঘিরে শ্বাস বন্ধ করে দেবার উপক্রম করলো। চারদিকে বাতাসের গর্জন। বালুকণার প্রচণ্ড হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেলাম। মোটর চালানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। কম্বল মুড়ি দিয়ে গাড়ির ভিতর লুকালাম। লুকাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বালু ঢুকতে লাগলো। এ সত্ত্বেও মুখ আর চোখ বাঁচাতে সমর্থ হলাম। যেমন হঠাৎ করে বালুর ঝড় শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাৎ তা থেমে গেলো। আমাদের চারদিক থেকে চলন্ত বালুর পাহাড় সরে পড়লো। দূরে তা মিলিয়ে যাবার আগেই ডুবন্ত সূর্যের আলোয় তা যেনো জ্বলে উঠলো।

আশ্চর্য রকম সুন্দর সে সূর্যাস্ত!

আসমানের সীমান্ত রাঙা হয়ে উঠেছে। দিক-দিগন্ত, এমন কি, যে অন্তহীন বালুকারাশির উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে চলছি তাকেও রক্তরঞ্জিত লাল সমুদ্র বলে মনে হচ্ছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সব হিম হয়ে আসছে। একটা শান্ত শ্বেত কুয়াশার জাল সমস্ত ঢেকে ফেলেছে। হেডলাইট জ্বালানো সত্ত্বেও কিছুই দেখা যায় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের থামতে হলো, এবং আশ্রয়ের সন্ধান করতে হলো।

শীতে দেহ অবসন্ন অবস্থায় ঘুম ভাঙলো। কুয়াশার জাল ভেদ করে লাল বলের মতো সূর্য উঠলো। কোট আর কম্বল দিয়ে সারা দেহ ঢেকে আমরা রওনা হলাম। ঠাণ্ডায় আঙ্গুল নীল হয়ে উঠেছে।

পরদিন দশটায় সীমারেখায় ধূয়া দৃষ্টগোচর হলো। নিকটে এসে দেখতে পেলাম একটা উঁচু পাহাড়ের নিচে কয়েকটি লোক একটা অগ্নিকুণ্ডের চারদিক ঘিরে বসে আছে। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গর্ত। এরা গুহাবাসী পাহাড়ী লোক।

অগ্নিকুণ্ডের খানিক দূরে মোটর থামিয়ে গুহাবাসীদের কাছে গেলাম। তারা আমাদের আগমন টের পায়নি। সাদা দাড়িওয়ালা একটি লোক–যাকে সেই ছোট জাতির নেতা বলে মনে হলো– আমাদের দেখে মাথা নাড়লো এবং হাত দিয়ে আগুনের পাশে বসতে ইংগিত করলো। এই আশ্চর্য ধরনের লোকগুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। এদের আরব বলে মনে হলো না। ভাষাও ওদের আরবী নয়। এট্‌লাস পর্বতের দক্ষিণস্থ বারবারদের ভাষা বলে মনে হলো। তাদের দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ, গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। তাদের দেখে নিগ্রো বলেও মনে হয় না। কারণ ওদের ঠোঁট পাতলা, শরীরের গঠনও কাফ্রিদের মতো নয়।

বৃদ্ধ লোকটি আগুনের কাছে কুঁজো হয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ সে নীরবে বসে রইলো। তারপর অগ্নিকুণ্ডে গাছের একটা ডাল ফেলে তা একমনে দেখতে লাগলো। আমাদের আগমনে তারা যেনো বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য বা বিচলিত হয় নাই। তাদের চেহারা দেখে তা বেশ বুঝা যায়। মেয়েদের চেহারা বেজায় কুৎসিত। একটু বেশি করেই তারা তাদের মুখ ঢেকে রেখেছে।

বৃদ্ধ লোকটি একটি অতি পুরাতন জং-ধরা ভাঙা কেট্‌লি হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। নীচের ছিদ্র দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। একটা লোহার শিক দিয়ে সে তা আগুনের উপর রাখলো। এবার সে আমার দিকে চেয়ে আরবীতে কথা বললো।

কোথা থেকে আসছেন আর কোথায়ই বা যাবেন আপনারা?

ফিগিগি থেকে আসছি, যাবো টাগার্টে–আমি বললাম।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লো। আমাদের সঙ্গে কথা বললেও কেটলির পানি যাতে উতলে পড়ে না যায় সেদিকে তার দৃষ্টি ছিলো।

এর একটিও আমি চিনি না। আপনি খুব দূরে যাবেন?

হাঁ, টাগার্ট এখান থেকে ছ'শো মাইল দূর।

বৃদ্ধ আমার দিকে চাইলো। বললো: আমার জীবনে একবার মাত্র এখান থেকে একদিনের পথ গিয়েছিলাম। দুনিয়া সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। কেট্‌লির পানি ফুটতে শুরু হয়েছে। বৃদ্ধ তাদের ভাষায় একটি স্ত্রীলোককে কি বললো। সে ভাষা আমার দুর্বোধ্য। খানিক পরে একটা গ্লাস নিয়ে স্ত্রীলোকটি ফিরে এলো। গর্বিতভাবে বৃদ্ধ গ্লাসটির দিকে চাইলো। তাদের পরিধানের সমস্ত পোশাক ছিলো মেয়েদের তৈরি।

স্ত্রীলোকটির হাত থেকে তা নিয়ে সে চা তৈরি করতে লাগলো। বললো: চা খাবেন নিশ্চয়ই?

আমরা রাযী হলাম। অগ্নিকুণ্ডের অদূরেই কয়েকটি মুরগী ছোটাছুটি করছে। একটি মুরগী বেচবে কিনা বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলাম। বৃদ্ধ একটি মুরগী দিতে রাযী হলো কিন্তু দাম সে কিছুতেই নেবে না। আমি তাকে আমার গাড়িতে আসতে রাযী করলাম এবং

জিনিস-পত্র দেখিয়ে যে কোনো একটি নিতে তাকে অনুরোধ করলাম। মরক্কোর কারুকার্য খচিত একটা ওয়েস্টকোট তিনি পছন্দ করলেন।

এদের বাসগৃহ দেখবার সুযোগ আমার হলো না। তা পাহাড়ের ভিতর অবস্থিত। হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে এতেই তারা বাস করে আসছে। গুহাগুলি বাস করবার উপযোগীই বটে। এই সব গুহা দিনের বেলা ঠাণ্ডা আর রাত্রে গরম থাকে।

আমরা রওনা হলাম। গুহার অল্প দূরেই তাদের পানীয় জলের কূপ দেখতে পেলাম। কূপটা মাত্র ত্রিশফুট গভীর। বৃদ্ধ আমাদের বললো যে, এতে প্রচুর পানি বছরের প্রায় সব সময়ই থাকে। এই কূপটিই এই গুহাবাসী ক্ষুদ্র জাতির প্রাণ। একটা ছোট্ট নালা তারা তৈরি করে রেখেছে। তা দিয়ে তাদের চাষের জমিতে পানি নেওয়া হয়। একটা চাকির মাথায় দড়ি টানিয়ে অনেকগুলি মগ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এ দিয়েই তারা কূপ থেকে নালায় পানি দেয়। সেই পানি ঢালু নালা দিয়ে তাদের চাষের জমিতে যায়। একটা খচ্চর সে চাকা ঘুরায়। এটাই তাদের পানি সেচের একমাত্র ব্যবস্থা।

কয়েক ঘণ্টা ধরে বন্ধুর পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ক্রমে উপরের দিকে উঠতে লাগলাম।.....

পাঁচটার সময় এমন এক স্থানে পৌঁছলাম যেখান থেকে উটের পায়ের দাগ চিহ্নিত রাস্তা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। কোন্ পথ ধরে আমাদের যেতে হবে তা ঠিক করা মুশ্‌কিল হলো। দক্ষিণ দিকে যে পথটা গেছে তা অত্যন্ত খারাপ। আর সবচেয়ে ভালো পথটি সোজা সামনের দিকে চলে গেছে। সেই পথটিই আমরা বেছে নিলাম। আমাদের ম্যাপে এখানে কোনো পথের উল্লেখ ছিলো না।

সূর্য ডুবে গেলো। ক্রমে রাস্তা খারাপ হয়ে আসতে লাগলো। শেষে এমন হলো যে আর এগুনো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্থানে স্থানে গভীর গর্ত। বহু কষ্টে সেসব এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। পূর্ণবেগে মোটর চালালেও তা এতো ধীরে অগ্রসর হচ্ছে যে, যে কোনো লোক পায়ে হেঁটে তার সঙ্গে যেতে পারে। সারা গায়ে কম্বল মুড়ি দেওয়া সত্ত্বেও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। আমরা তখন অনেক উঁচুতে উঠেছি। হেডলাইটের আলোতে বেশী দূর দেখা যায় না। তাই স্থানটি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারি নাই। আটটা থেকে ক্রমে নীচে নামছি। এই সময় বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে ভীষণ বালুঝড় শুরু হলো। সামনে কিছুই দেখা যায় না। যতোদূর সম্ভব হুড্ বন্ধ করে দিলাম। মরুভূমিতে বালু ঝড়ে হুড্ এতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো যে তা দিয়ে বরফের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তুষার ঝড়ের গতি ক্রমেই বেড়ে চলছে। প্রথমে ভূমি স্পর্শ না করেই গলে যেতো, কিন্তু দশটা থেকে মাটির উপর বেশ উঁচু হয়ে বরফের স্তূপ জমে উঠছে। আমার ধারণা হলো যে, পথ এখানে খুব সরু এবং উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে। রাস্তার মোড় হঠাৎ এখানে ঘুরে গেছে। গাড়ি

থামিয়ে নেমে পড়লাম। এক পাশে পাহাড়ের কয়েকটি প্রাচীর লম্বালম্বিভাবে উপরে উঠে গেছে আর একপাশে গভীর খাদ। শেষে গিয়ারের উপর নির্ভর করে আমরা সে সরু পথ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। একশো গজের মতো গিয়েই আবার থামতে হলো। খাদের উপর একটা পুল। পুলটি সাধারণ ধরনের নয়–দড়ি দিয়ে তা ঝুলানো। নেমে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম আল্‌গা-আলগিভাবে বসানো বোর্ড দিয়ে পুলটি মোড়ানো।

দু'জনই চিন্তিত হলাম। ভীষণভাবে বরফ পড়ছে–আর নীচে খাদের ভিতর থেকে শিয়াল আর শিকারী পাখীর বীভৎস চিৎকার ভেসে আসছে। সেতু পার হবার সময় কেউ গাড়িতে বসতে সাহস পেলাম না। রানিং বোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে অলৌকিকভাবে আমরা সেতু পার হয়ে গেলাম। এখান থেকে কিছুদূর পর্যন্ত পথ বেশ ভালো, তারপর আঁকাবাঁকা। তুষারপাত আরো গাঢ় হতে লাগলো। হঠাৎ আলো দেখে আশ্চর্য হলাম। বাড়ির বেশ একটা লম্বা সার সেখানে অবস্থিত। শহেরর রাস্তায় এসে পড়েছি।

বার কয়েক হর্ণ বাজালাম। নিঃশব্দ রাস্তা চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাড়িগুলি থেকে গরম পোশাক পরিহিত লোক বেরিয়ে এসে আমাদের মোটরের চার পাশে দাঁড়ালো, মুখে তাদের বিরক্তির ভাব। বার্‌বার ভাষা মিশ্রিত আরবীতে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো–আমরা কে আর কোথা থেকে এসেছি। এতোক্ষণ কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলে নাই। বুঝা গেলো যে এদের অনেকেই কোনো দিন মোটর গাড়ি দেখে নাই। হাঁ করে গাড়ির দিকে চেয়ে আছে। একজন এগিয়ে এসে ইতস্তত করে গাড়িতে হাত দিলো। রাত্রে সেখানে থাকতে পারবো কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমার উচ্চারণ শুনেই তারা এক সঙ্গে বলে উঠলো: আনতা ফ্রান্সোভী? (আপনি কি ফরাসী)?

তারা আরো বিরক্ত হয়ে উঠলো। শুনলাম একজন বলছে, ভালো উদ্দেশ্য নিয়েও এখানে আসেনি, একথা নিশ্চয় করে আমি বলতে পারি। এখনই ওকে শহর থেকে বের করে দাও।

সৌভাগ্যক্রমে সেখানকার শেখ বেরিয়ে এলেন। লোকটিকে দেখে মনে হলো বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। তিনি একজন হাজী, কিছু দিন মিসরে ছিলেন এবং যৌবনে ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন। আমরা কোথা থেকে আসছি, আমরা দুজনই মুসলিম এবং আমরা মিসর যাচ্ছি এসব কথা খুলে আমি তাঁকে বললাম। একথা শুনে এবং আমার নিরাপত্তার জন্য যে আরবী সংবাদপত্রখানা সঙ্গে এনেছিলাম তা দেখে বন্ধুভাবে তিনি আমাকে তাঁর গৃহে যাবার জন্য দাওয়াত জানালেন। সেই শহরে শেখের বাড়িটাই সবচেয়ে বড়। পাহাড়ী পাথর দিয়ে তা তৈরী, বেশ প্রশস্ত। যে ঘরে আমরা শুতে গেলাম তাতে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছিলো। অল্পক্ষণের মধ্যে শহরের লোক এসে ঘর ভর্তি হয়ে গেলো। শেখ প্রাচীন লোক–শ্বেত-শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত মুখে সারল্য ও

দয়ার ছাপ। তিনি এসে আমাদের সংগে মেজেতে বিছানো বিচালীর মাদুরে বসলেন। তের বছর বয়স্ক তাঁর ছেলেকে চা তৈরি করবার ফরমাস দিলেন। আমরা আলাপ শুরু করলাম।

আপনি কি আলজিরিয়া গিয়েছিলেন? শেখ জিজ্ঞেস করলেন।

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন যে শেখ আবদুল আজিজ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। গারদাইয়ার এক সওদাগর ছাড়া এ শহরের একমাত্র তিনিই ফ্রান্সে গিয়েছিলেন–একজন বললো।

আমিও গারদাইয়া যাচ্ছি। কখন তিনি এখানে আসছেন?

এই যে তিনি এখানেই আছেন। বলে লোকটি অগ্নিকুণ্ডের কাছ থকে একটি খাটো মোটা লোককে টেনে নিয়ে এলো। বললো: শুনতে পাচ্ছ হুসেন, মেহমান জানতে চাইছেন কবে তুমি গারদাইয়া ফিরে যাচ্ছ ?

কালই যাবো ভাবছি। সওদাগর বললো।

সবাই তার দিকে চাইলো।

বেশ, আমি আপনাকে আমার মোটরে করে নিয়ে যেতে পারি। গারদাইয়া হয়েই আমি টাগার্ট যাচ্ছি।

লোকটি আমায় ধন্যবাদ জানালো। পরদিন ভোরেই রওনা হবো ঠিক করলাম। চা তৈরি হয়েছে। শেখের ছেলে চা পরিবেশন করলো। আমি সকলকে সিগারেট দিলাম। সবাই সিগারেট খেলে আমি বললাম: মরুভূমিতে একদল বেদুইনকে দেখেছি যারা ধূমপান করে না।

শেখ মাথা নাড়লেন। বললেন: বেশীর ভাগ বেদুইনই ধূমপান করে না। স্বাস্থ্যের এতোটুকুও অনিষ্ট করতে পারে সেরূপ কোনো কিছুই তারা খায় না। কিন্তু আমরা শহরবাসীরা তা বড় একটা মানি না। আপনি যদি কখনো পূর্বদিকে বার্সে (সাইরেনিকাস্থ সেইজ শহরের অন্য নাম) যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে শহরের লোকও ধূমপান করে না। ওরা সব সেনৌসী-পন্থী।

সেনৌসী-পন্থী আবার কি রকম?

সিদি আহমদ সেনৌসী প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় তারা, অত্যন্ত ধার্মিক। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মানুষ হিসাবে যতটুকু সম্ভব ভদ্র হওয়া। আর তা করতে হলে ধর্মপ্রবণতাই একমাত্র পথ।

তারা কি সংখ্যায় খুব বেশি?

ত্রিপলী এবং সাইরেনিকায় তারা সংখ্যায় অনেক। আপনি বলছেন যে আপনি মিসর যাচ্ছেন, তাহলে নিজেই আপনি তা দেখতে পাবেন।

ফরাসীদের আপনার কেমন লাগে?

তারা যদি আমাদের শাসন করতে না চাইতো তাহলে তারা নেহাত মন্দ নয়। তারা আমাদের বুঝতে চেষ্টা করে। তবুও তারা বিদেশী। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন: উত্তর আফ্রিকর সর্বত্রই এরূপ। ওরা বলে, আমরা নাকি স্বাধীনতার উপযুক্ত নই। এখন যেরূপ দেখছেন, আমরা শহরবাসীরা কখনো এতো গরীব বা হীন ছিলাম না। এখানে আমরা এখনো বেশ আছি। এখনো বিদেশী-শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই।

বৃদ্ধ শেখ সিগারেট ধরালেন। বললেন: আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন কেন?

তার অনেক কারণ আছে, আমি বললাম। প্রথমত, দেখলাম ইসলামের শিক্ষা হলো ধর্ম মেনে বাঁচা। অন্যান্য ধর্ম শুধু নীতিকথায় বিশ্বাস করতে বলে। দ্বিতীয়ত, আমার ধারণা যে ইসলামই শুধু একমাত্র ধর্ম যা এ যুগেও ঠিক থাকবে। এ খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত–আল্লাহকে অবিশ্বাস না করা। প্রত্যেকের প্রতি সহনশীলতা। এগুলো মানুষকে প্রগতির দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়।

শেখ আবদুল আজিজ মুচকি হাসলেন। বললেন: আগেও বলেছি যে আমি দুনিয়ার অনেক দেশ দেখেছি। এমন কি আপনার দেশও দেখেছি। প্রথম প্রথম আমার উপর তা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। আপনাদের আবিষ্কৃত জিনিস কতো প্রচুর। কিন্তু পরে ভালো করেই বুঝতে পেরেছি যে ইউরোপ বাইরের দিক দিয়ে উন্নতি সাধন করছে এবং তারই উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এখন জানতে পেরেছি, যা সত্য তা সব সময়ই চিরন্তন–তাকে পরিবর্তন করা চলে না। ইসলাম সেই চিরন্তন সত্যের অন্যতম–এটাই আল্লাহর পথ।

আপনি তাহলে সভ্যতাকে মানতে চান না?

না। আমি দেখেছি সবাই ইউরোপীয় পোশাক, মোটরকার, মদ, আর ইন্‌জিনিয়ারিংকেই চরম সার্থকতা বলে মনে করে। কিন্তু এ থেকে আমরা কি শিখছি? এসব জিনিস একটি লোককে কি সুখী করতে বা তার মঙ্গল সাধন করতে পেরেছে?

বরং ঠিক তার বিপরীত।

তাই আমাদের আশঙ্কা যে, এসব জিনিস আমাদের এখানে প্রবেশ করতে পারে। আমরা তা চাই না। আমরা চাই শুধু আমাদের ধর্ম বজায় রাখতে আর চাই সে শান্তি আর আনন্দ শিল্প যা দিতে পারে না। আমাদের সামান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা খুবই মুশকিল, কিন্তু আমরা বড় বড় মেশিন বা যন্ত্রপাতি এমনকি এই যান্ত্রিক সভ্যতা মোটেই চাই না। আমাদের প্রয়োজন অল্প আর আমাদের ছেলেমেয়েরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ঈমান রেখে সুখে বাস করুক, এই আমরা চাই।

বলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। বললেন: এই শহরে আমিই একমাত্র লোক যে এসব জিনিস বুঝতে পারে। অন্যরা অবশ্য এ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

রাত প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। আলী চা পরিবেশন করছে। আমি তাকে টাকা ও সিগারেট দিতে চাইলাম, কিছুতেই সে তা নিলো না।

বললে: আমি পাক কালাম শিখছি–এখন আমার সিগারেট খাওয়া নিষেধ।

অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে আমি আমার আরবী কুরআন শরীফ মেজের উপর রেখে দিয়েছিলাম। আলীর দৃষ্টি পড়লো তার উপর। সে তা হাতে নিয়ে চুম্বন করলো এবং খুলে সুমিষ্ট সুরে তা থেকে একটি সূরা পড়তে লাগলো। তার পড়া শেষ হলে মোরগ ডেকে উঠলো। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকাল বেলা আলী চা আর কেক্ নিয়ে এলো। শেখ তা পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই উঠতে পারলাম না, আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। আবদুস সালাম সেই সওদাগরকে নিয়ে আটটার সময় এসে আমার ঘুম ভাঙ্গালো। দশটায় আমরা রওনা হলাম। শেখ আমাদের একটা মেষ, আর সবাই কেক এবং সিগারেট উপহার দিলো। আমাদের তা গ্রহণ করতে হলো। ফেরত দিলে বা টাকা দিতে চাইলে তারা খুব মর্মাহত হবে।

দুপুরের কাছাকাছি পথ নীচের দিকে চলতে চলতে ক্রমে প্রশস্ত হতে লাগলো এবং খানিক পরে আবার সামনে মরুভূমি দেখতে পেলাম। রাস্তায় আমাদের বেশ বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। দুটার সময় মরুভূমিতে পৌঁছলাম। গারদাইয়া উপস্থিত হলাম সন্ধ্যা সাতটায়। সকালে সওদাগরের কাছে বিদায় নিলাম।

গারদাইয়া থেকে পঁচিশ মাইল দূরে যখন একটা মরুভূমির মাঝ দিয়ে চলছি এমন সময় ইঞ্জিন হঠাৎ ধাক্কা মারতে লাগলো। ভাবলাম ভুল তেল দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখলাম যে রেডিয়েটার পানিশূন্য। রেডিয়েটারে ছিদ্র হয়ে পানি বেরিয়ে গেছে। রেডিয়েটারে পানি ভর্তি করে বার মাইল দূরে এক মরূদ্যানে পৌঁছলাম। সেখানে মাত্র তিন-চারটি বাড়ি। অধিবাসীরা সর্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করলো। বহু চেষ্টায় রেডিয়েটার মেরামত করা সত্ত্বেও পানি পড়া একেবারে বন্ধ হলো না।

গুহাবাসী ও যাদুকর

পরদিন সকালে ছিদ্রওয়ালা রেডিয়েটার নিয়েই রওনা হলাম। টাগার্টে পৌঁছবার আগে তা আর মেরামত করা যাবে না। তাই বেশী করে পানি সঙ্গে নিলাম।

দশটার কাছাকাছি জোরে বাতাস বইতে লাগলো। উড়ন্ত বালু মেঘের মতো সমস্ত আচ্ছন্ন করে ফেললো–অন্ধকার এতো বেশি হলো যে রাস্তা তো দূরের কথা আমরা আমাদের হাত পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। গাড়ী থামিয়ে গাড়ির ভিতর কম্বল মুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। কয়েক ঘণ্টা পরই প্রচণ্ড ঝড় থামলো। আমরা আবার গাড়ি ছাড়লাম। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতেই আবদুস সালাম বহু দূরে একটা মানুষের ছায়া দেখতে পেলো। একটা লোক নিতান্ত একাকী বালু সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় চলে আসছে। আমরা কাছে গিয়ে লম্বা সাদা ধবধবে দাড়িওয়ালা এক অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। তার অতি নিকটে এলেও সে আমাদের দিকে চাইলো না। আমরা তাকে প্রশ্ন করতেই সে থেমে আমাদের অভিনন্দন জানালো।

বড় অদ্ভুত তার চেহারা। মুখের চামড়ায় খাঁজ পড়ে গেছে, পরনের পোশাক শতচ্ছিন্ন। গায়ের রং গাঢ় তামাটে। ভিক্ষুকের মতো পিঠে একটা ঝুলি বেঁধে মরুভূমিতে সে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কিছুই সে আমাদের কাছে চাইলো না। বার্ধক্যজড়িত কম্পিত কণ্ঠে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে অভিবাদন জানালো। আমরা প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি টাগার্ট যাচ্ছে? তাহলে গাড়িতে করে তাকে আমরা সেখানে পৌঁছে দিতে পারি।

মাথা নেড়ে সে বললো: পাঁচ দিন আগে গেলেও যা, পাঁচ দিন পরে গেলেও তা। বিশেষ কিছু যায় আসে না তাতে।

টাগার্টে আপনার কোনো কাজ আছে নিশ্চয়ই, সেজন্য বোধ হয় আগে গেলেই ভালো হয়।

এখানে এই মরুভূমিতে কোনো লোকজন নেই– এখানে আমি আল্লাহর কাছে একলা আছি। এখানে আমি আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আপনার এই যন্ত্রটি আমার কাছে অপরিচিত।

কাঁধে ঝুলানো থলেটি সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো: এতে আমার কিছু খেজুর আর কয়েক বোতল পানি আছে। এ ছাড়া আমার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর হুকুমে মাটির সঙ্গে আমার দেহ মিশে যাওয়ার আগে আমার কোন অসুখ-বিসুখ হবে না।

যে-কোনো সময়ই তো অসুখ হতে পারে।

হে বিদেশী পথিক, ইরান দেশের সেই ডাক্তার যিনি আরব দেশে এসেছিলেন, তাঁর গল্প আপনার জানা নেই বোধ হয়? বলছি শুনুন: হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রচারিত ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন সারা দুনিয়া ছেয়ে ফেলেছিলো তখন ইরানের এক বিখ্যাত চিকিৎসক নতুন ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে মক্কায় আসেন সেখানকার রোগীদের চিকিৎসা করতে। কেউ বুঝতে পারলো না এমন একজন চিকিৎসক তাঁর দেশে এমন পসার ছেড়ে মরুদেশ আরবে এলেন কেন?

মক্কা এবং মদীনায় তিনি বহুদিন বাস করলেন। কিন্তু একটি রোগীও তাঁর কাছে এলো না। একদিন তিনি মদীনার প্রধান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: কায়েদ, পারস্যের সমস্ত বড় বড় লোক অসুখ হলেই ছুটে আসতো আমার কাছে চিকিৎসার জন্য, কিন্তু এখানে কেউ আমার কাছে আসেন না কেন? তারা কি আমার চিকিৎসা-বিদ্যা ত্রুটিপূর্ণ বলে ধারণা করেছে?

কায়েদ বললেন: আপনার বিদ্যার কোনো ত্রুটি নেই! কিন্তু এই সুখের দেশে চিকিৎসকের কোনো প্রয়োজন নেই।

চিকিৎসকের প্রয়োজন নেই? অসুখ হলেও না?

কায়েদ বললেন: আমাদের দেশের লোক শরীরের পক্ষে যা প্রয়োজন তাই শুধু আহার করে। দেহকে আমরা আত্মার বাহন মনে করি। এই ধারণাতেই আমরা সমস্ত রোগমুক্তির সন্ধান পাই।

চিকিৎসক তাঁর ব্যবসা ছেড়ে সে সুখের দেশ আরবে বাস করতে লাগলেন।

বৃদ্ধ আপন মনে হাসলো। পরে আবার বললো: আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও এ কথাই ভাবতে পারেন। আল্লাহ্ই আমার স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন। আমি খেজুর আর পানি খেয়েই বেঁচে থাকি। জীবনে কোনো দিন অসুখ হয়নি।

কিন্তু প্রাচ্যের শহরগুলিতে যতো অধিক রোগ দেখেছি তা' আর কোথাও দেখি নাই।

বৃদ্ধ জ্ঞানী লোকটি মাথা নেড়ে বললো: উত্তর আফ্রিকার খুব অল্প সংখ্যক লোকই ইসলামের উপদেশ মতো বর্তমানে চলে। যদি আমরা তা মেনে চলি তাহলে চিকিৎসকের প্রয়োজন আমাদের হবে না। আমি এখন বুড়ো হয়েছি, পরিশ্রমে হয়তো আমার দেহ নীরব হয়ে যেতে পারে কিন্তু শহরেও তো তা হতে পারে? কিন্তু এখানে যে আমি আল্লাহর খুবই কাছে।

আপনি কি এতে খুব সুখী?

আমি চিরকালই সুখী। প্রতিদিনের ঘটনা থেকে নিত্যই আমি কিছু-না-কিছু শিক্ষা লাভ করি। আমি যদি সুখী থাকি, অনাহারে থাকলেও আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই এই বলে যে, অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে তিনিই আমায় শিক্ষা দিয়েছেন। আর দৌলতমন্দ হলে দয়া-দাক্ষিণ্য শিক্ষা দেন, এ দিয়েই আমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত অনুভব করতে পারি।

আবদুস সালাম মোটর থেকে লাফিয়ে পড়ে বৃদ্ধ লোকটির হাত জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগলো। আমার দিকে চেয়ে সে বললো: দেখছেন না উনি একজন বুজুর্গ লোক?

আমি বৃদ্ধের নাম জিজ্ঞেস করলাম।

সিদি মুহাম্মদ–বর্তমানে নামহীন। টাগার্টে গেলে কেউ আমাকে চিনবে না।

আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

মক্কা–সেখানেই আমি শেষ নিশ্বাস ফেলতে চাই।

আপনি কি হেঁটেই সেখানে যাবেন?

না, তিউনিস পর্যন্ত হেঁটে যাবো। সেখান থেকে হজ্জ-যাত্রী জাহাজে যাবো। তারপর মাথা নেড়ে তিনি আবার বললেন: রাজা হওয়ার চেয়ে ভিখারী হওয়া অনেক ভালো। আপনি জানেন যে দশটি ভিখারী এক বিছানায় শুতে পারে, কিন্তু একটি দেশে দু'টি রাজার কোনো দিনই স্থান হয় না।

তিনি হেঁটে চলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে পারলাম না। আবদুস সালাম উৎসাহ ভরে বললো: ইনি একজন বুজুর্গ লোক। এর সঙ্গে দেখা হওয়া আমাদের সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

ইঞ্জিন চললো। আমরা বালির উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে দিলাম। চারটায় আবার রেডিয়েটারে খুব গোলমাল দেখা দিলো। ছোট ছিদ্রটি বড় হয়ে পড়েছে। আমাদের পানি শেষ হয়ে এলো। মেরামত করবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সন্ধ্যা হয়ে এলো। ইঞ্জিন অত্যধিক গরম না হওয়া পর্যন্ত রেডিয়েটার ছাড়াই গাড়ি চালিয়ে যাবার সংকল্প করলাম। ইঞ্জিন গরম হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ থেমে তা ঠাণ্ডা হলে আবার চলবো।

পাঁচ মিনিট পরেই ইঞ্জিনে ভীষণ শব্দ হতে লাগলো। একঘণ্টা থামিয়ে রাখার পর তা ঠাণ্ডা হলো। পাঁচ মিনিট চলতেই আবার সেই অবস্থা। এমনি করে আমাদের চলতে হচ্ছে। টাগার্টে পৌঁছতে বেশ কয়দিন লেগে যাবে।

পরদিন আর মোটর চালালাম না। দিনের বেলা সূর্যের প্রচণ্ড তেজে তখন তখনই ইঞ্জিন তেতে উঠে। কম্বলের নীচে জড়ো-সড়ো হয়ে বসে আমাদের পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করতে লাগলাম।

অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠেছে। চারদিকে যতোদূর চোখ যায় শুধু বালু আর বালু। সূর্যের আলোতে হলদে আর লাল বালু চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সামান্য বাতাসেই সেই বালু উড়ে এসে নাক কান বন্ধ করে দেয়।

কোনো কাফেলার দেখা পাওয়ারও কোনো আশা নেই। কাফেলার এদিকে আসতে হয়তো সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাবে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের কংকাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সারাদিন আমরা সেখানেই রয়ে গেলাম। সারাদিন ভীষণ রোদ ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমরা রওনা হলাম। কিন্তু মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়েছি। কম্বল গায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বাতাস শুরু হলো, শুনতে পেলাম। মনে হলো এ যেন মরুর অশরীরী আত্মার চুপি-চুপি কথা বলার শব্দ।

অকস্মাৎ আবদুস সালাম কম্বলের নীচে থেকে লাফিয়ে উঠলো। মরুভূমির আতংক তাকে পেয়ে বসেছে। শহরের লোক এই জনমানবহীন মরুভূমিতে এলে প্রায়ই এরূপ আতংকগ্রস্ত হয়। ভয়ে সে পাংশু হয়ে উঠলো। চক্ষু বিস্ফারিত করে চিৎকার করে বলতে লাগলো: আর আমি যাবো না। আমাদের চারদিকে ভূত-প্রেত হাযির হয়েছে।

এরূপ ধারণা কেন হলো তোমার? বলে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম।

ওদের কানা-কানি কথার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? আবার সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে 'সূরা নাস' পড়তে লাগলো।

বাতাস জোরে বইতে লাগলো। বাতাসের শব্দের মধ্যেও আমি কুকুরের চিৎকার শুনতে পেলাম দূরে-বহু দূরে।

আবদুস সালাম বললো: শুনছেন তো?

সেও সে শব্দ শুনতে পেয়েছে। কিন্তু এবার শব্দ থেমে গেছে। আধ ঘণ্টা সে শব্দ আর শুনতে পাইনি। তারপর আবার সেই শব্দ। মনে হলো এক দল কুকুর ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করছে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে সেই শব্দের দিকে এগিয়ে চললাম। ক্রমে তা ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেলো।

আবদুস সালাম ভয়ে কাঁপছিলো।

এ অস্বাভাবিক—এ ভূতের কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার সে সেই সূরা আবৃত্তি করতে লাগলো।

গাড়ি হারিয়ে ফেলবার ভয়ে আমরা ফিরে এলাম। গাড়িতে বসে ঘুমাবার চেষ্টা করলাম। ঘুম আসছে ঠিক সেই সময় আবার কুকুর চিৎকার করে উঠলো। আমি লাফিয়ে উঠে আবদুস সালামকে হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে বললাম: কাছে নিশ্চয়ই কোথাও লোক আছে। চলো খুঁজে বের করি।

আধ মাইল যেয়েই উটের পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। আবদুস সালাম নুয়ে উটের মল তুলে নিলো। তখনো তা টাটকা ছিলো। বললো: কাল এখানে লোক ছিলো।

উটের পায়ের দাগ লক্ষ্য করে আমরা ব্যস্তভাবে এগিয়ে চললাম। কুকুরের চিৎকার এবার থামছে না।

একটু পরেই দল বেঁধে দাঁত-মুখ খিচিয়ে কুকুরগুলো আমাদের দিকে তেড়ে এলো।

বেদুইনরা তাদের নিরাপত্তার জন্য এসব কুকুর পালন করে। কুকুরগুলো একসঙ্গে এসে আমাদের আক্রমণ করলো। আমরা পাথর ছুড়ে মারতে লাগলাম। ভয় পেয়ে কুকুরগুলো দূরে সরে গেলো। আমরা যতোই এগোই কুকুরগুলো ততোই বেশী চিৎকার করে।

অবশেষে আমরা মানুষের বাসস্থান আবিষ্কার করতে সমর্থ হলাম। আমাদের সামনে পনরো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের গায় কতকগুলি গর্ত দেখতে পেলাম। গর্তগুলি দিয়ে এক একটি মানুষ সহজেই যাওয়া-আসা করতে পারে। পাহাড়ের গায়ে নীচ থেকে কতকগুলি সিঁড়ি উপরে প্রধান দরজা পর্যন্ত উঠে গেছে।

এই গুহার অধিবাসীরা আমাদের মিত্র না শত্রু ভাবে গ্রহণ করবে? আমাদেরে হত্যা করে কি এরা আমাদের সব কিছু নিয়ে যাবে? অথবা আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করবে, আমাদের খেতে দেবে? আমরা ক্ষুধায় ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম। ছত্রিশ ঘণ্টা রেডিয়েটারের উত্তপ্ত কয়েক ফোঁটা পানি ছাড়া আর কিছুই খেতে পাইনি। আমাদের সঙ্গে যে খেজুর ছিলো তা ছিলো বেজায় শুকনো এবং পানি ছাড়া তা খাবার কোনো উপায়ই ছিলো না। কুকুরগুলো এখন পুরোপুরি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আমরা তাদের প্রভুদের একেবারে ঘরের কাছে এসে পড়েছি আর তাদের পাহারা দেওয়ার ভার যে এদেরই উপর। প্রভুভক্ত কুকুরগুলো এবার অন্য হায়েনার মতো তাদের তীক্ষ্ণ দন্ত বের করে আমাদের সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো।

প্রধান দরজার কাছে যেতে আমাদের ইচ্ছা ছিলো না; কিন্তু কূপের কাছে গিয়ে একাকী সেখান থেকে পানি আনতে ভরসা পাচ্ছি না। ওদের অনুমতি নেওয়া উচিত। সৌভাগ্যক্রমে এ সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে গেলো। মাথায় পাগড়ী বাঁধা একটি লোক একটা পুরানো ধরনের লম্বা রাইফেল আমাদের দিকে তাক্ করে ধরে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, আমরা কেন এসেছি?

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমরা টাগার্ট যাচ্ছি। পথে আমাদের মোটর নষ্ট হয়ে গেছে। এতে সে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ ভেংচিয়ে বললো যে, সাহায্য পেতে হলে আমার নিজ জাত ভাইদের কাছে যেতে হবে। ইউরোপীয়েরা তাকে কোনো সাহায্যই করে নাই। আমি তাকে বললাম যে, তার লোকেরাই আমার লোক। কারণ আমিও একজন মুসলিম এবং মুসলিম হিসাবেই আমি তাদের কাছে আশ্রয় চাইছি।

একথা শুনে সে তার রাইফেল নীচু করে আবদুস সালামকে জিজ্ঞেস করলো: লোকটি কি সত্য কথা বলছে? বাস্তবিক ও কি মুসলমান?

আবদুস সালাম বললো: "হ্যাঁ! তাছাড়া কুরআনের অনেক সূরা এর মুখস্থ।" আলজিরিয়ার লোকদের মধ্যে এ গুণটির অভাব খুব বেশি। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে বিরাট অবিন্যস্ত দাড়িওয়ালা যে লোকটি সন্ত্রস্তভাবে আমাদেরে দেখছিলো শান্ত কণ্ঠে সে বললো: "বহুত খুব। কাল আপনি আমাদেরে কুরআন পড়ে শোনাবেন। আসুন, এখন ভিতরে আসুন।"

হাতের ইশারায় আমাদেরে তার সঙ্গে যেতে বললো। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে পাহাড়ের ভিতর একটা ছোট ঘরে ঢুকলাম। যার সঙ্গে কথা বলছিলাম সে একটা বাতি জ্বালালো। বাতির আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো। প্রথম কুঠরির এক কোণে একটা শবাধার রয়েছে। একটা বড় কম্বল দিয়ে তা ঢাকা। তার নীচে একটা মানুষের লাশ দেখা যাচ্ছে। আবদুস সালাম কুরআনের একটা সূরা আবৃত্তি করলো। কম্বলের নীচে কার মৃতদেহ তা জানবার আগেই আমাদের আর একটি কুঠরিতে নেওয়া হলো। এর মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড, পাথর দিয়ে তৈরী একটা চিম্‌নী উপরে বেরিয়ে গেছে। অগ্নিকুণ্ডের পাশে কয়েকটি ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে আছে। আমরা ঘরে ঢুকলেও তাদের ঘুম ভাঙ্গে নাই। ব্যাপারটা আবদুস সালামের কাছে ভালো লাগে নাই। সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছেও তা অস্বস্তিকর বলে মনে হলো। আবদুস সালাম বলছে শুনতে পেলাম, "এমন জানলে তিউনিস ছেড়ে কখনো আসতাম না।"

পথ-প্রদর্শক আমাদের সেখানে বসতে বলে ভিতরের একটা কুঠরিতে গেলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এক পাত্র স্বচ্ছ পানি আর এক থালা খেজুর নিয়ে সে ফিরে এলো। আমরা তৃপ্তি সহকারে তা খেলাম। আমাদের সাহস ফিরে এলো। বৃদ্ধ লোকটি বললো যে, সেখানেই আমরা শুয়ে ঘুমুতে পারি।

ভোর হওয়ার এক ঘণ্টা আগে একটি লোক ধাক্কা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গালো। ঘুম-জড়িত চোখেই উঠে দাঁড়ালাম। লোকটি বললো: হে সিদি, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়বো। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আপনাকেই কালাম পাক পড়তে হবে। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে আপনি এখানে এসেছেন।

যে ছেলেমেয়েদের পাশে আমরা ঘুমিয়েছিলাম তারাও জেগে উঠলো। আমাদের দেখে তারা তাজ্জব হয়ে চেয়ে রইলো। আবদুস সালামও জেগে উঠেছিলো। আমরা উঠে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

নীচের সিঁড়িতে আমাদের মেজবান আর একটি লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের কাঁধে ছিলো শবাধার। আমাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শবযাত্রা রওনা হলো। সামনে দুটি লোক শবাধার বহন করে নিয়ে চললো। সবার পিছনে আবদুস সালাম, ছেলেরা আর আমি। কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে করতে তারা এগিয়ে চললো।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা একটা ছোট মসজিদে পৌছলাম। এক বুজুর্গ কামিল ব্যক্তির কবরের উপর তা অবস্থিত। আশে পাশে হলদে বালুর উপর অনেকগুলি কবর। কবরের উপর মৃতদের রাইফেল, লাঙল ও অন্যান্য জিনিস-পত্র যা জীবিত অবস্থায় তারা ব্যবহার করতো তা সব রেখে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদের বাইরে দরজার সামনে ঘাসের উপর শবাধার রাখা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেতা যার সঙ্গে কাল রাতে আমার আলাপ হয়েছিলো তিনি কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়তে লাগলেন। নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে তিনি আমার সামনে এসে বললেন: হে শেখ, আপনার সঙ্গের ছেলেটি বলেছিলো যে আপনি কুরআন পড়তে জানেন। আমি শুধু নামায পড়তেই জানি। আপনি মেহেরবানী করে মৃত্যু-সূরা পাঠ করুন।

সেই সূরা আমার মুখস্থ ছিলো। আমরা বাইরে এলাম। ভোরের আলোর প্রথম রেখা সবেমাত্র ফুটে উঠেছে। শেষ রাত্রের চাঁদ ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। সবাই মুখ ঢেকে চুপ করে বসলো। আমি পড়তে লাগালাম মৃত্যু-সূরা..... ইয়াসীন।

"ওয়াল কুরআনিল হাকিম–

শেখ অশ্রুপূর্ণ চোখে শবাধারের কাছে গিয়ে আচ্ছাদন খুললেন। শ্বেতশ্মশ্রু-বিমণ্ডিত অতি বৃদ্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ বেরিয়ে এলো। কয়েকজনে মিলে ধরাধরি করে লাশটি কবরে রাখলো। বৃদ্ধের দাফন কার্য শেষ হলো।

সূর্য উঠেছে। আমরা নীরবে গুহায় ফিরে এলাম। গুহার বাইরে দুটি বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিলো।

আগুনের পাশে বসে শেখকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁরা চা বা কফি খান না কেন?

কিছুদিন আগে টাগার্ট থেকে কিছু এনেছিলাম, তা ফুরিয়ে গেছে। দু'বছর হলো আমি আর টাগার্টে যাই নাই। আর ছেলেরা কখনো শহর দেখে নাই।

গাড়িতে আমার কিছু চা আছে তা' থেকে আপনাকে কিছু দিতে চাই। চলুন গাড়িতে গিয়ে তা নিয়ে আসি।

শেখ মাথা নেড়ে বললো: আপনি অমনিই তো কুরআন পাঠ করে আমাদের মহা উপকার করেছেন। আপনি না এলে কুরআন পড়তে পারে এমন লোক না আসা পর্যন্ত শব নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হতো। আপনি আমাদের মেহমান। আপনার সকল প্রকার সেবা করা আমাদের ফরয। তার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে আমরা কিছুই নিতে পারি না।

চা তো একটা সামান্য জিনিস।

আমাদের কাছে তা নিতান্ত সামান্য নয়। আমাদের তা পেতে হলে, তা আনতে হবে টাগার্ট থেকে, তাহলে বুঝুন ব্যাপারটা।

যাহোক আমি আপনাদের কিছু চা দিচ্ছি। তাতে কিছু যায় আসে না।

শেষটায় তিনি তা গ্রহণ করতে রাযী হলেন। বেশ বোঝা গেলো চা তিনি বেশ পছন্দ করেন এবং পেলে সুখীই হবেন। আতিথেয়তার উপর স্বার্থের সামান্যতম দাগ লাগতে দিতে তিনি রাযী নন।

মেয়েরা খাবার নিয়ে এলো। অন্যান্য বেদুইন ক্যাম্পের মতো এখানকার মেয়েরা বোরকা পরে না। তারা আবদুস সালাম ও আমার সঙ্গে মোসাফা করলো।

তাদের খাবার খুবই সাদাসিধে ধরনের। রুটি কি তা তারা চিনেই না। প্রচুর শুকনা খেজুর আর ঘটি ভরা ফুটন্ত দুধ আমরা খেলাম। খাবার পর আবার কিছু টাটকা ফল দেওয়া হলো খেতে।

খাওয়া শেষ হলে শেখ জিজ্ঞেস করলেন: আপনাদের গাড়ি চলছে না কেন?

আমি বললাম: আমাদের পানি ফুরিয়ে গেছে আর রেডিয়েটার ফুটো হয়ে গেছে। কিছু পানি নিয়ে গেলে গাড়িটাকে এখানে হয়তো নিয়ে আসতে পারি। ছেলেদের দুই বালতি পানি নিতে বলা হলো। বালতি দুটি তারাই বয়ে নিয়ে গেলো মোটর পর্যন্ত।

সেখানে গিয়ে দেখি মরুভূমিতে যে বুজুর্গ ব্যক্তিকে দেখেছিলাম তিনি গাড়ির রানিং বোর্ডে চুপ করে বসে আছেন।

আস্‌সালামু আলায়কুম, দেখলে তো তোমাদের সঙ্গেই আমি এখানে এসে গেছি! তোমাদের মতোই আমি খুব চলতে পারি।

তাকে দেখেই গুহাবাসীরা বালির উপর বালতি রেখে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে তার হাত চুম্বন করতে লাগলো। বললো: হে বুজুর্গ, আল্লাহকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আশা করি আমাদের পর্ণ কুটিরে আপনার মোবারক পায়ের ধুলি দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, বললেন: আমায় যেতে দাও, আমি হজ্জে যাচ্ছি। আমার পক্ষে একলা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

একই সঙ্গে দু'টি লোকই বলে উঠলো: হে পুণ্যাত্মা, আপনি হজ্জে যাচ্ছেন? কাবা শরীফে গিয়ে আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

শেখ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন: হযরতের রওজা মোবারক যিয়ারত করা কি কোনো দিন আমার ভাগ্যে ঘটে উঠবে?

আমরা হজ্জযাত্রী বুজুর্গ লোকটিকে কিছু খেজুর আর পানি দিলাম। পনর মিনিট বিশ্রামের পর নীরবে একা তিনি আবার পথ চলতে লাগলেন।

আবদুস সালাম এতদিনে মেকানিক্‌সের কাজ অনেকটা শিখে ফেলেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে রেডিয়েটারটা ঠিক করে ফেললো। গুহাবাসী লোক দু'টি শ্রান্তভাবে গাড়ির পিছনে বসলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা গুহায় পৌছলাম।

দিন কয়েক আমরা গুহাবাসীদের সঙ্গে বাস করলাম। একদিন গাড়িটা কিভাবে মেরামত করা যায় তাই ভাবছি। এক তরুণ গুহাবাসী এক ব্যাগ পুরানো জিপসাম এনে

আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিলো। তাই দিয়ে রেডিয়েটারের ছিদ্র বন্ধ করলাম। পানি চুয়ানো বন্ধ হলো।

মেজবানের কাছে বিদায় নিলাম। আমাদের কাছ থেকে কোনোরূপ তুহফা গ্রহণ কতে তিনি কিছুতেই রাযী হলেন না। তিন ঘণ্টা পর আমরা টাগার্টে পৌঁছলাম। এটাই আলজিয়ার্সের শেষ শহর। এই বিখ্যাত শহরে আরব, তোয়াবেগস আর ফরাসীদের বাস।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সারা আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। বাজারের ভিতর একটি বৃদ্ধ লোক হাসিমুখে আমাদের বললো: কাল বৃষ্টি হবে বলে আমার মনে হয়।

অনেক দিন ধরে কি এখানে বৃষ্টি হয় নাই? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হ্যাঁ। প্রায় পাঁচ বছর। এমন শিশুও এখানে আছে যারা বৃষ্টি কি তা জানে না।

সরু পথ দিয়ে আমরা একটা হোটেলে গেলাম। কয়েক দিন আমরা সেখানে থাকবার মনস্থ করলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে শান্তিতে কাটাতে পারলাম না। ইনজিনের শব্দের মতো কি একটা শব্দ ক্রমেই এদিকে আসছে। আমরা যেখানে আছি শহরের সেই অংশটায় হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। কতকগুলি লোক টর্চ হাতে সেখানে উপস্থিত হলো। সে সময়ে একটা অভিনব মিছিল রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মিছিলের সম্মুখে একজন কাফ্রি। মাথার পালকের টুপীতে শিয়ালের চারটি লেজ বাঁধা। গলায় জড়ানো একটা সাপ আর একটি দড়ি দিয়ে ঝুলানো অনেক রকমের হাড়, পালকের টুকরা, ধাতু নির্মিত জিনিস ও নানা পশুর লেজ। নেচে নেচে সে এগিয়ে চলেছে, কখনো বা যাচ্ছে অন্য পারে। মুখ থেকে তার ফেনা বেরিয়ে আসছে। মস্ত বড় একটা ঢাক বাজাচ্ছে সে। তাম্বুরা হাতে ছ'টি লোক তার পিছু পিছু আসছে। ঢাকের তালে তালে তারা তাতে ঘা দিচ্ছে। তার পিছনে একদল লোক বাঁশি বাজাচ্ছে। তার পিছনেই এক বিরাট জনতা সারা রাস্তাটি ছেয়ে ফেলেছে। রাস্তার প্রায় মাঝখানে এসে মিছিল থামলো। সামনের সেই অদ্ভুত লোকটি একটা ঘরে এসে একটা হাড় বের করে তা' দিয়ে তিনবার দরজায় টোকা মারলো। আমি ও আবদুস সালাম বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। আমাদের মরক্কোর পোশাক অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কেউ আমাদের কোনোরূপ বাধা দেয় নাই।

ভিতর থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবার সে দরজায় আঘাত করলো। তথাপি কোনো সাড়া মিললো না। আবার আঘাত করতেই ভিতর থেকে একটি মানুষের আওয়াজ এলো।

মান? অর্থাৎ কে?

সিদি আবদুল কাদের। সিদি আবদুল কাদের পাহাড় থেকে এসেছে তোমার রুগ্ন ছেলেকে ভালো করতে।

মান? ভিতর থেকে লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো।

কাফ্রি উত্তর দিলো: হে সিদি, পাহাড়ের গুহায় খেজুর কুঞ্জের ছায়ায় যে দরবেশ আবদুল কাদের বাস করেন সেই আমি–

আবার সেই একই প্রশ্ন, মান্?

হে সিদি, আপনার ছেলের যদি আরোগ্য চান তাহলে দরজা খুলুন। আমি আবদুল কাদের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। সেই আবদুল কাদের যিনি ঈগল পাখীর মতো উড়তে জানেন, শিকারী কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখেন আর সিংহের মতো যার শক্তি আছে।

ধীরে দরজা খুলে গেলো। জনতা উৎসুক হয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। একটি বৃদ্ধ লোক বেরিয়ে নিগ্রোর কাছে এসে তার হাতে চুম্বন করলো। বললো, ভিতরে আসুন সিদি।

আপনি জানেন যে আপনার ছেলেকে আমি রোগমুক্ত করতে পারি।

আল্লাহ্ই কেবল জানেন ছেলে ভালো হবে কিনা। সোনালী কিতাবে কি লেখা আছে তা কি আপনি পড়তে পারেন?

আবদুল কাদের এমনভাবে মাথা নাড়লো যে শিয়ালের লেজ নেচে উঠলো। তারপর হাড় দিয়ে ঢাকে আঘাত করলো। তার ইঙ্গিতে দুটি অনুচর ঘরে ঢুকলো এবং একটি শবাধার নিয়ে বেরিয়ে এলো। শবাধারটি রাখলো রাস্তার মাঝখানে। শবাধারে ষোল বছরের একটি ছেলে শায়িত। চোখ তার কোটরাগত ও বিবর্ণ। অতিকষ্টে সে চোখের পাতা ফেলতে সমর্থ হলো।

আবদুল কাদের একটা মশাল হাতে নিয়ে বালকের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করলো: আলো দেখতে পাচ্ছ?

"লা, ইয়া সিদি।" ক্ষীণ কণ্ঠে বালক উত্তর দিলো। তার বাবার চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এলো। শবাধারের কাছে গিয়ে ঝুঁকে ছেলের গালে সে চুমু খেলো।

বাবা আলী, কিছু ভয় নেই তোমার। আবদুল কাদের তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে অসমর্থ হলে যতোদিন আমি বেঁচে থাকবো ততোদিন আমিই তোমার চোখের কাজ করবো। কোন্ পাপে আল্লাহ্ আমায় এ শাস্তি দিয়েছেন? আল্লাহ্কেই ধন্যবাদ।

নিগ্রোটি অধৈর্য হয়ে বৃদ্ধের ঘাড় ধরে বললো: আবদুল কাদেরকে যখন স্মরণ করেছো তখন আবদুল কাদের এসেছে তোমায় সাহায্য করতে। কিন্তু আমরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

বৃদ্ধ লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। তার গলায় সুতো দিয়ে একটা ব্যাগ ঝুলানো ছিলো, তা থেকে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা বের করে গুণে আবদুল কাদেরের হাতে দিলো।

আবদুল কাদের বসলো। বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাতে শুরু করলো। যাদুকর হাত দিয়ে কি সব আঁকতে লাগলো। অস্পষ্ট করে কি সব বকবক করে আওড়াচ্ছে–তার

মাথা নড়ছে। বাজনা প্রবলতর হতে লাগলো। হঠাৎ এক সংকেত করলো, অমনি বাজনা থেমে গেলো। বললো: কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এখনও আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

বৃদ্ধ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। চামড়ার ব্যাগ বের করে তা অর্ধেক খালি করে আবদুল কাদেরের প্রসারিত হস্তে অর্পণ করলো। বললো: এবার দয়া করুন। আমি গরীব মনুষ, বেজায় গরীব।

আবার বাজনা বেজে উঠলো। এবার অনেকক্ষণ ধরে জোরে বাজলো। আবদুল কাদের তখনও নিস্তব্ধ। সে মাথা নাড়লো, শিয়ালের লেজ নেচে উঠলো। তার চেহারা মলিন হয়ে আসছে। বললো: হে সিদি, আপনার টাকা ফেরত নিন। আমি কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আড়চোখে সেই অর্ধপূর্ণ ব্যাগের দিকে চাইছে।

এইসব নিন, আমার ছেলের ভালোর জন্য আপনি এসব নিয়ে নিন। বলে ব্যাগটি আবদুল কাদেরের হাতে দিয়ে দিলো।

বাজনা আবার বেজে উঠলো। আবদুল কাদের সামনে ও পিছনে মাথা নাড়তে লাগলো ক্রমেই দ্রুতভাবে। তার মুখ থেকে ফেনা বেরুতে লাগলো। অবশেষে অজ্ঞানের মতো তার চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে এলো।

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ হয়ে এলো। আবদুল কাদের গম্ভীর স্বরে বললো : স্‌জা স্‌জা।

ছোট্ট দুটি মুরগীর বাচ্চা এনে তাকে দেওয়া হলো। একটার মাথা ধরে তার জিব ছিড়ে নিজের আঙ্গুল রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করলো। তারপর সেই রক্ত-রঞ্জিত আঙ্গুল ছেলেটির এক চোখে লাগালো। দ্বিতীয় বাচ্চাটি দিয়েও সে তাই করলো।

বাচ্চা দুটিকে তারপর ছেড়ে দেওয়া হলো। কোন শব্দ না করে তারা ছুটতে লাগলো। মুখ দিয়ে তাদের রক্ত ঝরছে তখন। একজন তাদেরে ধরে মেরে ফেললো।

অনুষ্ঠান শেষ হলো। নিগ্রো তার দলবল নিয়ে সরে পড়লো। ছেলেটিকে আবার ঘরে নেওয়া হলো।

আবদুস সালামকে জিজ্ঞাসা করলাম: এসব কি তুমি বিশ্বাস করো?

কি উত্তর দেবে তা' সে প্রথমে ভেবে পেলো না।

করিই তো বিশ্বাস। আবদুল কাদের একজন কামিল লোক, পর্বত গুহায় তার বাস।

কিন্তু দেখোনি এই গরীব লোকটির কাছ থেকে কেমন করে টাকাগুলি নিয়ে গেলো। আর কি বর্বরের মতো সে ছেলেটিকে ভালো করতে চেয়েছিলো? তুমি কি মনে করো এই আবদুল কাদের ফেজের সিদি আহমদ ইদ্রিস বা মরুভূমিতে দেখা সিদি মুহম্মদের মতো বুজুর্গ লোক?

আবদুস সালাম আমার প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারলো না। শুধু বললো: আমি আর যাবো না। তিতুয়ানেই আমায় ফিরে যেতে হবে।

যে তিতুয়ানেই সে ভিক্ষুকের মতো দিন কাটাতো সেখানেই ফিরে যাবার জন্য খানিকক্ষণ বক্‌বক্ করে সে শুয়ে পড়লো।

যে হোটেলে আমরা উঠেছি তার মালিক এক ইহুদী মহিলা। মহিলাটি পাক্কা ব্যবসায়ী বলেই মনে হলো। তার হোটেলের সংলগ্ন একটি ছোট্ট মদের দোকানও আছে। এখানেই তার সবচেয়ে বেশী আয়। টাগার্টে যেসব ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন হয় তার প্রায় সব ক'টিই তার জানা আছে। সবার সঙ্গেই তার ব্যবহার অমায়িক।

উকুন আর ছারপোকার সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করে আমরা সবশেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে আটটায় দরজায় কে ঘা দিল।

ঘুমের ঘোরেই ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম: কই এস্টলা? কারণ হোটেলের মালিক ফরাসী ভাষা খুব পসন্দ করে।

ব্যস্ত কণ্ঠে বললো: ও মশে, একজন ইংরেজ.....

আসছি, বলে দ্বার খুললাম। জিজ্ঞেস করলাম: ব্যাপার কি?

কাল এক ভদ্রলোক এসেছেন–তিনি বড় অসুস্থ।

আমি তো ডাক্তার নই।

সেজন্য নয়। তিনি ইংরেজী ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তিনি কি বলছেন কেউ তা বুঝতে পারে না। আপনি দয়া করে তা তর্জমা করে দিলে বড়ই উপকৃত হতেম।

আমি সম্মত হলাম। এক তরুণ যুবক একটা মস্তবড় বিছানায় শুয়ে আছে। আমি ইংরেজীতে কথা বললে সে আমেরিকান ধরনে জবাব দিলো।

বললো: আমেরিকান ভাষী লোক পেয়ে আমি বড়ই সুখী হলাম। এখানকার লোকগুলি আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

মালিক বললো: আপনি অসুস্থ?

আমার পেটের অসুখ। আফ্রিকা এসে অবধি আমার স্বাস্থ্য বড় খারাপ হয়ে পড়েছে।

কোথা থেকে আসছেন?

আমার নাম রসেকো ডি. টারবক্স। নিউইয়র্কে আমার বাড়ী। আলজিয়ার্সে এসে এখানে আসতে চাইলাম। বর্তমানে তিউনিস যাবার টিকেট করেছি। সেখান থেকে মিসর যাবার ইচ্ছা-অবশ্য যদি সেরে উঠি। বলে হাসলেন। আমার পেটটা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে।

লোকটির বয়স বিশ বছরের বেশী হবে না। চেহারায় তার বুদ্ধির ছাপ।

এতো খারাপ লাগছে যে আমার যেন পেট বলে কিছুই নেই এমনি মনে হচ্ছে।

মালিক মহিলাটি উদগ্রীব হয়ে ছিলো এতোক্ষণ। জিজ্ঞেস করলো, উনি কি বলছেন?

কিছু খেতে চায় কিনা যুবককে জিজ্ঞেস করলাম। ওরা যা দিতে চায় তার কোনোটাই তার পসন্দ নয়, তিনি চান 'স্যাণ্ড উইচ'।

আমি মালিককে সে কথা জানালে তাড়াতাড়ি তা এনে তাকে দেওয়া হলো। সে তা খেতে উদ্যত হলে আমি তাকে বারণ করলাম। বললাম: পাগল হয়েছো নাকি? পেটের অসুখে এ' খেলে কি আর রক্ষা আছে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আমার দিকে চাইলো।

এই শুধু আমি চাই, এ ছাড়া আর কিছুই খেতে পারবো না।

না, তা হয় না।

আমি মহিলাটিকে এক বোতল ক্যাস্টর অয়েল আনতে বললাম। তা নিয়ে আসলে তাকে চার চামচ খাইয়ে দিলাম। বললাম: কয়েক ঘণ্টা পরে কয়েকটা চকোলেট খেতে পারো, আর কিছুই নয়। তা হলেই সেরে উঠবে।

এতে সে খুশী হলো না। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম: একবার ক্যাসাব্লাঙ্কায় আমারও এরূপ হয়েছিলো। আমাকে ক্যাস্টর অয়েল আর চকোলেট খেতে দেওয়া হয়েছিলো শুধু।

টারবক্স ঘুমিয়ে পড়লো। সন্ধ্যায় একবার তাকে দেখতে গেলাম–তখন সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে।

আমায় দেখে এবার সে জিজ্ঞেস করলো: আপনি এই আরব বেশে কেন?

বললাম: আমি মরক্কো থেকে মিসর যাচ্ছি। পথে সমস্ত জাতির লোকদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানতে চাই।

আপনি কি একলা?

না। আবদুস সালাম নামক একটি আরব ছেলে আছে আমার সঙ্গে। কিন্তু এরপর আর সে আমার সঙ্গে যাবে কিনা বলতে পারি না।

আমিও মিসর যাচ্ছি। আপনার গাড়িতে কি আমায় নিতে পারবেন না? তাহলে আমিও সারা আফ্রিকাটা দেখতে পাবো।

কিন্তু এটা খুব আরামদায়ক ভ্রমণ নয়। যে কোনো সময় আমরা নিহত হতে পারি।

এটা তো বেশ ভালো কথাই। আপনি যদি জীবিত থাকেন, আমিও থাকবো।

কিন্তু তুমি তো আরবীয় একটা শব্দও জানো না। তাছাড়া তোমার গায়ে ইউরোপীয় পোশাক।

তার প্রস্তাবে আমি বেশী উৎসাহ বোধ করতে পারলাম না।

সে বললো: আমিও আরবী পোশাক পরবো। আরবী বলতে না পারলেও খারাপ কিছু বলে বসবো না। আমায় আপনি সঙ্গে নিন। সমস্ত দায়িত্ব আমার নিজের।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সম্মতি জানালাম। দু'দিন পর রেডিয়েটার মেরামত হয়ে গেলেই আমরা যাত্রা করবো।

আমার ধারণা ঠিকই হলো। আবদুস সালাম আর যেতে চায় না। তার ধারণা, সে তার প্রিয় মরক্কো থেকে এতো দূরে এসে গেছে যে কোনো দিনই হয়তো সে আর সেখানে ফিরে যেতে পারবে না। তারপর টারবক্সের তিউনিসের টিকেটটা আর কয়েক শ' ফ্রাঙ্ক তাকে দিলে সে আনন্দে নেচে উঠলো। সেই দিন সন্ধ্যায়ই সে চলে গেলো।

রেডিয়েটার সম্পূর্ণ সারানো সম্ভবপর নয়। ত্রিপোলী গিয়েই এটা বদলে ফেলতে হবে। এটা দিয়েই হয়তো সে পর্যন্ত যাওয়া যাবে।

একদিন সকালে টারবক্স আর আমি টাগার্ট ত্যাগ করে সোজা পূর্বদিকে তেজেউড়ের দিকে রওনা হলাম। তেজেউড় তিউনিস সীমান্তের অপরদিকে অবস্থিত। বৃদ্ধ আরবটি ঠিক কথাই বলেছিলো। সারারাত ধরে টাগার্টে বৃষ্টি হলো।

টাগার্টের আশেপাশের মাটি লাল কর্দমময়। শুকনোর সময় তা সুন্দর বালুতে পরিণত হয়। সামান্য বাতাসেই তা উড়তে থাকে। বৃষ্টিতে তা এখন কাদায় পরিণত হয়েছে। কয়েক বারই গাড়ির চাকা কাদায় আটকে গিয়েছিলো। দুপুর বেলা চাকা পিছলে গিয়ে একটা গর্তে পড়ে যায়। তাতে কয়েক ফুট পানি জমেছিলো। সারাদিন চেষ্টা করেও তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম না। খচ্চর নিয়ে একটি আরব সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। তার কাছে সাহায্য চাইলাম। উত্তরে সে বললো: যেতেই যখন পারছো না তখন টাগার্টে থেকে গেলে না কেন?

আমাদের গাড়িটা তুলে দিলে তোমায় যথেষ্ট টাকা দেবো।

কাফির ফরাসীদের আমি কিছুতেই সাহায্য করি না। তোমরা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছো।

আমি ফরাসী নই। তোমার মতই একজন মুসলমান।

একটা ঝাঁকানি দিয়ে খচ্চর দু'টিকে সে থামালো। বললো: সত্যি কথা বলছো তো? সূরা ফাতিহা বল দেখি? তাহলেই বুঝতে পারবো সত্য বলছো কিনা।

আমার সূরা ফাতিহা আবৃত্তি শুনে সে খুব খুশী হলো। দু'মিনিটের মধ্যে খচ্চরের সাহায্যে গাড়ি তুলে নিলাম। আরব তার মেহনতের জন্য ধন্যবাদটুকু পর্যন্ত নিতে রাযী নয়। গর্বোন্নত মস্তকে সে টাগার্টের দিকে চলে গেলো।

খানিক দূরে এগিয়েই রাস্তা বেশ ভালো পাওয়া গেলো। গাড়ির বেগ বাড়িয়ে দিলাম। ঠিক দশটার সময় একটা ছোট গ্রাম নযরে পড়লো। সেখানে কোনো হোটেল আছে কিনা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, নেই। পোস্টাফিসে অনুসন্ধান করতে বলা হলো।

দরজায় ঘা দিয়েও কোনো সাড়া না পেয়ে গাড়িতেই ঘুমাবার বন্দোবস্ত করলাম। ক্ষুধায় তখন আমরা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি। একটা লোক একটা বাতি হাতে করে এসে আমাকে উঠালো। আমাদের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো: কে আপনারা?

আমরা তাকে বুঝিয়ে বললাম: আমরা পোস্টমাস্টারের জন্য অপেক্ষা করছি।

আমিই পোস্টমাস্টার। কি চান?

বললাম: আমরা আজ রাত্রে এখানে ঘুমাতে পারি কি-না। খানিকক্ষণ আমাদের দিকে চেয়ে থেকে মনস্থির করলো। বললো: তা পারেন। আপনারা কি ক্ষুধার্ত?

আমরা অস্বীকার করতে পারলাম না। দুটি ছেলেকে সে ডাকলো। ঘুমজড়িত চোখে হোঁচট খেতে খেতে তারা এলো।

এরা ভাইপো। পোস্টমাস্টার হলেও এখানে আমার একটি স্কুলও আছে।

ঘুমে ব্যাঘাত হওয়ায় ছেলে দুটি আমাদের দিকে বেকুফের মতো চেয়ে রইলো। খাবার পর গ্রামোফোন বাজান হলো। রাত দুপুরের সময় মেজের উপর খড়ের মাদুরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল সাতটার সময় স্কুল মাস্টার এসে আমাদের ঘুম ভাঙালো।

বললো: উঠুন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই স্কুল আরম্ভ হবে। পোস্টাফিসের গাড়ি এখনই এসে পড়বে।

এখানে তাহলে গাড়ি আসে?

হাঁ। প্রতি সপ্তাহে আলজিয়ার্স থেকে একবার করে ডাক নিয়ে আসে। আজ ব্রিস্কা থেকে আসছে।

আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম।

স্কুল মাস্টার একটা মস্ত বড় ঘণ্টা এনে বাজাতে লাগলেন। ছেলেরা স্কুলে এসে জড়ো হলো। মোট ছাত্র বিশ থেকে ত্রিশটির বেশী হবে না। পড়া শুরু হলো। ছেলেরা মেজেতে বসে শ্লেটে কুরআনের আয়াত লিখছে। তারপর চেঁচিয়ে এক সঙ্গে তারা পড়তে লাগলো। বড় ছেলেরা একটা সূরা পড়ে, ছোটরা পড়ে আর একটি, তাতে এতো গোলমাল হচ্ছে যে নিজের কথাই নিজে শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কারও ভুল হওয়া মাত্রই মাস্টার তা ধরে ফেলেন। ধরে ফেললেই সে ছেলের শাস্তি অনিবার্য। তাকে হাত পাততে হয় আর একটা রুলার দিয়ে মাস্টার তাতে দু'তিনবার আঘাত করেন।

পাড়ার মাঝখানেই দূরে গাড়ির শব্দ শোনা গেলো। মাস্টার খুব জোরে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। বললেন: এবার তোমাদের ছুটি। ছেলেরা ময়দানে দৌড়ে বেরিয়ে পড়লো। স্কুল ঘরটি পোস্ট অফিসে পরিণত হলো।

গাড়ি এসে পৌঁছলো–ছ'চাক্কার, মরুভূমির উপযোগী। ড্রাইভার ফরাসী। এই ছোট্ট গ্রামে গাড়ি বেশীক্ষণ থামে না। ডাক দিবার ও নেবার জন্যই শুধু আসে। সামান্য কয়টি চিঠিতে স্ট্যাম্প লাগালো। ফ্রেঞ্চ রিপাব্লিকের একজন বেসামরিক কর্মচারীর গুরুত্ব ও গৌরব তার চেহারায় ফুটে উঠলো।

আমি ড্রাইভারের কাছে গেলাম।

তার গাড়িতে জুড়ে আমার গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

কয়েক ঘণ্টা অতি কষ্টে গাড়ী চালিয়ে তেজেউড় পৌঁছলাম। তিউনিসের দক্ষিণে এটা একটি ইউরোপীয় শহর। এখানেই আমরা রাত কাটালাম।

এখান হতেই আমাদের সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল ও কষ্টপূর্ণ যাত্রা শুরু হবে। এখান থেকে বিস্তৃত মরুভূমির ভিতর দিয়ে যেতে হবে। তেজেউড়ের চারদিকে দুর্গম পর্বতশ্রেণী। মোটর চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। শীতকালে শুধু উত্তর এবং দক্ষিণ দিক থেকে শহরে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণদিকে মরুভূমি আর পূর্ব দিকে বৃহৎ লবণ হ্রদ। দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় লবণ হ্রদ খুব বেশী। শীতকালে কয়েক ফুট মাত্র পানি থাকে। সবচেয়ে বড় যে হ্রদটি তার নাম শাতিল জেরিদ। এই বৃহৎ হ্রদটি আমাদের পার হয়ে যেতে হবে। সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানটি বিশ মাইল চওড়া। প্রথম কয়েক মাইল শক্ত লবণের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে গাড়ি চালাতে সমর্থ হলাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে কয়েক ইঞ্চি পানি দেখতে পেলাম, ক্রমে তা বেড়ে চললো। শেষটায় গাড়ির রানিং বোর্ড পর্যন্ত ডুবে গেলো।

অতি সতর্কভাবে গাড়ি চালালেও কিছু পানি ছিটকে ইঞ্জিনে এসে পড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ডিস্ট্রিবিউটারে ছোট ছোট গোল দাগ হয়ে গেলো। গাড়ি গেলো থেমে। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর গাড়ি চললো। কোনো রকমে তীরে এসে পৌঁছলাম। লবণ পানিতে আমাদের পায়ের মাংস গলে যেতো। এর ভাঁপের ক্রিয়া আমাদের মুখে ও হাতে অনুভব করলাম। তার উপর সূর্যের উত্তাপ ছিলো অত্যন্ত প্রখর। চার ঘণ্টা লাগলো হ্রদ পার হতে।

পথের চিহ্ন খুব স্পষ্ট নয় এখানে। তাই ধরে সন্ধ্যার সময় একটা ছোট গ্রামে একটা কূপের কাছে পৌঁছলাম। আমরা সেখানে আমাদের গাড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করছি এমন সময় এক যুবক বললো: বছরের এই সময়ে আপনারা কি সত্যি শাতিল জেরিদ পার হয়ে এসেছেন? আপনাদের বড় সৌভাগ্য যে আপনারা আপনাদের গাড়ি সহি-সালামতে নিয়ে আসতে পেরেছেন। দু'মাস আগে যখন পানি আরো কম ছিলো তখন একটা মোটর কাদায় ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হ্রদের তলা কি শক্ত নয়?

মোটেই না। শীতকালেই শুধু সংকীর্ণ একটি স্থান শক্ত হয়।

টারবক্সের দিকে চাইলাম। আমাদের কৌশল নয়, ভাগ্যই আমাদের এই সাফল্যের কারণ।

অনেক রাত পর্যন্ত কুয়ার ধারে গ্রামবাসীদের সঙ্গে চা পান করলাম। অনেক রাত ধরে গল্প চললো। তিউনিসিয়ার আরবরাই প্রকৃত আরব রক্তের অধিকারী।

ফরাসীদের আগমনের পূর্বে তিউনিসিয়া যখন স্বাধীন ছিলো তখনকার অনেক কথাই তারা বললো। তারপর বললো তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তাদের আশা একদিন, তা খুব বেশী দূরে নয়, যখন দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম, যারা এখন আত্মকলহে মত্ত আছে, এক হবে এবং সেদিন তারা তাদের দেশ থেকে বিদেশী শোষণকারীদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হবে।

এক যুবক আমায় সম্বোধন করে বললো: মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? তিনি কি ইসলামের মুক্তি আনতে পারবেন না? আপনি জানেন, মুস্তফা কামাল এশিয়া থেকে গ্রীকদেরে তাড়িয়েছেন? গ্রীকদের পরাজয় প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদেরই পরাজয়।

এক বৃদ্ধ বললো: কি বোকার মতো কথা বলছো। জানো না, মুস্তফা কামাল খুব ভালো মুসলিম নন। তিনি মদ খান এবং তিনি নাকি সেখানকার লোকদের তুর্কি টুপী পর্যন্ত পরতে নিষেধ করেছেন।

আমি তার কথা সমর্থন করে বললাম: একথা সত্য যে তুর্কীরা ইসলাম নষ্ট করে ফেলেছে। তুর্কীরা যেখানেই যায় সেখানেই ধ্বংস অনিবার্য– ঘাস পর্যন্ত সেখানে জন্মায় না।

যুবক বৃদ্ধের দিকে চাইলো। বললো: কিছু করতে হলে আমাদের এক হতে হবে মুস্তফা সাহেব।

তা তো হতেই হবে, তা হবে আরবদের দ্বারা।

ভালো যা তার সব আরব থেকেই হয়েছে।

আমি বললাম: ইব্‌নে সউদ মহান ব্যক্তি। কামালের চেয়ে ইবনে সউদের উপরই আমার আস্থা বেশী।

মুস্তফা মাথা নাড়লেন। বললেন: ইবনে সউদেরই খলীফা হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু আমাদের জীবনে তা হলো না। বলে আফসোস্ করতে লাগলো।

রাত অনেক হয়ে এসেছে। বিদায়ের সময় মুস্তফা বললেন: শীঘ্রই রমযান শেষ হবে। ঈদের সময় আপনি কোথায় থাকবেন?

আল্লাহ চাহে তো সে সময় ত্রিপোলীতে থাকবো।

আপনি কি সেখানে ঠিক মতো পৌঁছতে পারবেন? ইটালিয়ানরা বড় ভালো লোক নয়।

সে দেখা যাবে তখন।

টারবক্স আমাদের আলোচনার এক কণাও বুঝতে পারলো না। বড় আশ্চর্য যে এই আমেরিকান যুবক আরব দেশে এই অদ্ভুত লোকদের মাঝে নিজেকে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে করছিলো। ওদের দেশের শতকরা একজনও এদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

পরদিন সূর্যোদয়ের আগেই আমরা যাত্রা করলাম। রাস্তা ক্রমে ভালো হয়ে আসে। মাঝে মাঝে ফুলের গন্ধও ভেসে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গারেজে পৌঁছলাম। গারেজ একটি ফরাসী শহর—এখানে আরব খুব কম। রাস্তাগুলি ইউরোপীয় ধরনের—বড় বড় সিনেমা ঘরে আমেরিকান ফিল্মের মনোজ ও প্রচারপত্র। ব্যাঙ্ক ও কারখানাও এখানে যথেষ্ট। অদূরে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি সূর্যকিরণে ঝিকমিক করছে। আমাদের ভ্রমণের প্রথমাংশ এখানেই শেষ।

ত্রিপোলীর উপর রোমান ঈগল

ত্রিপোলীর সীমান্ত পর্যন্ত একটা ভালো রাস্তা বরাবর ডান দিকে চলে গেছে। মোটরটা মেরামত করে সকাল বেলায়ই যাত্রা করলাম। সন্ধ্যার আগেই পঁচানব্বই মাইল রাস্তা অতিক্রম করে সীমান্তে পৌঁছাতে পারবো বলে ধারণা করলাম। কাস্টম অফিসারদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ, মরুভূমি দিয়ে আসতে মরক্কো-আলজিরিয়া সীমান্তের কাস্টম অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথারীতি স্ট্যাম্প দেওয়া হয় নাই। টারবক্স বললো যে, রাতের বেলায় ইটালিয়ান এলাকায় ঢুকে পড়বার চেষ্টা করতে হবে। সন্ধ্যা সাতটায় বেশ অন্ধকার হয়ে এলো। আমরা সীমান্তের এক শহরে এসে পৌঁছলাম। কোথাও না থামিয়ে রাস্তা দিয়ে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দিলাম। আমাদের ধারণা ছিলো যে, ইটালিয়ানদের প্রথম পোস্ট খুব বেশী দূরে হবে না। অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিপজ্জনক একটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত আর দুপাশে গভীর খাদ। আমরা ভাবলাম, সীমান্ত থেকে এতোক্ষণে অনেক দূরে এসে পড়েছি। এমন সময় একটা মোটর একটা খাদে পড়ে আছে দেখতে পেলাম। তার চালক পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি? জিজ্ঞেস করলাম।

ধন্যবাদ! দরকার হবে না। শীঘ্রই সাহায্য এসে পড়বে। আমার গাড়ির স্টীয়ারিং গিয়ার বিকল হয়ে গেছে।

ত্রিপোলীর নিকটতম শহর কত দূর?

আরো কুড়ি মাইল সামনে। তার আগে ফরাসী মিলিটারী পোস্ট আপনাদের পার হতে হবে।

ভাবনায় পড়লাম। ভেবেছিলাম, আমরা ত্রিপোলী পৌঁছে গেছি, কিন্তু এখনো আমরা ফরাসী রাজ্যেই রয়ে গেছি। আরো দ্রুত চলতে হবে আমাদের।

ছ'মাইল গিয়ে রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। তিন-চারটি অস্পষ্ট পথরেখা বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। কোন্ পথে যাবো কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ভাগ্যের উপর নির্ভর করে মধ্যের রাস্তা ধরেই এগিয়ে চললাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাঁদিকে কয়েকটি আলো

দেখতে পেলাম। ছোট ছোট কয়েকটি কুঁড়েঘর থেকে তা আসছে। হেড লাইটের আলোতে দেখতে পেলাম সামনেই একটা বিদঘুটে দালান। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি এমন সময় অন্ধকার থেকে দৃঢ়কণ্ঠে কে বললো: "এরেটেজ্?"

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে দিলাম। দেখলাম ফরাসী টুপী পরিহিত এক আরব সৈনিক আমাদের দিকে বন্দুক লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী থামালাম, সে আমাদের কাছে এলো। তার প্রশ্নের উত্তরে তাকে ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বললাম যে আমরা ত্রিপোলী যাচ্ছি। কোনো কথা না বলে সে কয়েক বার বংশীধ্বনি করলো।

একটি সার্জেন্টের সঙ্গে কয়েক জন সৈন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো। তারা আমাদের পাসপোর্ট চেয়ে নিলো। তারপর ভালো করে তা পরীক্ষা করে বললো– পাসপোর্টটি জাল।

আমি তাকে বললাম: জাল নয়, পাসপোর্টটি ঠিক। টারবক্স আমেরিকান নাগরিক হিসাবে প্রতিবাদ করলো, কিন্তু সার্জেন্ট কিছুই শুনলো না। তার ধারণা, আরব-বেশে আমরা ইটালিয়ান গুপ্তচর।

সীমান্তের যে শহর দিয়ে আমরা এসেছি সেখানে ফোন করা হলো, কিন্তু উত্তরে আমাদেরে সেখানে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ এলো।

রাত্রে আমাদের একটা হোটেলে থাকতে দেওয়া হলো। সারা রাত দ্বারে পাহারা রাখা হয়েছে। সকাল বেলা সামরিক কর্তৃপক্ষের সামনে আমাদের হাযির করা হলো। কিন্তু কোথাও কোন গলদ তারা পেলো না। তখন তারা আমাদের সীমান্ত পার হয়ে ত্রিপোলী যাওয়ার অনুমতি দিলো।

তারপরই কাস্টমের পালা।

দুর্বল মন নিয়ে কাস্টমস বিল্ডিং-এ গেলাম। আমাদের আশঙ্কা ছিলো তারা হয়তো আমাদের গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করবে; কিন্তু ফল হলো আমাদের আশার অতিরিক্ত। আমি বললাম: মরুভূমিতে কোন কাস্টম অফিসারের দেখা আমরা পাইনি। অফিসার সে কথা বিশ্বাস করলেন। কয়েকটি কাগজ লিখে তাতে স্ট্যাম্প লাগিয়ে তিনি তা আমাদের হাতে দিলেন। কিন্তু শেষে তিনি আমাদের বারো ফ্রাঙ্ক জরিমানা করলেন।

আমরা সোজা সীমান্তে যেয়ে পৌঁছলাম। সেই মোটা সার্জেন্টটি চশমা নাকে এঁটে আমাদের অনুমতিপত্রখানা পড়লো। পরে বললো: আপনাদের পরম সৌভাগ্য যে কাল রাত্রে আপনাদের যেতে দেওয়া হয়নি।

কেন?

ইটালিয়ানরা কিছুতেই আপনাদের যেতে দিতো না। সন্দেহ হলেই ওরা গুলী করে বসে।

তার সঙ্গে গুটিকতক কথা বলেই "জনমানবহীন দেশের" ভিতর দিয়ে ইটালীয় উপনিবেশ ত্রিপোলীর দিকে গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

অনেকক্ষণ ধরে শক্ত মাটি, ঘাস ও বালুময় রাস্তা দিয়ে আমাদের চলতে হলো। আমরা প্রায় সমুদ্রের নিকটেই এসে পড়েছি। কয়েকটি শিকারী পাখী ভীষণভাবে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু কোন জনমানবের চিহ্নও সেখানে দেখতে পেলাম না।

প্রায় ঘণ্টা খানেক চলার পর রাস্তার বাম পাশে একটা দুর্গে এসে পৌঁছলাম। তারপরই দেখতে পেলাম একটা খুঁটিতে ইটালিয়ান পতাকা–উপরে তার ধাতু নির্মিত রোমান ঈগল, একটা মস্তবড় কাঠ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা: "থামো।"

আমাদের মোটরের শব্দ শুনেই ইটালিয়ান পোশাক পরিহিত কয়েকজন আরব দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো। নিকটে আসতেই তারা চিৎকার করে বাঁ-দিকে দুর্গে যাবার হুকুম করলো।

সেখানে গিয়ে তিনটি ইটালিয়ান অফিসারকে দেখতে পেলাম। এতোক্ষণ তাঁরা বেশ ফুর্তি করছিলেন। আমাদের দেখেই তাঁরা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

প্রধান অফিসারটি একজন ক্যাপটেন, গাড়ির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন: Capite Italiono?

আমি উত্তর দিলাম যে আমি ইটালী ভাষা জানি না, ফরাসী জানি।

মুখ তাঁর আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললেন: এখানে আমরা ইটালী ভাষা বলি।

এদের মধ্যে একজন ফরাসী জানতেন। তিনি আমাদের আলাপ তর্জমা করতে লাগলেন।

আপনি তিউনিস থেকে আসছেন, আর যেতে চান ত্রিপোলী? আপনার পাসপোর্টখানা দেখি। ত্রিপোলী ত্যাগ করবার কোন অনুমতিপত্র আনেন নি?

আমি তো ত্রিপোলী যাইনি।

তা আগে বলেন নাই কেন? বলে পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র উল্‌টাতে লাগলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কি আমেরিকান?

না, আমি ডেনিশ।

কোথায় যেতে চান?

ত্রিপোলী।

তারপর?

মিসর।

এই গাড়িতে করে? বলে মুচকি হাসলেন। অন্য অফিসাররাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। বাস্তবিক গাড়ির যে অবস্থা তাতে ভরসা নেই বেশী।

ত্রিপোলীর পর আপনাকে আর যেতে দেওয়া হবে না।

এখনই কি যেতে পারি?

না, আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে।

গাড়িতেই আমরা বসে রইলাম। কেউ আর আমাদের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেয় নাই। আমাদের পাসপোর্ট তাদের অফিসে রয়েছে।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলো।

আমাদের খুব পিপাসা পেয়েছিলো। পানি চাইলাম, কিন্তু তা পাওয়া খুব কঠিন। এদিকে সূর্য অস্ত গেলো।

সেই দুর্গেই আমরা রাত কাটাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সাতটার সময় ফরাসী ভাষা জানা অফিসারটি আমাদের কাছে এলেন। আমাদের তখন খুব ক্ষুধা পেয়েছিলো।

আপনাদের সৌভাগ্য যে যাবার অনুমতি পেয়েছেন। আপনাদের অনুমতি পত্র যোগাড় করতে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং কর্তাদের বুঝাতেও কম বেগ পেতে হয়নি আমার। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।

ফটক দিয়ে আমরা চললাম। ফটকের উপর মারবেল পাথরের প্লেটে লেখা ছিলো "কঠোর সংগ্রামের পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল ৯ম ব্যাটেলিয়ান এই স্থানটি দখল করে। সেই যুদ্ধে নিম্নোক্ত অফিসারবৃন্দ নিহত হয়েছিলেন"– ইত্যাদি।

অফিসারটি আমাদেরে তাদের কমান্ডারের নিকট নিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিট আমরা সেখানে অপেক্ষা করলাম। তারপর তিনি লম্বা রাইফেলধারী একটি আরব সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন: এই লোকটি আপনাদের নিয়ে গিয়ে সেখানকার কমান্ডারের কাছে পৌঁছে দেবে। আপনারা যেতে পারেন কিনা তিনিই তা ঠিক করবেন।

সৈন্যটিকে তিনি দশটি কার্তুজ দিলেন। দু'টি সে রাইফেলে ভর্তি করে বাকীগুলি তার বেল্‌টে রাখলো।

সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞেস করলাম: আমাদের কি তাহলে গ্রেফতার করা হলো?

ঘাড় নেড়ে অফিসারটি বললেন: সোয়াবার কমান্ডারের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আপাতত আপনারা বন্দী। তারপর আপনাদেরে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সৈনিকটিকে গুলী দেওয়া হলো কেন?

এটা এই উপনিবেশের নিয়ম। যতক্ষণ এখানে আছেন ততক্ষণ নিয়ম আপনাদের মেনে চলতে হবে।

বেশ ভালো পথেই সোয়াবার দিকে চললাম। সোয়াবার যখন পৌঁছলাম তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। সৈনিকটি তখনই কমান্ডারের কাছে আমাদের যেতে বললো।

একটা শূন্য অফিস কক্ষে আমাদেরে নেওয়া হলো। দশ মিনিট পর তিন-চারটি যুবক অফিসারসহ সোয়াবার কমান্ডার আমাদের কাছে এলেন।

তাদের কেউই ইটালিয়ান ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানেন না। একজন আরবকে ডাকা হলো আমাদের দোভাষীর কাজ করার জন্য। পরে জানতে পারলাম, তিনি সেখানকার একজন শিক্ষক।

কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন: কোথা থেকে আসছেন?

তিউনিস থেকে।

যাবেন কোথায়?

ত্রিপোলী।

তারপর, সেখান থেকে?

বেন্‌গাজী।

বোধ করি তার অনুমতি পাবেন না। কারণ ত্রিপোলী থেকে বেন্‌গাজী যাবার কোন পথ নেই। সেদিক দিয়ে কাউকেই কোনদিন যেতে দেওয়া হয় নাই। আপনারা কোন্ দেশের অধিবাসী?

ইনি আমেরিকান আর আমি ডেনমার্কের অধিবাসী।

ডেন্‌মার্ক? সে আবার কোথায়? আপনি কি আরব?

না আমি আরব নই। আমার দেশ উত্তর ইউরোপে।

কি জানি। তা জানি না। আপনি আরবী পোশাকই বা পরেছেন কেন, আর আরবীতেই বা কথা বলছেন কেন?

উত্তর আফ্রিকার লোকদের সম্বন্ধে খুব ভাল করে জানবার জন্য, আর আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

তা কি রাজনৈতিক কারণে?

না। এর একমাত্র কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে ইসলামই একমাত্র খাঁটি ধর্ম।

ও তাই? আপনাকে পুলিশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তারাই ঠিক করবে এরপর আপনাদের কি করতে হবে।

আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পর বিদায় নিলাম। আমাদের রক্ষী সৈনিকটি ফিরে গেল। আরবী শিক্ষক তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। নাম তাঁর ইবরাহীম আবদুল করীম। সোয়াবার মাঝখানে তাঁর মস্তবড় বাড়ী।

রাত্রে তখনও বেশ শীত ছিলো, একটা কক্ষের এক জায়গায় আগুন জ্বলছিলো, আমাদেরে সেখানেই বসানো হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চাকর চা নিয়ে এলো। ইবরাহীম বললেন: আমি শুনলাম আপনি নাকি মুসলিম?

হাঁ।

আপনাকে মেহমানরূপে পেয়ে নিজকে ধন্য মনে করছি। আপনার সঙ্গীটিও কি মুসলিম?

না, ইসলাম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু এখনো জানেন না।

ইউরোপে কি খুব মুসলিম আছে?

হাঁ, ইংল্যান্ড আর জার্মানীতে বর্তমানে অনেক মুসলিম আছে।

দরজায় ঘা পড়লো। কয়েকজন লোক এসে ঢুকলেন। একজনের মুখে মস্তবড় একটা দাগ। সবাই আমাদের সঙ্গে মোসাফা করে আগুনের কাছে বসলেন।

আমায় দেখিয়ে ইবরাহীম বললেন: এই বিদেশী একজন মুসলিম।

তাঁরা আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। মুখে দাগওয়ালা লোকটি বললেন: তাহলে তো ত্রিপোলী দিয়ে যাওয়া এঁর পক্ষে খুব কঠিন হবে।

বোধ হয় তেমন কঠিন হবে না, ইবরাহীম বললেন।

আমার তো বিশ্বাস হয় না। সারা ত্রিপোলীই আজ আত্মসমর্পণ করেছে। যারা করে নাই তারা হয়তো কথাই বলবে না।

ইবরাহীম লোকটিকে চুপ করতে বললেন। কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম: আমরা মোটরে এসেছি। মোটরে করেই আমরা সাইরেনিকা ও বেন্‌গাজী যাবো।

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: সাইরেনিকা যাবেন? সেখানে যে এখনো লড়াই চলছে। পর্বতের মধ্য দিয়ে আপনি যেতে পারবেন না।

কত দিন ধরে যুদ্ধ চলছে?

প্রায় আঠারো বছর।

তিনি তাঁর মুখের দাগ দেখিয়ে বললেন: এখন অবশ্য তা শেষ হয়েছে। আনওয়ার পাশা ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছিলেন তা আমার মনে আছে। আমি সে যুদ্ধে ছিলাম।

ইবরাহীম আমায় প্রশ্ন করলেন: আপনি আরবীতে কথা বলতে কোথায় শিখলেন?

মরক্কোতে।

তাই আপনার কথায় পশ্চিমের ছাপ। আবদুল করীম কি আজো সেখানে যুদ্ধ করছেন?

না, সে যুদ্ধ তো অনেক কাল আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন তিনি মাদাগাসকারে রি-ইটালিয়ান দ্বীপে বন্দী। দাগওয়ালা লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন: যতোদিন আমরা এক না হই ততোদিন সব জায়গাতেই এরূপ ঘটবে।

খাবার আনা হলো। ইবরাহীম আমাদেরে দাওয়াত করলেন। আমাদের খুব ক্ষুধা পেয়েছিলো। পেট ভরে খেলাম। খাওয়ার পর অনেক রাত অবধি আলাপ চললো। আমরা যখন শুয়ে পড়ছি ঠিক সেই সময় দাগওয়ালা লোকটি আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন: আপনি বলেছেন যে আপনি একজন সাংবাদিক। ইউরোপ গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করবেন, যে কৃষ্টি আমরা চাই না, তাই তারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায় কেন? কোন্ অধিকারে? আমরা যদি একদিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের দেশে গিয়ে হাযির হয়ে বলি: আমরা এখানকার শাসক। আমরাই এখানকার ন্যায়সঙ্গত প্রভু। যারা আমাদের বিরোধিতা করবে তারাই বিদ্রোহী। দাঁতে দাঁত ঘষে

তিনি আবার বললেন: কুকুরের চেয়ে খারাপ ব্যবহার এরা আমাদের সঙ্গে করছে। ঠিক কথা বলতে গেলে–

কথা শেষ না করেই তিনি চলে গেলেন। ইবরাহীম আমার কাছে এসে বললেন: সিদি হোসেনের কথায় কিছু মনে করবেন না। তার বলবার উদ্দেশ্য এ ছিলো না।

তার দিকে চেয়ে বললম: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একথা আমি কারো কাছে প্রকাশ করবো না।

পরদিন সকালে ইবরাহীম আমাদের বিদায় দিতে রাযী ছিলেন না, কিন্তু আমরা থাকতে পারলাম না। রাজধানী ত্রিপোলী এখনো পঁচাত্তর মাইল দূরে। আজ সেখানে পৌঁছতে হলে দেরী করা চলে না।

সোয়াবার থেকে ত্রিপোলী পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়েছে তা এতো ভালো যে ইউরোপেও এমন ভালো রাস্তা আমি দেখি নাই। রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত কিন্তু গাড়ি বা লোক চলাচল খুব কম। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালালাম। ত্রিপোলীর খুব কাছে না আসা পর্যন্ত কোথাও একটি লোক দেখতে পেলাম না।

আমরা ত্রিপোলী যেদিন পৌঁছি সেদিনই সেখানে উপনিবেশ প্রদর্শনী শুরু হয়। এই প্রদর্শনীকে নতুন ইটালী–নতুন রোমান রাষ্ট্রের শক্তি আর গৌরবের প্রদর্শনীই বলা চলে। প্রত্যেকটি সরকারী বাড়ীর উপর ইটালীর পতাকা উড়ছে। কালো কোর্তা পরা তরুণ ফ্যাসিস্টরা ফ্যাসিস্ট সঙ্গীত গেয়ে রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলেছে। সর্বত্রই ফ্যাসিস্টদের প্রতীক অঙ্কিত। তার নীচেই লেখা রয়েছে নতুন ইটালীর সন 'এন্নো মুসোলিনী ৮' (Anno Mussolini viii) । প্রতিটি দেওয়ালে কালো রঙ্গে তাদের ডিকটেটরের মস্তক অঙ্কিত–তার নীচে প্রাচীরপত্রে লেখা রয়েছে, "যারা আমাদের পক্ষে নয়, তারাই আমাদের বিরোধী।"

স্থলপথে ত্রিপোলী পৌঁছলে প্রথমেই চোখে পড়ে শহরের ইটালীর অংশ। এই অংশটি আরবদের বাসস্থান মেদীনা এবং ইহুদীদের বাসস্থান মেল্লাহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শহরের এই আধুনিক অংশটিকে একটি থিয়েটার শহর বলা চলে। দ্রুত তৈরী কিন্তু চমৎকার। ইউরোপের যে কোনো শহরের সহিত এর তুলনা করা চলে।

ত্রিপোলী শহরের চারদিকে লিবিয়া মরুভূমি। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত জনহীন হলদে বালুরাশি, মাঝে মাঝে খর্জুরকুঞ্জ শোভিত ছোট ছোট মরূদ্যান। বেঁচে থাকার মত খাবারের জন্য এর মধ্যে ঘুরে বেড়ায় বেদুইনের দল। এ সত্ত্বেও ত্রিপোলী একটি সমৃদ্ধিশালী শহর।

একটা বড় রাস্তা দিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে চলেছি, এমন সময় একটি চট্‌পটে পুলিশ আমাদের গতিরোধ করে বললো: সিনর, আজ এই প্রধান রাস্তা দিয়ে মোটর চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একটি শোভাযাত্রা এখনই এখানে এসে পৌছবে, কাজেই আমাদের ঘুরে একটা ছোট রাস্তা দিয়ে যেতে হলো। প্রধান রাস্তা থেকে যতোই এগিয়ে চলেছি, শহরের সৌন্দর্যও ততোই কমে আসছে।

টারবক্স অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। সে হোটেলের অনুসন্ধান করতে লাগলো। অনেকবার লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে আমরা ত্রিপোলীর বৃহত্তম হোটেল এল্‌বাগে নেজোলেনে পৌছলাম।

পোর্টার হাত উঠিয়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় আমাদের অভ্যর্থনা করলো। এখানে সবাই এই প্রথায় অভিবাদন জানায়। সারা ত্রিপোলী ফ্যাসিজমে উন্নত, যদিও এটি মাত্র অষ্টম বর্ষ।

হোটেলে বহু সাংবাদিক, বিশেষ করে জার্মান ও ইটালিয়ান সাংবাদিকদের ভিড়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন দেখতে এসেছে। গাড়ি গ্যারেজে রেখে আমরাও তা দেখতে গেলাম।

প্রধান রাস্তাটিকে জনসমুদ্র বলে মনে হচ্ছে। শহরে আরব, মরুচারী, বেদুইন, মেল্লার, অপরিচ্ছন্ন ইহুদী এবং তাদের নারীরা কোলে-কাঁখে সন্তান নিয়ে চলেছে। ইটালীয় ভিক্ষুক অন্যদের কাছ থেকে তাদের জাতীয় আভিজাত্য বজায় রেখে একটু দূরে দূরে চলেছে। সবাই এসে এখানে ভিড় জমিয়েছে। পুলিশ দল ব্যাটন হাতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে জনতাকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। অদূরেই ফ্যাসিস্টদের কুচকাওয়াজের শব্দ শোনা গেল। ইটালিয়ানরা আনন্দে ও উৎসাহে চিৎকার করছে, আরবরা চুপচাপ চারটে ছিন্ন পতাকা নিয়ে এগিয়ে এলো। এই পতাকাগুলি তারা নিয়ে আসছে ত্রিপোলীর বহু দক্ষিণে অবস্থিত দুটি মরূদ্যান থেকে। সম্প্রতি তারা মরূদ্যান দুটি অধিকার করেছে বোমা ও মেশিনগান দিয়ে, মুষ্টিমেয় বেদুইনের কাছ থেকে।

ছিন্ন বিজিত পতাকা দেখেই ইটালিয়ানরা উচ্চৈস্বরে আনন্দ-ধ্বনি করে উঠলো। ইটালী জিন্দাবাদ, মুসোলিনী জিন্দাবাদ।

আরবরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দলটি চলে গেলে খানিকক্ষণ সব নীরব। আমি প্রথম সারিতে টারবক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটি ইটালীয় সৈনিক। আমি ভাঙা ইটালীয় ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম: মূল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে কোন্‌খানে?

তার ভাষায় কি যেন বলে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো। বললো: এই দলটি প্রদর্শনীতে যাচ্ছে শহরের বাইরে। পরে বললো: দেখছেন না আমি বজেনবাসী।

বজেনবাসী?

হাঁ, হাঁ, এখন তার নাম হয়েছে বলজানো, টাইরেনে শহরটি অবস্থিত।

এখন বুঝলাম।

পরে সে বললো: আপনি কি প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন?

না। আমরা বেন্‌গাজী যাচ্ছি।

বেন্‌গাজী? আপনার জাহাজ কবে ছাড়বে?

আমরা মোটরে যাচ্ছি।

বেন্‌গাজী যাওয়ার অনুমতিপত্র পেয়েছেন?

না, এখনো পাইনি। আজ সব অফিস বন্ধ। তবে হয়ে যাবে।

আমার তো তেমন মনে হয় না। এই কদিন আগে, দু'জন আমেরিকান এসেছিলো। তাদের মোটর জাহাজে করে আলেকজান্দ্রিয়া নিয়ে যেতে হয়েছিলো। আমার যত দূর মনে হয় এ পর্যন্ত কেউ মোটরে বেন্‌গাজী যেতে পারে নাই। তা এক্কেবারেই অসম্ভব।

কেন?

মাথা নেড়ে বললো: গাড়ি চলার কোন পথ নেই। তাছাড়া লিবিয়া মরুভূমির বেদুইনরা বড় হিংস্র প্রকৃতির। তারা যদি আপনাদের একবার ধরতে পারে তা' হলে মোটরসহ পুড়িয়ে মারবে। এর চেয়ে আরও ভীষণ কিছু ঘটতে পারে।

আমরা তো আর আরবদের সঙ্গে লড়াই করছি না, তাছাড়া আমি বেশ ভালো আরবী জানি।

সে শুধু হাসলো।

আহ! আপনি ওদের জানেন না। লিবিয়া মরুভূমির বেদুইনরা সাহারা মরুভূমির আরবদের মতো নয়। এরা পশুর চেয়েও খারাপ। এরা যা করেছে তা অতি ভয়ঙ্কর। অনেক গল্প এ সম্বন্ধে আপনাকে বলতে পারি। যেসব ইটালিয়ান অফিসার এদের কবলে পড়েছে, তারা ভীষণভাবে নির্যাতিত হয়েছে। আপনার আরবী জানায় আপনাদের কি কোনো সাহায্য হবে? বহু আরব সৈন্যকে তারা অমানুষিকভাবে হত্যা করেছে। তাদের ভাষা ও ধর্ম আর বেদুইনদের ভাষা ও ধর্ম এক। বেদুইনরা রক্ত-পিপাসু পশু, দয়া বলে কিছু জানা নেই এদের। কেউ কোনো দিন মরুপথে বেন্‌গাজী যেতে সাহস করে না।

তোমরা কি বাস্তবিকই বেদুইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো?

হাঁ, কি আর বলবো আপনাকে।

এমন সময় অদূরেই আবার বাজনা বেজে উঠলো। মধ্যযুগীয় পোশাক পরিহিত একদল অশ্বারোহী সৈনিক রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে হাযির। ইটালিয়ানরা সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠলো। প্রথম গাড়িটিতে ত্রিপোলী তানিয়ার গভর্নর মার্শাল বদোলিও উপবিষ্ট। আরও একটি দল ফ্যাসিস্ট মার্চ সঙ্গীত গেয়ে এগিয়ে এলো।

গাড়ির পর গাড়ি আসছে। সৈনিকটিকে নিয়ে অদূরে অবস্থিত একটা কাফেতে গেলাম। সে তার এড্‌ভ্যাঞ্চারের গল্প শুরু করলো: আমি সব জানি। আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম। তারা দৈত্যের মতো লড়াই করে। এক বৃদ্ধ শেখ আহমর

মোখতার তাঁর নাম। তিনিই এদের নেতা। বয়স তাঁর সত্তরের উপর। অশ্বারোহণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হামলা দিয়ে ফিরেন। যখনই আমরা মনে করি তিনি একস্থানে আছেন, এবার আমরা তাকে ধরে ফেলবো, কিন্তু কি আশ্চর্য সেখানে তখন তাকে আর পাওয়া যায় না।

কফি পান করে বললো: একবার ওরা আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিলো। আমরা একটা মরূদ্যান অধিকার করেছিলাম। সেখানে কাকেও না দেখে আমরা লুকিয়ে অপেক্ষা করছি–তারা কখন ফিরে আসবে। কিন্তু বাতাসে যেনো তারা আমাদের খবর পেয়ে গেলো।

কেমন করে?

কি করে বলি? সমস্ত স্ত্রীলোকদের আমরা তাদের ঘরে বন্ধ করে পাহারা নিযুক্ত করি। কিন্তু একটি স্ত্রীলোক কি করে পালিয়ে যায়। হঠাৎ বেদুইনরা আমাদের আক্রমণ করলো। চললো রীতিমত যুদ্ধ।

কিন্তু এতে তাদের লাভ কি? আমাদের মেশিনগানের সামনে ওরা এদের পুরোনো ধরনের রাইফেল দিয়ে কি করবে? তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো। আমরা মোটরে তাদের অনুসরণ করলাম। কিন্তু কি করে ঘটলো তা জানি না। আমাদের একজন সৈনিক বললো যে ঐ দলে আহমর মোখতার নিজে উপস্থিত ছিলেন। তাই আমরা আরো দ্রুত তাদের অনুসরণ করলাম।

কিছুক্ষণ থেমে সে আবার বলতে লাগলো: মরূদ্যানের চার পাশের মরুভূমি ছিলো সমতল, বেশ শক্ত, বেশ ভালো। আমরা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে চলেছি এবং শীঘ্রই এসে পড়েছি তাদের কাছে। মেশিনগান থেকে বৃষ্টির ধারার মতো গুলী ছাড়তে লাগলাম। আমরা আহমর মোখতারকে দেখতে পেলাম। সব সময় তিনি কাজলা রং-এর ঘোড়ায় চড়েন। আমাদের একজন সৈনিক তার ঘোড়াটাকে চিনতো। আমরা তাকে লক্ষ্য করে গুলী চালালাম। গুলী তার গায়ে না লেগে ঘোড়ার গায়ে লাগলো। আর একটি আরব নিজের ঘোড়াটি ওকে দিয়ে দিলো। তারা সব পালিয়ে গেলো। পরে জানতে পারলাম যে আহমর মোখতারের একটা হাত সেই গুলীতে নষ্ট হয়ে গেছে।

বলে সে মাথা নাড়লো। আমি জিজ্ঞেস করলাম: যে লোকটি তার ঘোড়া দিয়েছিলো তার কি হলো?

তাকে বন্দী করলাম।

সে এখন কোথায়?

মাটির দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো: জাহান্নামে। বিদ্রোহী সে, তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম: ওরা তো বাস্তবিক বিদ্রোহী নয়। ওরা ওদের নিজেদের দেশকে রক্ষা করছে।

আমার কথায় কান না দিয়ে সে বলে যেতে লাগলো : এই বদমাশদেরে জানলে আপনি একথা বলতেন না। আমি একজন ইটালিয়ান। তুর্কীদের সঙ্গে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের সন্ধিতে আমরা এদেশ পেয়েছি। ওদের সেভাবেই চলতে হবে। তা যদি না করে তা হলে এদেরে ধ্বংস করবো।

আমি বিল চুকিয়ে দিলাম। যাবার আগে সে বললো: ছাড়পত্র পেলে আপনি স্বচক্ষে এদেরে দেখতে পাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনি তা পাবেন।

সারা বিকেল বেলাটা আরব মহল্লায় ঘুরে বেড়ালাম। ত্রিপোলীর এই মেদীনা অঞ্চলে এলেই প্রাচ্যের আভাস পাওয়া যায়। এখানকার রীতিনীতি, চালচলন মরক্কো ও আলজিয়ার্স থেকে অনেকটা প্রাচ্য ধরনের। কাফেগুলিতে তুর্কী ধরণের হুক্কার প্রচলন রয়েছে। ফরাসী অধিকৃত দেশগুলিতে তা মোটেই নেই। এখানকার পোশাকেও বেশ অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু মেয়েদের পোশাক প্রায় একই ধরণের। সামান্য সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহিলা তুর্কীদের মতো পাতলা বোরখা পরিধান করেন।

দর্জিপাড়া অত্যন্ত কর্মচঞ্চল। কারণ আজ রমযানের শেষ। কাল ঈদ। তাই কাল সবারই নতুন পোশাক চাই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। খচ্চর এবং গাধা বোঝা নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে। সবই প্রতীক্ষা করছে তোপধ্বনির জন্য। তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সবাই ইফ্‌তার করলো। আজকের এই তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই এক বছরের জন্য রমযান শেষ হয়ে গেলো। চাঁদ দেখা গেছে। শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে এলো। রাস্তায়, বাড়ীর ছাদে জনতার ভিড়। সবাই ঈদের চাঁদ দেখতে উৎসুক। চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সমস্বরে বলে উঠল: আল-আহ্‌মার, আল্-আহ্‌মার! (চাঁদ, চাঁদ) সবাই আনন্দে মেতে উঠলো। মদীনা অঞ্চলে সারারাতব্যাপী আন্দোৎসব চলছে। হোটেলে ফিরে এসে ইটালী গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদর্শনী দেখবার জন্য আমন্ত্রিত বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। টাগার্ট ত্যাগ করার পর আজই একটু আরামে ও শান্তিতে রাত কাটালাম।

পরদিন সকালে উঠলাম। অনেক কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। প্রথমেই যাতে ভবিষ্যতে হোটেলে আশ্রয় নিতে বা মোটরে রাত্রি যাপন করতে না হয় সেজন্যই একটি তাঁবু কিনতে মনস্থ করলাম। বহু অনুসন্ধানের পর এক ইহুদীর কাছ থেকে একটা পুরানো মিলিটারী তাঁবু পেলাম। বহু দর কষাকষির পর একশো লিরায় (lire) তা কিনলাম।

দুপুরের আগেই আমাদের বাজার করা শেষ হলো। তারপরই আমাদের সবচেয়ে জরুরী ও মুশকিলের কাজটি করতে হবে। বেনগাজী হয়ে মোটরে যাবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

প্রথমেই গেলাম ডেনিশ কনসালের কাছে–ইনি একজন লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায়ী, নাম ভাসুরো–জাতিতে ইটালিয়ান। লোকটি উৎসাহী ফ্যাসিস্ট। আমি যখন বললাম

যে ডেনমার্কে বর্তমানে রেডিক্যাল সোস্যালিস্ট মন্ত্রিসভা তখনও তিনি বিস্মিত হলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ অসম্ভব। এখানকার অবস্থা ভিন্ন প্রকার। এখানকার সবাই নিজকে একজন লাটবেলাট বা হোমরা-চোমরা মনে করে। সবাই গভর্নমেন্টের কাছে সকল পত্রেই তার নামের সঙ্গে মহামান্য কন্সাল লিখতে গৌরব বোধ করে।

কনসাল, ভাসুরো আমাদের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গভর্নমেন্ট হাউসে গেলেন। আমি গভর্নরের সেক্রেটারীর নিকট আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললাম। নৈরাশ্যজনক উত্তর তাঁর কাছ থেকে শুনতে হলো। তিনি বললেন, বহু আমেরিকান ও ফরাসী এরূপ অনুমতির জন্য আগেও এসেছিলো, কিন্তু তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ইটালিয়ান সরকার এরূপ অনুমতি দিতে অসমর্থ। কারণ, মের্জ বড় বিপদসঙ্কুল স্থান।

তাঁর উত্তর খুব উৎসাহজনক না হলেও তিনি বললেন যে আমাদের আবেদন কর্তৃপক্ষকে তিনি জানাবেন। আমরা বিদায় নিলাম।

কনসাল জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কোন্ হোটেলে আছেন?

এখন পর্যন্ত নেজোনেলেই আছি, তবে আজ বিকালেই আমরা তাঁবুতে চলে যাবো।

কিসে যাবেন বললেন?

তাঁবুতে, আমরা একটা তাঁবু কিনেছি, তাতেই থাকতে যাচ্ছি।

তাকে একথা বুঝাতে বেশ বেগ পেতে হলো যে এমন লোক বাস্তবিকই আছে যারা হোটেলের চেয়ে তাঁবুতে থাকা পছন্দ করে।

হোটেলের সুইস পোর্টারও আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পেরে বললো: এ খেয়াল ছেড়ে দিন। অনেকেই সরকারের নিকট এরূপ আবেদন করেছেন। আপনি হয়তো সিরটিস পর্যন্ত যাবার অনুমতি কিছুতেই পাবেন না।

কথা শুনে নিরাশ হতে হলো।

সমস্ত মালপত্র বেঁধে মোটরে ভর্তি করে ত্রিপোলী শহর থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটা মরূদ্যানের দিকে রওনা হলাম। এখানে তাঁবুতে আমরা প্রথম রাত্রি কাটালাম।

পরদিন সকালেই তাঁবুতে থাকার অসুবিধাগুলি অনুভব করতে লাগলাম। আমি বেরিয়ে গেলে একজন লোক তাঁবুতে পাহারা থাকার প্রয়োজন। আমি ফরাসী এবং কতকটা ইটালিয়ান ভাষা জানি বলে টারবক্সকেই সারাদিন তাঁবুতে বসে থাকতে হয়।

সেই দিন সন্ধ্যায়ই আমাদের জিনিসপত্র পাহারা দিবার জন্য একটি আরব ছেলে নিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত করলাম। তা'হলে আমরা দুজনই বেরিয়ে যেতে পারি। তৃতীয় দিন মুহম্মদ নামে একটি বারো বছরের ছেলে পাওয়া গেলো। বেশ বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। কাজের সন্ধানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলো। আমাকে দেখেই ইটালীয় ভাষায় বলে

উঠলো সে: সিনোরে, সিনোরে, পোর্টারে, পোর্টারে (Signore, Signore, Portare, Portare.)

আমি আরবীতে বললাম: আমার সঙ্গে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলবার দরকার নেই তোমার।

তাজ্জব হয়ে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো। ত্রিপোলীতে আমি আরব পোশাক পরি না। কোনো ইটালিয়ানই কষ্ট করে আরবী শিখবার দরকার মনে করে না। চিৎকার করে সে অন্য ছেলেদের বললো: দেখ, দেখ, লোকটা আরবী বলছে।

আমি তোমার মতোই একজন মুসলমান।

আমার একথা শুনে সে আরো বিস্মিত হলো। সন্দিগ্ধভাবে সে আমার দিকে চেয়ে অন্য ছেলেদের বললো: ইনি বলছেন যে ইনি মুসলমান।

মুহম্মদকে বললাম: তুমি আমার এই জিনিসগুলি বাসস্থানে নিয়ে যেতে পারবে?

সে এজন্যই তো এসেছে। গাড়িতে উঠতে বললাম। সে যেনো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলো। এর আগে সে কখনো মোটরে চড়ে নাই। সে উঠে টারবক্সের পাশে বসলো।

তাঁবু দেখে সে আরও খুশী হয়ে উঠলো। বললো: আমার বাবা ছিলেন একজন শেখ। ইটালিয়ানরা আমাদের মরূদ্যান দখল করে আমার বাবাকে গুলী করে মেরে ফেলে। বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো।

আমি জানতে চাইলাম যে, আমাদের অবর্তমানে সে আমাদের তাঁবু তদারক করতে পারবে কিনা। সোৎসাহে সে রাযী হলো। আমি প্রশ্ন করলাম: কোথায় থাকো?

যখন যেখানে খুশী। আল্লাহ যেদিন যেখানে আশ্রয় দেন। তবে কোনো কোনো সময় আমার চাচার সঙ্গেও থাকি।

তোমার চাচা কোথায় থাকেন?

ত্রিপোলীতে। তিনি এখন ইটালিয়ানদের একজন সৈনিক। তিনি আমার মাকে নিকাহ্ করেছেন। আমি তাকে মোটেই পছন্দ করি না। তিনি আমার বাবার ভাই হয়েও বাবাকে মন্দ বলেন।

তুমি এখানে থাকলে তিনি কি বলবেন?

কিছুই বলবেন না। আমি অনেক দিন বাড়ী ফিরি না। ফিরে গেলেই তিনি আমায় মারেন।

ওকে তাঁবুতে রাখাই ঠিক হলো।

পরদিন কনসাল বললেন আমাকে গভর্নমেন্ট হাউজ যেতে। আমার অনুমতিপত্র সম্বন্ধে আলোচনা হবে সেখানে। সেখানে আমাকে সেক্রেটারীর নিকট নেওয়া হলো। তিনি আমাকে বসতে বলে কফি আনতে পাঠালেন। পরে বললেন: দেখুন, আপনাকে অনুমতি দিতে পারতাম, কিন্তু আপনাকে তো বলেছি যে এ বড় বিপজ্জনক কাজ। এই দীর্ঘ পথের কোথাও ইটালিয়ান পোস্ট নেই। যে কোনো মুহূর্তে আপনার বিপদ ঘটতে

পারে। সেজন্য আপনার গভর্নমেন্টের কাছে দায়ী হবে কে? সমস্ত দায়িত্ব ইটালিয়ান গভর্নমেন্টের।

আমি আর টারবক্স সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই নিতে চাইলাম।

তা বেশ। তা বেশ। কিন্তু আপনাদের আরবী জানা দরকার।

আরবী আমি জানি।

একথা শুনে সেক্রেটারী আশ্চর্য বোধ করলেন। বললেন: তবুও আমরা আপনাদের অনুমতি দিতে পারি না। আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আপনাদের বড় কর্তা মাশেলা কান্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে কি?

কতক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি টেলিফোন উঠালেন। পরে বললেন: হিজ্ এক্সেলেন্সী, ভাইস গভর্নর মাশেলা কান্দে পাঁচ নিমিটি-কাল আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

মাশেলা কান্দে বেশ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোক। পাঁচটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারেন। তিনি আরবীও ভালো জানেন।

আমি ঢুকতেই তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে বললেন: সাইরেনিকার ভিতর দিয়ে আপনাকে আর আপনার বন্ধুকে আমরা কেন যেতে দিতে পারি না, আমার সেক্রেটারীর কাছে তা বোধ হয় জেনেছেন।

আমার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে আমি আরবী জানিনে, কিন্তু তা সত্য নয়। আমি বেশ ভালো আরবী জানি। তারপর শুরু হলো কঠোর পরীক্ষা। এতক্ষণ আমরা ফারসীতে কথা বলছিলাম। এবার ফারসী ছেড়ে শুরু হলো আরবীতে। অবশেষে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বললেন: আপনি আর আপনার বন্ধু যদি একটা দলিলে এই বলে স্বাক্ষর করে দেন যে আপনাদের কোনোরূপ বিপদের জন্য ইটালিয়ান সরকার দায়ী নহেন, তাহলে আমি আপনাদের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে দিতে পারি। কিন্তু সেজন্য দিন-কতক আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। ত্রিপোলী আর সাইরেনিকায় দুটি আলাদা গভর্নমেন্ট। বেনগাজী থেকেও আমার অনুমতি আনতে হবে।

আমি তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম। আমার এই সাফল্যের সংবাদ টারবক্সকে দিতে ছুটে এলাম। সে মুহম্মদের সঙ্গে তাঁবুতে অপেক্ষা করছিলো।

আমাদের কিন্তু অনেক দিন অপেক্ষা করতে হলো।

প্রথমেই পুলিশের কাছে গিয়ে নিম্নলিখিত ঘোষণা স্বাক্ষর করতে হলো।

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ, রসকো ডি. টারবক্স, এবং ক্লুড্ হলাম্বো ঘোষণা করছি এবং স্বীকৃত আছি যে ত্রিপোলী থেকে বেনগাজী মোটরে যেতে কোনোরূপ বিপদ-আপদ ঘটলে ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট দায়ী নহেন। আমাদের জীবন বা সম্পত্তি নষ্ট হলে তার জন্য ইটালিয়ান গভর্নমেন্টকে কোনরূপেই দায়ী করা যাবে না।

এ যেনো নিজ হাতে মৃত্যু-পরওয়ানায় স্বাক্ষর।

লিবিয়ার মরু-প্রান্তরে

দশই মার্চ বিকেলে সেই বিখ্যাত দলিল সম্পাদন করে আমি আর টারবক্স তাঁবুতে ফিরে এসেছি; অজ্ঞাত লিবিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়ে মোটর চালিয়ে যাবার অনুমতিপত্র লাভ করেছি। পরদিন ভোর বেলায়ই রওনা হবো ঠিক করলাম। মুহম্মদকে সে কথা বললাম। তাকে এখানে ছেড়ে যেতে হবে।

প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে নিলাম। টাকার অভাবে মোটরের অনেক জরুরী সরঞ্জাম নেওয়া হলো না। ভাবলাম, টাগার্ট থেকে ত্রিপোলী যে রেডিয়েটার বেশ ভালো কাজ করেছে তাই দিয়ে আমরা বেনগাজী পৌঁছতে পারবো।

আমাদের সঙ্গে কম্পাস আছে তো? টারবক্স প্রশ্ন করলো।

একটা সকেট কম্পাস আমার কাছে আছে, কিন্তু তার খুব দরকার নেই। কারণ, যতদূর সম্ভব আমরা সমুদ্রের তীর ধরে চলবো। আর সূর্যই দিকদর্শনের কাজ করবে। মার্চ মাসে আকাশ সর্বদা পরিষ্কার থাকে।

ছ'শো মাইল রাস্তা আমাদের পাড়ি দিতে হবে। দুজনই ম্যাপ দেখতে লাগলাম। আমাদের ক'দিন লাগবে? টারবক্স প্রশ্ন করলো।

ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে পাঁচ-ছ'দিনেই তা পাড়ি দিতে পারবো আশা করি। মিস্‌রাটা পর্যন্ত যেতে বেশী সময় লাগবে না। মিস্‌রাটা থেকে সিরটিস পর্যন্ত কোন রাস্তা নেই। সে পর্যন্ত দু'দিনের বেশী লাগবে না। তারপর সিরটিস থেকে নুফিলিয়া,—সবচেয়ে মুশকিল হবে এখানেই। এই স্থানটি সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। তারপর নুফিলিয়া থেকে আরঘেলা পর্যন্ত বিস্তৃত সেই অজ্ঞাত মরুপ্রান্তর। অবশেষে আরঘেলা থেকে বেনগাজী, সপ্তাহের বেশীর ভাগই এখানে কাটবে।

মুহম্মদকে কি ফেলে যেতে হবে?

রান্না করে খাওয়া-দাওয়া সারলাম। মুহম্মদ কিছুই খাচ্ছে না। যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবো এমন সময় দেখি সে কাঁদছে।

কি হয়েছে মুহম্মদ? জিজ্ঞেস করলাম।

আপনারা আমায় ফেলে চলে যাচ্ছেন?

তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

নিয়ে যাবেন আমাকে? উৎসাহভরে প্রশ্ন করলো।

তুমি তো জানো যে এ-পথ কতো বিপদপূর্ণ। জানি না আমরাই জীবিত থাকবো কিনা।

আমি সঙ্গে থাকলে বিশেষ ভালোই হবে। মুহম্মদ বিপদের কথা ভাবতেই রাযী নয়।

তার চাচার মতামত জানবার জন্য পরদিন তার বাড়ীতে গেলাম। দেখলাম, আটজন লোক একটা ঘরে ঘুমুচ্ছে–মুহম্মদের চাচা, তার মা, তার চাচার এক ভাই, মুহম্মদের দুই ভাই, এক বোন, নবজাত একটি শিশু আর মুহম্মদ।

আমাদের দেখে মুহম্মদের মা সরে পড়লো। আমি মুহম্মদকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব করতেই তার চাচা সম্পূর্ণ অসম্মতি জানালো। বললো:

কিছুতেই না।

না কেন?

এখন তার উপার্জন করবার বয়স হয়েছে। এতোদিন যাকে আমি খাইয়েছি এখন তাকে ছাড়তে পারি না।

আমরা নিরাশ হলাম। কিছুতেই সে রাযী হচ্ছে না।

অবশেষে আমরা গাড়িতে ফিরে এলাম। মুহম্মদ আমাদের বিদায় দিতে এলো। বুক জুড়ে তার কান্না জমে আছে। তার চাচাও এলো। শেষবারের মতো আর একবার চেষ্টা করলাম। তাকে একশো লিরা দিতে চাইলাম। তাতেও ফল হলো না–দু'শো, তাতেও না। অবশেষে তিনশো দিতেই রাযী হলাম। মুহম্মদের চোখের জল দেখে তার হৃদয় একটু নরম হলো। এবার মুহম্মদকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলো। তার মা আর পর্দার আড়ালে চুপ করে থাকতে পারলো না। আমাদের কাছে ছুটে এসে মুহম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো, তারপর আমার দিকে চেয়ে মুহম্মদের প্রতি সদয় থাকতে অনুরোধ জানালো।

এবার মিস্‌রাটা রওনা হলাম। বেশ ভালো পথ। দু'টার আগেই দূরে মিস্‌রাটা নযরে পড়লো। শহরের চারদিক উঁচু-প্রাচীরে বেষ্টিত। শহরে ঢুকবার দু'টিমাত্র পথ–একটি উত্তর আর অপরটি দক্ষিণ থেকে।

মিস্‌রাটায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করলাম না। আমাদের কাগজপত্রে স্ট্যাম্প দেবার জন্য বাজারের পাশে গাড়ি থামালাম। একটি তরুণ আরব এসে জানতে চাইলো, সে আমাদের সঙ্গে সিরটিস যেতে পারে কিনা।

আমি অসম্মতি জানালাম। আমাদের ছাড়পত্র ছিলো, কিন্তু ব্যক্তিগত কাজেই আমাদের সঙ্গে কোন যাত্রী নিতে পারি না। গাড়ি থেকে নেমে খানিক বিশ্রামের পর রওনা হলাম। আশা, সে দিন সন্ধ্যায়ই সিরটিস পৌঁছবো।

কিন্তু তা সহজ হলো না মোটেই। শহরের বাইরে আসতেই ইঞ্জিনের শব্দ হতে লাগলো। মাত্র বারো মাইল গিয়েই রাত হয়ে গেলো। কুয়াশায় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কুয়াশার ভিতর দিয়ে স্থানে স্থানে বেদুইনদের অগ্নিকুণ্ড দেখা যাচ্ছে।

সেখানেই রাতের মতো তাঁবু গাড়লাম। এমন সময় সবিস্ময়ে দেখতে পেলাম সেই তরুণ আরবকে যে আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিলো। মিস্‌রাটা যখন আমরা বিশ্রাম করছিলাম সেই সুযোগে সে গাড়িতে লুকিয়ে থাকে।

বললাম: তোমাকে ফিরে যেতে বাধ্য করাই উচিত। সে ধারণাও করতে পারেনি যে সিরটিস পৌঁছবার আগেই আমাদের থামতে হবে। কিন্তু সে এমনভাবে অনুরোধ করতে লাগলো যে আমি তাকে ক্ষমা করলাম। তাঁবু তৈরী করতে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শুতে যাব এমন সময় অন্ধকার আর কুয়াশা ভেদ করে দুটি ছায়ামূর্তিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে দেখা গেলো। আমাদের নিকটতম ক্যাম্প থেকে দু'জন বেদুইন ডিম আর দুধ নিয়ে আমাদের কাছে এলো। তাদের তাঁবুর ভিতর নিয়ে এলাম। মাঝরাত অবধি তারা আমাদের কাছে রইলো। সারাক্ষণ তারা তাদের জীবনযাপন সম্বন্ধে অনেক কিছু আমাদের বললো।

একজন বললো: বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। আমাদের এখন আর রাইফেল রাখতে দেওয়া হয় না—কোথায় যে কোনখানে গিয়ে আমরা আমাদের ক্যাম্প গাড়বো তাও আমরা নিজেরা এখন আর স্থির করতে পারি না।

নুফিলিয়ার অপর পার্শ্বে অবস্থিত বিস্তৃত উর্বর ভূ-খণ্ডে আমাদের যেতে দেওয়া হয় না।

কেন? আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। দিন দিন আমরা দরিদ্র হয়ে পড়েছি। আমাদের উট, ঘোড়া, গবাদি যাতে পানি পান করতে না পারে সেজন্য তারা আমাদের কূপগুলি সব কংক্রীট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলো। কাজেই আমাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। কিন্তু তার ফল হলো কি?

এখন আমরা উপবাস করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। লড়াই করে যখন তখন আমরা মরতে পারতাম। ইটালিয়ান সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়, কিন্তু স্বাধীন স্থানগুলিতে যেখানে স্বাধীন বেদুইনরা বাস করে সেখানে যাবার হুকুম নেই। আমরা সেই সব বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হবো। চারদিক নিরাশার ঘনছায়া। অন্যটি বললো: ইটালিয়ানরা আমাদের সমূলে ধ্বংস করতে চায়।

আমি বললাম: অসম্ভব। খুব সম্ভব তারা শুধু বিদ্রোহ দমন করতে চায়।

বিদ্রোহ কিরূপ? কোথাও কোনোরূপ বিদ্রোহ নেই। আমাদের পিতৃ-পিতামহের আবাসভূমিতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জীবন-মরণ সংগ্রাম মাত্র। সব আল্লাহর মর্জি। আমরা ক্রমেই অজ্ঞ ও দরিদ্র হচ্ছি! দিন দিন আমরা পশুতে পরিণত হচ্ছি—ওরা আমাদের পশু আখ্যাই দিয়েছে।

পরদিন সকালে আমরা আবার রওনা হওলাম। ইঞ্জিনের গোলমাল তখনো ছিলো। তেমন ভালোভাবে চলতে পারছে না। সকাল বেলায়ই কয়েকবার চাকায় ফুটো হয়ে গেলো। মিস্‌রাটা আর সিরটিসের মাঝ পথে একটা ছোট গ্রামে কিছু পেট্রোল পাওয়া

গেলো। পেট্রোলের প্রয়োজন ছিলো আমাদের খুবই। কারণ, বিগড়ানো ইঞ্জিনে বেশী পেট্রোল খরচ হচ্ছে।

স্থানটি সমতল কিন্তু কোনো রাস্তা নেই। মরুভূমির উপর দিয়ে গাড়ি চালানো খুবই সহজ। মনে হলো যেন এটা একটা সমুদ্র সৈকত। দিক ঠিক রাখাও সহজ। কারণ, বাঁ দিকে দূরে সমুদ্রের নীল রেখা দেখা যাচ্ছে।

মুহম্মদ আমার পাশেই বসেছিলো। জিজ্ঞাসা করলাম: এতো অল্প বয়সে তুমি লেখাপড়া শিখলে কেমন করে?

আমার বাবা আমায় শিখিয়েছিলেন।

তোমার বাবা কোথায় থাকতেন?

এই এখান থেকে অদূরেই একটা মরূদ্যান আছে, তাতেই তিনি থাকতেন। এজন্যই আপনার সঙ্গে আসতে আমি ভয় পাইনি। বেদুইনরা এলে আমার পিতার কথা তাদের বললে তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করবে না। আমার বাবা ছিলেন একজন বড় শেখ, সবাই তাঁকে জানতো।

তিনি কি করে মারা গেলেন?

নির্বিকারচিত্তে বললো: ইটালিয়ানরা তাঁকে গুলী করে মেরেছে।

তিনি কি করেছিলেন যে ওরা তাঁকে হত্যা করলো?

কিছুই না।

কিছু না করলে কি আর কেউ কাউকে গুলী করে মারে?

সব কথা ঠিক আমার মনে নেই–সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। তবে ইটালিয়ানরা প্রথম এখানে এলেই তা ঘটে। বাবা বেঁচে থাকতে আমাদের বেশ সুদিন ছিলো।

কি রকম?

উটের গোশত খেয়েছেন কখনো? এর স্বাদ খুব ভালো। প্রায় সব সময়ই আমরা তা খেতে পেতাম। প্রতিদিন খেতে পেতাম গোশত আর উটের দুধ। আপনি কখনো তা খেলে বুঝতে পারবেন এর চেয়ে সুস্বাদু আর কিছুই নেই। এখন তা আমাদের কাছে স্বপ্ন।

এখানে আমাদের সঙ্গে তুমি বেশ আছো, না?

হাঁ, আপনাকে আমি আমার চাচার চেয়েও বেশী পছন্দ করি।

তোমার বাবাকে কি করে গুলী করা হয়?

সব কথা আমার ঠিক মনে নেই। শহরের বাইরে যুদ্ধ চলছিলো। একদিন নয়জন বেদুইনের সঙ্গে তারা আমার বাবাকেও আমাদের মরূদ্যান থেকে ধরে আনলো। সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধ, কি দুর্দিনই না ছিলো সেটি আমাদের জন্য তা আল্লাহই জানেন। আমার মা চিৎকার করে বিলাপ করছিলেন আর মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলছিলেন। আমরা ক্ষুধায়

চিৎকার করছিলাম। নয় দিন উপবাস থেকে আমার দুটি ছোট ভাই মারা যায়। তারপর বাবাকে গুলী করে হত্যা করা হয়।

তুমি কি তা দেখেছিলে?

হাঁ, দশজনকেই একটা দেওয়ালের পাশে বাঁধা হয়। আমার বড় ভাই আর আমি বাবাকে শেষ বিদায় দিতে গেলাম। সৈনিকরা এক সঙ্গে গুলী করলো। আমার পিতা মরেন নাই। ভাবলাম তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এমন সময় একটা অফিসার তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মাথায় গুলী করলো।

সিরটিস থেকে বারো মাইল আসতেই কিসের পোড়া গন্ধ পেলাম। আগুনে তেল পুড়ছে। তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন বন্ধ করলাম। দেখলাম রেডিয়েটার থেকে পানি বেরিয়ে গেছে। ভয় পেলাম যে, রেডিয়েটারের কংক্রীট নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু তা নয়। রেডিয়েটারের নীচে থেকে একটা স্ক্রু খুলে পড়ে গেছে। আর একটি স্ক্রু লাগিয়ে আমি মুহম্মদকে সঙ্গে করে সমুদ্র থেকে রেডিয়েটারের জন্য পানি আনতে গেলাম।

সমুদ্র-সৈকতে অনেক পশুর পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম। মুহম্মদ সবগুলিই চিনতে পারলো। বললো: এটি হায়েনার, এটি শিয়ালের, এটি চিতার।

চিতাও এখানে আছে না কি?

নিশ্চয়, আমরা হয়তো দেখতেও পারি। চিতা এখানে খুব বেশী।

পানি এনে রেডিয়েটারে দিয়ে আমরা আবার রওনা হলাম। শহরের বাইরে কিছুদূরে আমরা সেই অপরিচিত যুবকটিকে নামিয়ে দিলাম। তার জন্য আমরা কোনরূপ ঝামেলা পোহাতে রাযী নই।

এখান থেকে হেঁটেই সিরটিস যেতে পারবে।

অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। সিরটিসের চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া। আমরা প্রায় সেই বেড়ার উপর গিয়ে পড়েছিলাম। পাশ কাটিয়ে ফটকের ভিতর ঢুকে পড়লাম। একটি সান্ত্রী সেখানে টহল দিচ্ছিল। ছোট একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে আমরা স্কোয়ারে পৌছলাম। সিরটিসের কমানডেন্ট ছিলেন একজন মোটা কর্নেল। লম্বা একটি পাইপ মুখে দিয়ে পায়চারী করে একজন পাদ্রীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। পাদ্রীটি বেদুইনদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। আমাদের দেখতে পেয়েই দ্রুত তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কোথা থেকে আসছেন আর কোথায়ই বা যাবেন?

দৃষ্টি তার সন্দিগ্ধ। আমি তাকে আমাদের পাসপোর্ট দেখালাম। আমাদের আরব পোশাকটি তিনি খুব ভালোভাবে দেখলেন, পরে বললেন: এখনই আপনারা যেতে পারেন না। ত্রিপোলী থেকে পুনরাদেশ না আসা পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। রাতে কোথায় থাকবেন? এখানে তো থাকবার কোনো বন্দোবস্ত নেই।

তার জন্য ভাবতে হবে না। সঙ্গে আমাদের তাঁবু রয়েছে। ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে থাকবো।

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। একটা ভালো জায়গা দেখে তাঁবু ফেললাম। ইটালিয়ান উপনিবেশ ইরিত্রিয়া থেকে খ্রিস্টান সৈনিক এনে সিরটিস ভর্তি করে ফেলা হয়েছে। বেদুইনদের সঙ্গে ইটালিয়ানদের যুদ্ধ করতে হয়, তাই তারা আরব সৈন্য নিযুক্ত করতে চায় না। তারা আরবদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তাই তারা তাদের উপনিবেশ ত্রিপোলী ও সাইরেনিকাতে বহু কৃষ্ণকায় সৈনিক এনে রেখেছে।

সিরটিসের নীচে বেদুইনদের একটা মস্ত বড় ক্যাম্প–বাইরে আগুন জ্বলছে। টারবক্স ঘুমিয়ে পড়লো। মুহম্মদ আর আমি ক্যাম্পটি দেখবার জন্য সেখানে গেলাম। এতো দরিদ্র আর কোথাও দেখি নাই। মেয়েদের গায়ে শতচ্ছিন্ন কাপড়। পুরুষদের অবস্থাও তেমনি খারাপ। বুভুক্ষু ছেলে-মেয়ের দল পয়সার জন্য আমাদের কাছে ছুটে এলো।

একজন বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম: কতোদিন ধরে তোমরা এখানে আছো?

জওয়াবে সে বললো: তিন মাস। এস্থান ত্যাগ করবার অনুমতি যে কখন পাবো তা জানি না। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে ফিরেই আমরা জীবন ধারণ করে থাকি। এখানে আমাদের মেষ পালনের জন্য প্রচুর ঘাস নেই। এদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এবং এদের খাবার সংগ্রহ করতে কতকগুলি মেষ বিক্রি করে ফেলতে হবে। কি যে করবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

ওরা কি তোমাদের এক স্থানে স্থায়িভাবে বাস করতে চায়?

আল্লাহই জানেন। ওরা আমাদের মৃত্যুই চায়।

আগুনের তেজ একটু বেড়ে উঠলো। ছিন্ন বাস পরিহিতা বুভুক্ষু স্ত্রীলোকদের চেহারায় শিকারী পাখীর হিংস্রতা–চোখে তাদের আগুনের হল্‌কা। ছেলেমেয়েদের দেখে বাস্তব জগতের ছেলেমেয়ে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। এদের অস্থি-কংকাল-সার দেহের প্রতিটি অস্থি গোণা যায়–এদের পেটের চামড়া পিঠের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে।

পরদিন ভোরে আমরা নুফিলিয়া রওনা হলাম। কর্নেল ত্রিপোলীতে টেলিগ্রাম করেছিলেন। উত্তরে তিনি আমাদের যাত্রার অনুমতির সমর্থন জানতে পারলেন। তিনি নুফিলিয়ার বেতার স্টেশনে আমাদের যাত্রার সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

সিরটিস পার হয়েই সমস্ত রাস্তার চিহ্ন মিলিয়ে গেছে। পথে আমরা মেষের চামড়া পরিহিত এক মেষ পালককে দেখতে পেলাম। সে যেন ভূত দেখতে পেয়েছে এমনি ভঙ্গিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইলো। কয়েক মাস ধরে সে এখানে আছে, এযাবৎ সে এখানে কোনো মানুষ দেখেনি। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হলো যেনো জীবনে সে কোনোদিন মোটর গাড়িও দেখেনি। আমরা তার কাছে আসতেই সে বড় বড় পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে লাগলো। আমরা চিৎকার করে জানালাম

যে আমাদের কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই; আমরা শুধু ছাগলের দুধ কিনতে চাই। মুহম্মদ তাকে আমাদের একটি পাত্র দিলো। কয়েকটি মেষ দোহন করে সে আমাদের খানিকটা দুধ দিলো, কিন্তু দাম সে কিছুতেই নিতে চাইলো না। আমরা তার কাছ থেকে চলে গিয়ে তাকে আর তার মেষগুলিকে শান্তিতে বিচরণ করতে দিলেই সে সন্তুষ্ট। তার নিবাস কোথায় জানতে চাইলে সে পূর্বদিকে দেখিয়ে বললো: এখান থেকে অনেক দিনের পথ আমাদের ক্যাম্প। শীঘ্রই আমি সেখানে যাবো।

অনেকক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ের টিলার উপর তাকে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকতে দেখলাম। এ স্থানটি খুবই ভীতিপ্রদ। স্থানে স্থানে গভীর খাদ–এসব কাটিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। এক পাশ দিয়ে বেশী দূর যাওয়া অসম্ভব। আমরা যাতে দিকভ্রষ্ট না হই সেজন্য সব সময়ই সমুদ্রকে আমাদের দৃষ্টিপথের মধ্যে রাখতে হচ্ছে।

লিবিয়া মরুভূমির এই অংশটি সমুদ্র থেকে খুব বেশী দূরে নয়। এখানে বহুদূর বিস্তৃত ফুলের কার্পেট যেনো বিছানো আছে। বাতাসে সেসব ফুল দুলছে। ভ্রমরদল ফুলে ফুলে বেড়াচ্ছে।... দূর নীলিমার মাঝে মাঝে মরূদ্যানের উঁচু খর্জুরকুঞ্জগুলি ঝোপের মতো দেখা যাচ্ছে।

দুপুরের কাছাকাছি রেডিয়েটারে পানি ফুটতে শুরু হলো– কোথায় যেন ছিদ্র হয়ে গেছে। খুবই বেশী পানি পড়ছিল। ভাবলাম তাড়াতাড়ি করলে নুফিলিয়া পৌঁছে যেতে পারবো। আমাদের খাবারের পানি খানিকটা রেডিয়েটারে ঢেলে দিলাম। কিন্তু সেখানকার বালু নরম থাকায় বেগে গাড়ি চালানো মুশকিল হয়ে উঠলো। আবার সেই অবস্থা। আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর ঠিক করা হলো। প্রতিবারই আমরা আমাদের মূল্যবান পানীয় জল নষ্ট করতে লাগলাম।

তিনটার সময় একটা মরূদ্যানে পৌঁছলাম। সেখানে কোনো লোকালয় নেই। তবে সেখানে খুব ভালো পানির তিনটি কূপ ও একটি ভালো বাড়ী দেখতে পেলাম।

এখানে তাঁবু গেড়ে রেডিয়েটারটি মেরামত করার ইচ্ছা করলাম। টারবক্স ও মুহম্মদ তাতে রাযী হলো।

এই মরূদ্যানটি সমুদ্র থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। বেশ উর্বর বলে মনে হলো। কিছু খেজুর গাছ, ঝোপ ও প্রচুর ফুল ফুটে আছে। এটি মরুভূমির শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বিপরীত দিকে যতদূর দেখা যায় শুধু মরুভূমি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নুফিলিয়া যাবার পথে একটা বিরাট শুকনো হ্রদ অবস্থিত। কিছুদিন আগেও হয়তো এতে লবণ পানি বিদ্যমান ছিলো। সামান্যতম ঘাসের চিহ্নও তাতে নেই। সেই পুরনো ধ্বংসপ্রায় বাড়ীর উপর একটা ভীষণাকৃতি শকুন বসে আছে। যতোবারই আমরা তার কাছে যেতে চেয়েছি ততোবারই সে বিশ্রী ঘাড় লম্বা করে ডানা মেলে বৃত্তাকারে শূন্যে উড়তে শুরু করেছে। দাঁড়কাকের দল অমনি তাকে তাড়া করতে আরম্ভ করে। সে তাড়া খেয়ে

ভীষণ চিৎকার শুরু করে। কিন্তু মরুভূমিতে মৃত্যুর নীরবতা। একদিকে মরুভূমিতে বাতাস আর অন্যদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ।

তাঁবু গেড়েই আমরা রেডিয়েটার মেরামতে লেগে গেলাম। ছিদ্রটি যতটুকু ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী বড় এবং মেরামত করা খুবই মুশকিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে ঘন কুয়াশা এসে সব কিছু ঢেকে ফেললো। ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। টারবক্স কুড়াল নিয়ে ঝোপ থেকে শুক্‌নো লাকড়ী কাটতে গেলো; কিন্তু মুহম্মদ তাকে বারণ করলো।

বললো: এখানে আলো জ্বালানো যাবে না। বেদুইনরা যদি এদিকে এসে আগুন আর ঐ মোটর গাড়ি দেখতে পায় তাহলে তারা আমাদের ইটালিয়ান মনে করে তাঁবু থেকে বের হবার আগেই গুলী করে মেরে ফেলবে।

আমি বললাম: হাঁ, এটা খুবই সত্যি কথা। আমি বেদুইনদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়াছিলাম।

রাত দুটোর সময় অদ্ভুত শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ভীষণ অন্ধকার। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রথম প্রথম আমি চুপ করে পড়ে রইলাম। আলো জ্বালতেও সাহস হলো না। মুহম্মদের হাত ধরলাম। সে জেগেই ছিলো। তার কানে কানে বললাম: শুনতে পাচ্ছো?

বলেই অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই টারবক্সের টর্চ ও কুড়োলটা পেলাম। তাঁবুর দরজার পর্দা সরিয়ে বাইরে এলাম। দেখলাম একটা প্রকাণ্ড শিয়াল আমাদের মুরগীর বাচ্চাটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। কুড়োলটা ছুঁড়ে মারলাম। একটা ভেংচি দিয়ে সে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়ালো। তার চোখের তারা জ্বলন্ত অগ্নি-গোলকের মতো দেখাচ্ছে।

আমরা আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর আবার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। একটা অস্বস্তিকর কান্নার শব্দ ভেসে এসে আবার থেমে গেলো। তারপর কখনো সে শব্দ উপর থেকে কখনো পাশ থেকে আসতে লাগলো। মুহম্মদের মতো ভয়লেশহীন লোকও অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো। বললো: নিশ্চয়ই কেউ এখানে মরেছে। এ শব্দ জ্বীনদের শব্দ।

কি সব বাজে কথা বলছো? কোনো পাখী বা বাদুড় ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

আমি দরজা খুলে বাইরে যেতে চাইলাম। কিন্তু মুহম্মদ আমায় বারণ করলো। অনুনয় করে সে বললো: যাবেন না বাইরে। জ্বীনরা খুম শক্তিশালী। মুরগীর বাচ্চার মতো এরা আপনার ঘাড় মটকাতে পারে।

কম্বল মুড়ি দিয়ে সে তার জানা কুরআনের বিভিন্ন সূরা আবৃত্তি করতে লাগলো। পরে বললো: এখন আর ওরা আমাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

আবার আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল বেলা উঠে কিছু পানি নিয়ে আমরা রওনা হলাম। ভাবলাম, পথে সমুদ্রের ধারে আরো কুয়া পাবো–পানির অভাব হবে না।

রওনা হবো ঠিক সেই সময় মুহম্মদ আমায় ডাকলো। খেজুর গাছের কাছে সে দাঁড়িয়েছিলো। বললো: ঐ দেখুন রাতে আমি যা' বলেছিলাম সে কথাই ঠিক। তাঁবুর চারপাশে জ্বীনই এসেছিলো।

মুহম্মদ চারটি কবর দেখতে পেয়েছে। লাশগুলি মাটির খুব নীচে রাখা হয়নি। কারণ তাদের হাঁড়গোড় সব চারপাশে ছড়িয়ে আছে। শিয়াল মাটি খুঁড়ে তা বের করে ফেলেছে। কাফনের কাপড় এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মুহম্মদ বললো: ইউনিফরম দেখে মনে হচ্ছে এরা সব ইটালিয়ান। খুব তাড়াতাড়ি লাশগুলি দাফন করা হয়েছে।

আমরা ব্যস্ত হয়ে মরূদ্যান ত্যাগ করলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পরবর্তী মরূদ্যানটি অতিক্রম করলাম। কালে এ স্থানটি সমুদ্রের অংশ ছিলো। গাড়ি চালানোর পক্ষে বেশ ভালো রাস্তা। খুব দ্রুত মোটর চালিয়ে দিলাম। তারপরই আবার খারাপ রাস্তা। দুপুরের কাছাকাছি প্রবল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হলো। সামনেই একটা ছোট হ্রদ–চওড়ায় তিন গজের বেশী হবে না, কিন্তু এত দীর্ঘ যে তা ঘুরে আসা অসম্ভব। কারণ, সেখানকার বালু গাড়ি চালানোর প্রতিকূল। সোজাসুজি পার হতে গিয়ে গাড়ি যদি ডুবে যায় তা হলে তা আর কখনো বের করা যাবে না। আমরা নেমে পানির গভীরতা পরীক্ষা করলাম। তলা বেশ শক্ত, পানিও তিন ফুটের অধিক নয়। কিন্তু এতেই ইঞ্জিন ডুবে যাবে। জিনিসপত্র নামিয়ে ওপারে রেখে এলাম। গাড়ি কিছু পিছিয়ে নিয়ে খুব জোরে সামনে চালিয়ে দিলাম। অন্য দুজন পিছন থেকে ঠেলতে লাগলো; খুব সহজেই পার হয়ে গেলাম।

পথে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত এরোপ্লেন দেখতে পেলাম–আগুন লেগে পুড়ে গেছে। খানিক পর একটা ছোট টিলার উপর একজন দরবেশের কবর দেখতে পেলাম। পশু-পক্ষীতে যাতে লাশ বের করতে না পারে সেজন্য কবরের উপর বড় বড় পাথরের টুকরো রেখে দেওয়া হয়েছে। মুহম্মদ বললো: এটা একজন বেদুইন শেখের কবর। তিনি ছিলেন একজন মহৎ লোক। এমনি করেই আমরা আমাদের শেখদের কবর দেই।

এই কাপড়ের টুকরাগুলি কেন?

এ তার জামাকাপড়। তার সব জিনিসপত্র একস্থানে বেঁধে রাখা হয়। এমনকি এদের জামার পকেটে টাকা-পয়সাও হয়তো পাওয়া যেতে পারে। পথিকদের জন্য এসব রেখে দেওয়া হয়। প্রত্যেক মুসলিমকেই তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ দরিদ্রদের বিলিয়ে দিতে হয়। স্বাধীনচেতা বেদুইনদের মধ্যে কোনো গরীব লোক নেই, আর এরা অন্য লোকের দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা পায় না–সেজন্যই তারা তাদের

সম্পত্তির চল্লিশ ভাগের একভাগ মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে কাপড়ে বেঁধে রেখে দেয়। যার দরকার সে তা নিতে পারে। আমরাও আমাদের অংশ এমনি করে ছেঁড়া কাপড়ে বেঁধে রেখে দেই।

তিনটার সময় আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করছি। এমন সময় দূরে বালু উড়তে দেখা গেলো। প্রথমে মনে হলো হয়তো একদল হরিণ হবে। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে বালুরাশির ভিতর থেকে আকৃতিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। একদল ঘোড়-সওয়ার দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের দিকেই আসছে। সূর্যকিরণে রাইফেলের নল ঝক্ ঝক্ করছে। মুহম্মদ চিৎকার করে উঠলো: বদ্দু।

আমি টারবক্সের দিকে চাইলাম। এখানেই কি আমাদের ভ্রমণ শেষ হবে? এসব স্বাধীনচেতা বেদুইন মানুষকে কিভাবে হত্যা করে সে খবর আমাদের জানা আছে। তা ছাড়া কি করেই বা এতো তাড়াতাড়ি আমরা তাদের বুঝাবো যে আমরা ইটালিয়ান নই।

ঘোড়-সওয়ারেরা ক্রমেই নিকটে আসছে। তারা আমাদের মোটর দেখতে পেয়েছে। সামনের লোকটি ক্ষিপ্রহস্তে তার রাইফেল উঁচিয়ে ধরলো। আমরা মোটরের পিছনে আশ্রয় নিলাম গুলীর হাত থেকে নিস্তার পাব বলে। দেখতে দেখতে পাঁচজন সওয়ার আমাদের সোজাসুজি এসে হাযির।

দলপতি একজন কাফ্রি। তার রাইফেল আমাদের দিকে তাক্ করে এগিয়ে এলো। ভাঙ্গা আরবীতে জিজ্ঞেস করলো: এ মোটরগাড়ি কোথায় পেলে?

এটা আমার মোটর।

কিন্তু যে আমেরিকান আর ইংরেজের এখানে আসার কথা ছিলো তারা কোথায়? তাদের কি তোমরা হত্যা করছো?

আমরা বিস্মিত হলাম।

তারা কোথায় বলো—রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলো।

আমরাই তা'রা।

তোমরাই? বল কোথা থেকে আসছো?

কিন্তু আমরাই যে তারা! বললাম।

তাহলে তোমাদের পরিধানে আরবী পোশাক কেন?

আমি তাকে সব বুঝিয়ে বললাম। পরে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। বললো: আমি নুফিলিয়া থেকে আসছি। আপনারাই যদি সে ইংরেজ আর আমেরিকান হয়ে থাকেন তা'হলে বলছি—তিনদিন আগে সিরটিস থেকে টেলিগ্রাম এসেছে যে আপনারা আসছেন। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিলো যে বেদুইনরা আপনাদের আক্রমণ করে থাকবে, তাই আপনাদের সন্ধানে আমাদের পাঠানো হয়েছে। তা' আপনাদের পেয়ে বেশ ভালোই হলো।

তারা সবাই ঘোড়া থেকে নামলো। আগুন জ্বালিয়ে চা তৈরি করলাম। নিগ্রো বললো: নিরাপদে আসতে পেরেছেন যে সে আপনাদের সৌভাগ্য। এখানে দলে দলে বেদুইনরা ঘুরে বেড়ায়। আপনারা গতরাতে কোথায় ছিলেন?

সেই দুটি কূপওয়ালা মরূদ্যানের কথা বললাম।

দাঁত বের করে একটু হেসে সে বললো: ও। সেখানে? গত মাসে আমাদের পাঁচটি সৈনিক সেখানে নিহত হয়েছে। বেদুইনরা ওদের উটের জন্য পানি নিতে এখানে আসে।

তাকে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত এরোপ্লেনটির কথা বললাম। সে বললো: সেকথা শুনেছি। একটা সামান্য রাইফেল দিয়ে ওরা সেটাকে গুলীবিদ্ধ করেছিলো। বড় আশ্চর্য–বলেই সে হাসতে লাগলো। পরে বললো: চালক সেখানেই নিহত হয়। ইঞ্জিনটি নষ্ট হয়ে গেছে। বেদুইনরা সেই জয়ের আনন্দোৎসব হিসাবে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সেই জ্বলন্ত প্লেনের চারদিকে নৃত্য করে। কিন্তু আল্লাহর মর্জি, প্লেনটি ভীষণ শব্দে ফেটে যায়। তা'তে বোমা বোঝাই ছিলো। বেদুইনরাও সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। কিন্তু প্লেনের আশেপাশে কোথাও তো হাড়গোড় দেখতে পাইনি। মনে হয় অন্য বেদুইনরা এসে সমস্ত লাশ নিয়ে গেছে।

তার সঙ্গী সৈনিকদের অগ্রসর হতে বলে সে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে বসলো। বারো মাইল যেয়েই একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। তাতে লেখা রয়েছে–নুফিলিয়া ৩০ কে.এম.।

এখান থেকে ঘোড়ার পায়ের দাগের একটা পথ দেখা গেলো। ক্রমে রাস্তা বেশ ভালোই মনে হলো। সমুদ্র থেকে আঠারো মাইলের মধ্যেই আমরা নুফিলিয়া দেখতে পেলাম। দুর্গে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে আসলো। উঁচু পাহাড়ের মাঝখানের একটা উপত্যকায় তা অবস্থিত। চারদিকে তার একটা তারের বেড়া। দুর্গের ছাদের উপর থেকে প্রকাণ্ড সন্ধানী আলো ফেরে আমাদের পথ দেখিয়ে দেওয়া হলো। হঠাৎ আমাদের সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেলো। কাফ্রিটি উচ্চারণ করলো সংকেত-ধ্বনি।

দরজা খুলে গেলো। আমরা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ খোলা আঙিনায় পৌঁছলাম।

কমান্ডারের নাম ক্যাপটেন দ্য-পোলী। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এবং অন্য পাঁচজন অফিসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন: পথে আপনাদের কি খুব কষ্ট হয়েছিলো? সিরটিস থেকে আপনাদের সম্বন্ধে কয়েকটি টেলিগ্রাম এসেছে। আমাদের আশঙ্কা হলো হয়তো আপনারা আক্রান্ত হয়েছেন।

রেডিয়েটারটিই শুধু আমাদের কষ্ট দিয়েছে।

এখন সেটা কি ঠিক হয়েছে?

না, ভালোমতে তাকে মেরামত করতে পারিনি।

একটা মেকানিক ডেকে রেডিয়েটারটি মেরামত করা যায় কি না দেখতে নির্দেশ দিলেন। পরে আমাদের বললেন: এবার চলুন আমার সঙ্গে আহার করবেন। অনেকক্ষণ ধরে খাবার প্রস্তুত হয়ে আছে।

পরদিন সকালে উঠেই আমরা রেডিয়েটার মেরামতে লেগে গেলাম। রেডিয়েটারটি খুবই নষ্ট হয়েছে। বেনগাজী যেতে হলে এটাকে সম্পূর্ণরূপে ঠিক করে নিতে হবে।

আমি ক্যাপ্টেন দ্য-পোলীর অফিসে গেলাম। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: আরঘেলার কোনো মানচিত্র এখানে দেখতে পারি কি?

দেয়ালে একটা বড় ম্যাপ তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন: এখান থেকে আরঘেলা যাবার পথ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। প্রায় দু'শো মাইল হবে। বছর পাঁচেক আগে আমাদের একটা বড় মিলিটারী দল এ পথে গিয়েছিলো। আমার ভয় হয়, আপনারা পথ খুঁজে পাবেন না।

কেন?

তা' এদেশে কোনো রাস্তাঘাটের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে পথ এমন খারাপ যে বহুকষ্টে সেখানে মোটর চালাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বির-উম্মুলরিস পর্যন্ত আপনার সঙ্গে একটি সৈনিক দিতে পারি।

সে কোথায়?

এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটি কূপ। এরপর আর কোনো রক্ষী আমি দিতে পারি না। সে পর্যন্তই আমাদের সীমানা। তবে আরঘেলায় আমি টেলিগ্রাম করে দিতে পারি, তা সাইরেনিকায় অবস্থিত। তারা বির-মেরদুমা পর্যন্ত একদল প্রহরী পাঠিয়ে দেবে। তারাই আপনাদের এরপর পথ বাতলে দেবে।

বির-মেরদুমা আবার কি?

বির-উম্মুল-রিস থেকে বিশ মাইল দূরে একটি কূপ। এদের মাঝখানে একটি উপত্যকা আর দু'পাশে পাহাড়।

আমরা পরদিন সকালে রওনা হবো বলে তিনি আরঘেলায় টেলিগ্রাম করে দিলেন। কিন্তু রেডিয়েটারের জন্য আরো দু'দিন বেশী আমাদের সেখানে থাকতে হলো। পরে ১৫ই মার্চ সকালে আমরা প্রস্তুত হলাম।

সে স্থানটি অত্যন্ত খারাপ। স্থানে স্থানে কয়েক হস্ত পরিমিত খাদ ঘন ঝোপ-জঙ্গল। এসবের উপর দিয়েই গাড়ি চালাতে হলো।

দুপুর পর্যন্ত আমরা বির-উম্মুল-রিসের অর্ধেক পথ মাত্র অতিক্রম করতে পারলাম। দুটি চাকা ফুটো হয়ে গেছে। টিউব বের করে দেখি তা কাঁটায় ভর্তি। চল্লিশটি ফুটো মেরামত করতে হলো।

চলেছি, এমন সময় সৈনিকটি সীমান্ত-রেখায় প্রায় দশটি হরিণ দেখতে পেলো। সে তার রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হলো। আমি দ্রুতবেগে মোটর চালালাম। আমরা হরিণের কাছে এলাম। সৈনিকটি গুলী চালালো, কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আবার লক্ষ্য করলো। এবার সফল হলো–একটি হরিণ লুটিয়ে পড়লো। এই হট্টগোলের ভেতর আমরা দিক হারিয়ে ফেললাম। পরে সৈনিকটি খুঁজে ঠিক রাস্তা বের করলো। তার নির্দেশ মতোই আমরা চলতে লাগলাম।

টারবক্সকে বললাম: আমাদের যদি ফিরতে হয়, তা'হলে আমাদের গাড়ির দাগ ধরেও ফেরা সম্ভব হবে না।

কম্পিত কণ্ঠে টারবক্স বললো: না, আমাদের সঙ্গে যে পথ-প্রদর্শক রয়েছে।

ছটার সময় কুয়াশায় সবদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, সূর্যকে একটা লাল বলের মত দেখাচ্ছে। সেদিন আমরা বির-উম্মুল-রিস পৌঁছতে পারবো কি-না, এখন সে সন্দেহ হতে লাগলো। হঠাৎ সৈনিকটি চিৎকার করে বলে উঠলো: আসুন! আমরা এসে পড়েছি বোধ হয়।

কাছেই একটা গোল পাহাড়ের গায়ে ঘোড়ার পায়ের অসংখ্য দাগ দেখতে পেলাম।

পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেই কূপটি অবস্থিত। খুব ছোট সে কূপ। এতো ছোট যে কয়েক হাত দূর থেকেও তা দেখা যায় না। একটা গর্ত বললেও চলে। আমাদের সৌভাগ্য যে তাতে পানি ছিলো। প্রথমেই পানি তুলে তা পান করলাম। পানিতে লবণ ও গন্ধক মিশ্রিত–বিশ্রী তার স্বাদ। সেখানেই তাঁবু গাড়লাম।

অন্ধকার হয়ে এলো। আগুন জ্বাললাম। হরিণের মাংস দিয়ে আহার চললো। ঘুমোতে যাবো এমন সময় সৈনিকটি বললো: সকলকেই এক সঙ্গে ঘুমুলে চলবে না। এখানে অনেক বেদুইন আছে। পালা করে আমাদের পাহারা দিতে হবে।

সারারাত এমনি করে তাঁবুর বাইরে পাহারা দিলাম। কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন। রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা দূর হলো।

রওনা হবার সময় সৈনিকটি বললো: আমি আর যেতে পারি না।

কিন্তু তুমি কি একা নুফিলিয়া ফিরে যেতে পারবে?

আজ রাতেই আমি সেখানে পৌঁছতে পারব।

আমরা কি করে পথ চিনবো?

সে তো খুব সোজা। বলে দক্ষিণে একটা উপত্যকা দেখিয়ে দিলো। বললো: এই উপত্যকা ধরেই আপনারা বির-মেরদুমা পৌঁছতে পারবেন। সেখানে দুটি পরিষ্কার পানির কূপ দেখতে পাবেন। সেখানে একজন প্রহরী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

বলে সে নুফিলিয়ার দিকে যাত্রা করলো।

বির-মেরদুমা স্থানটি একশো গজ চওড়া গোলাকৃতি খোলা জায়গা–ঘাসের চিহ্ন মাত্রও নাই। মাঝখানে দুটি ছোট পাহাড়। এ দুটিই সেই কূপ। বির-উম্মুল-রিসের মতো গভীর হলেও এর পানি অনেকটা পরিষ্কার। একটির পানিতে লারভা জাতীয় কীট বিদ্যমান। তা ছেঁকে পরিষ্কার করে নিতে হলো। কোন প্রহরীকেই সেখানে দেখতে পেলাম না। প্রথম ভাবলাম যে আমরা অনেক আগেই এসে গেছি। কিন্তু ঘোড়ার মল দেখতে পেলাম। মনে হলো, আমাদের দেরী দেখে প্রহরী চলে গেছে।

স্থানটি ঘুরে ফিরে দেখছি এমন সময় ডানদিকে একটি প্রাচীর ও বাঁ-দিকে পরিখা দেখতে পেলাম। আমি টারবক্সকে বললাম: এই কূপের জন্য নিশ্চয়ই লড়াই হয়েছিলো এখানে। বালুর উপর এখনও বুলেটের চিহ্ন বিদ্যমান।

সব নিস্তব্ধ। কয়েকটি শকুন নীল আকাশে অনেক উচ্চে উড়ে বেড়াচ্ছে। শক্ত ঘাস নড়ে ওঠে। আমাদের মনে হতে লাগলো নিশ্চয়ই কেউ হয়তো পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে বুলেট এসে আমাদের উপর পড়তে পারে। আমাদের সবারই পরিধানে আরব পোশাক।

আমি বললাম: বেদুইনরা এখানে পানি নিতে আসতে পারে।

তাহলে ওরা মোটর দেখে আমাদের ইটালীয় বলে মনে করবে এবং কথা বলবার আগেই গুলী করবে।

আমি মুহম্মদকে বললাম: আমাদের এখান থেকে সরে পড়াই উচিত। চলো দেখিগে রাস্তার কোনো চিহ্ন দেখতে পাই কি-না।

বির-মেরদুমার বিপরীত দিকে গেলাম। সেখানে ঢিলে বালুতে ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ মুহম্মদ চিৎকার করে আমাকে বললো: দেখুন, দেখুন–ঐ যে গাড়ির দাগ রয়েছে। এই ধরে আমাদের গন্তব্য স্থানে যেতে পারবো।

কোন্ দিকে আরঘেলা অবস্থিত তা আমাদের কারো জানা নেই। ম্যাপেও তার কোনো চিহ্ন নেই। তবে খুব সম্ভব এ পথ ধরেই আমরা পৌঁছতে পারবো। কারণ, আমরা যেদিক থেকে এসেছি রাস্তাটি তার বিপরীত দিকে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ির চাকার অসংখ্য ফুটো বন্ধ করে আবার আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

গাড়ির চাকার সেই চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলেছি। কোনো কোনো স্থানে চিহ্ন একেবারে মিলিয়ে গেছে। তাই গাড়ি থেকে নেমে অনেকক্ষণ ধরে সন্ধান করে সেই চিহ্ন বের করতে হচ্ছে। ঝোপঝাড় ও হালকা বালুর ভিতর দিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। গাড়ির চাকা ঘন ঘন ফুটো হয়ে যায়। তা' ঠিক করতে করতে প্যাঁচগুলি প্রায় সবই শেষ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময় আমরা বির-মেরদুমা থেকে মাত্র কুড়ি মাইল পথ

আসতে সমর্থ হয়েছি। আরঘেলা পৌঁছতে আরো একশো মাইল বাকী। কিন্তু আরঘেলা যে কোথায় তা' আমাদের জানা নেই।

সূর্যাস্তের সময় আমরা এক বিস্তৃত সমতল ভূমি অতিক্রম করেছি। যতদূর দেখা যায় শুধু শক্ত ঘাস আর বালু, এ ছাড়া কিছুই নযরে পড়ে না। দূরে সীমান্ত-রেখায় খড়ির উঁচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে। অস্তমান সূর্যের কিরণে তা' লোহিতাভ বর্ণ ধারণ করছে। অন্ধকারে পথের চিহ্ন দেখা যাবে না। তাই সেখানেই তাঁবু গাড়লাম। সামান্যমাত্র পানি অবশিষ্ট আছে।

সূর্যাস্তের পরই শুকনো বাতাস বইতে শুরু করলো। তাঁবু খাটিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ১৭ই মার্চ আমরা ষাট মাইল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হলাম। সেই লুপ্তপ্রায় পথচিহ্ন ধরেই চলতে হচ্ছে। তিনটার সময় একটা চড়াইর নীচে এসে পৌঁছলাম। টারবক্স আর মুহম্মদকে সামনের একটি চাকা মেরামত করতে বলে আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার চেষ্টা করতে চড়াইয়ে উঠলাম। পাহাড়ের একটা সরু পথ দিয়ে তারা গাড়ি সেই পথচিহ্নের কাছে নিয়ে এলো।

চড়াইয়ের প্রথম স্তরে পৌঁছেই দেখতে পেলাম সম্মুখে আর একটা উচ্চতর চড়াই। তার উপর পাথরের তৈরী কয়েকটা স্থান দেখতে পেলাম। দেখতে ঠিক কূপের মতো। কাছে পৌঁছে দেখলাম, এগুলি বেদুইনদের পুরনো কবর।

দক্ষিণে যেদিকে পথের চিহ্ন চলে গেছে সেদিকে মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই নেই। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু হলদে বালু সীমান্ত-রেখায় নীলাভ হয়ে গেছে। এ পথটি আরঘেলার পথ নয়। কারণ আরঘেলা লিবিয়া মরুভূমির মাঝখানে নয়। আমি পাহাড়ের অন্য দিকে অবতরণ করলাম। কতক্ষণ পরই গাড়ির চাকার চিহ্ন দেখতে পেলাম। কিছুদিন আগে একবার যে এখানে এসেছিলাম তারও চিহ্ন পেলাম। সর্বত্র উটের মল পড়ে আছে। কিন্তু কোথাও ধোঁয়া দেখতে পেলাম না– কোনো খেজুর গাছ বা মানুষের থাকার চিহ্ন দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যার সময় আমি আমাদের গাড়িটি দেখতে পেলাম।

টারবক্সকে জিজ্ঞেস করলাম: গাড়ি চালাও নাই কেন?

গাড়ির টিউব মেরামত করতে পারিনি। তাতে অসংখ্য ছিদ্র হয়ে আছে। প্যাঁচ্ও আর নেই।

ফিরে যাওয়াই আমি ভাল মনে করি। এই পথ-চিহ্ন আরঘেলার পথ নয়। এই পথ সোজা মরুভূমির মাঝখানে চলে গেছে। কতো পানি আমাদের অবশিষ্ট আছে?

এক কোয়ার্ট মাত্র।

তা'হলে কালই বির-মেরদুমা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সেখানে অন্তত পানি যাওয়া যাবে। আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার অর্থ অবধারিত মৃত্যু। মরুভূমিতে এই প্রথমবার আমাদের মৃত্যু-চিন্তা উদয় হলো।

চা খেয়েই আমরা শুয়ে পড়লাম। সারা রাত আমরা সবাই অসুস্থ বোধ করলাম। মনে হলো, সবাই আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছি। সকাল বেলা মুহম্মদ বললো: আমি জানি আমাদের পেটের অসুখ কেন হয়েছে। বির-মেরদুমার মানে কি জানেন?

না।

এর মানে হলো, জোলাপের কূপ।

আমরা টিউব সারাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা সম্ভব হলো না । কোনো প্যাঁচই টিকছে না। আমরা আমাদের ইউরোপীয় কোট ছিঁড়ে টায়ারের ভেতর ভরলাম। পরে বহু কষ্টে তা ঠিক করতে সমর্থ হলাম। এতে কিছু সাহায্য হলো। তাতে করে ত্রিশ মাইল রাস্তা দুপুরের মধ্যে ফিরে এলাম। আরো বাকী চল্লিশ মাইল। দুর্ভাগ্যবশত আরো দুটি চাকা ফুটো হয়ে গেলো।

অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। পানিও শেষ হয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আমরা কিছুই খাইনি। সেই কূপের পানিতে আমাদের পাকস্থলীর অবস্থা এমনি হয়ে গেছে যে, কোনো খাবারই আমরা খেতে পারলাম না।

দ্রুত পরামর্শ করে গাড়িটা ফেলে যাওয়াই ঠিক করলাম। রেডিয়েটারের পানি পান করলাম। বাকী পানি সঙ্গে নিলাম। এমনি করে বির-মেরদুমা পৌঁছবার ক্ষীণ আশা তবু আমাদের আছে।

আমরা আরব পোশাক রাখলাম। টারবক্স একটা কম্বল, কিছু মেকারনী ও চিনি সঙ্গে নিলো। পানির বাকেটটা ও কিছু দড়ি আর আমার কম্বলটা সঙ্গে নিলাম। মুহম্মদ নিল একটি কম্বল এবং রেডিয়েটার থেকে নেওয়া পানি একটি টিনে করে। ছাগলের যে ছানাটি সঙ্গে এনেছিলাম তা জবাই করে তার রক্ত পান করবার চেষ্টা করলাম। ক্ষুধা-পিপাসায় কণ্ঠ ও জিহ্বা শুকিয়ে গেলেও সে রক্ত আমরা পান করতে পারলাম না কিন্তু। পেটের অসুখ তখনও আছে।

একটার সময় আমরা গাড়ি ত্যাগ করলাম। সিকি ঘণ্টার মধ্যে তা আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল হলো। কয়েক ঘণ্টা আমরা উত্তপ্ত বালুলাশির উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। এতো গরম যে কথা বলতে পারছি না। আধ ঘণ্টা পর পর এক ঢোক করে সেই বীজাণুপূর্ণ বিস্বাদ, তৈলাক্ত ও ময়লা পানি পান করছি। এমনি করে তিনটার সময়ই আমাদের জলপাত্র নিঃশেষ হয়ে গেলো। তা ফেলে দিলাম।

বাতাস উঠলো। বালু এসে আমাদের কানে ও নাকে ঢুকতে লাগলো। প্রত্যেকটি ঝাপটা যেনো আগুনের মতো লাগতে লাগলো। নীরবে আরো আধ ঘণ্টা চললাম সেই পথচিহ্নের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে। অবশ কণ্ঠে টারবক্স আমায় বললো: আর পারছি না। একটু বিশ্রাম করতে হবে।

না। আর যে পানি নেই, তা ভুললে চলবে না। আর রাত্রিবেলা পথ-চিহ্ন দেখতে পাবো না। দিনে যতদূর পারা যায় যেতেই হবে।

মুহম্মদ ছিলো কিছু আগে আগে। চিৎকার করে সে বললো: শীঘ্র, শীঘ্র আসুন।

চারটার সময় একটা ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পেলাম। সীমান্ত-রেখার কাছে থেমে কান পেতে শুনতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম না কিসের শব্দ। হঠাৎ পূর্বদিকে আসমানে দুটি এরোপ্লেন দেখা গেলো।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম: এরোপ্লেন! এরোপ্লেন! আমরা রক্ষা পেলাম।

আমরা আমাদের কম্বল মাটিতে ছড়িয়ে দিলাম। গায়ের পোশাক খুলে তা নাড়াতে লাগলাম। এরোপ্লেন দু'টি নিকটতর হচ্ছে। তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের মাথার উপর এসে পড়লো। আমরা চিৎকার করে ডাকলাম এবং কাপড় উড়ালাম; কিন্তু তারা দেখলোও না বা শুনলোও না। পশ্চিম দিকে ছুটে চললো। প্রায় ১৫০০ ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছে। তারপর উত্তর দিকে ঘুরে দ্রুত দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমাদের নীরবতা এবার আরো বেড়ে গেলো। কেউ আর কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। নিরাশায় মন ভেঙে গেছে।

টারবক্স বললো: আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের খুঁজতেই এদের পাঠানো হয়েছে। আমরা সমুদ্রতীরে থাকিনি সেটাই আমাদের দুর্ভাগ্য–তা'হলেই ওরা আমাদের দেখতে পেতো।

আমি নিরাশ হয়েছিলাম। বললাম: এটাও একটা সান্ত্বনা যে তারা জানতে পেরেছে যে আমরা হারিয়ে গিয়েছি। তারা বির-মেরদুমায় নিশ্চয়ই সৈন্য পাঠাবে।

এই সামান্য ঘটনা আমাদের ক্ষণিকের জন্য উৎসাহিত করলো। তার পরই শুরু হলো প্রতিক্রিয়া। বিস্তৃত মরু, শুষ্ক হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠলো। কেউ কথা বলতে পারছি না। আমরা এক সার হয়ে–প্রথম মুহম্মদ তারপর আমি এবং তারপর টারবক্স চলেছি।

সাড়ে চারটার সময় মুহম্মদ ফিরে চিৎকার করে আমায় বললো: টারবক্স মারা গেছে।

আমি চট্ করে সেদিকে ফিরে টারবক্সকে দেখতে পেলাম না। পরে দেখলাম একটা সাদা বাণ্ডিল যেনো পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম। বালুতে মুখ গুঁজে সে পড়ে আছে–নড়ছে না। আমি তাকে চিৎ করলাম। তার মুখ ও ঠোঁট নীল হয়ে গেছে। তার নিশ্বাসের শব্দ নেই। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াও বন্ধ বলে মনে হলো। ও মরে গেছে।

চলুন, আমরা চলে যাই: মুহম্মদ অধৈর্য হয়ে বললো। কিন্তু টারবক্স মরে নাই। দশ মিনিট চেষ্টা করবার পর তার জ্ঞান হলো। মুহম্মদ আশ্চর্য হলো। আমি তার চোখমুখ থেকে বালু সরিয়ে দিলাম এবং দাঁড় করাবার চেষ্টা করলাম।

আমায় একলা থাকতে দিন। এখানেই আমি ভালো আছি। সে বললো।

না চলো, আমাদের চলতেই হবে। এখানে থাকার অর্থ সকলের মৃত্যু।

আমাদের চারপাশে বালুর হিস্‌হিস্‌ শব্দ। আমাদের মাথার উপর বালুকণা লাল রং-এর কুয়াশার সৃষ্টি করেছে। আমি ঘুমুতে চাই। এখানে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন। ক্ষীণকণ্ঠে টারবক্স বললো। বলেই সে তার চোখ বন্ধ করলো।

আমি আর মুহম্মদ ওকে ঝাকানি দিলাম। তাকে ঘুমুতে দেয়া যায় না।

কি করা যায়? টারবক্স আর এগুতে চায় না। সে এখন অর্ধ-চেতন। তাকে ছেড়ে দিতেই সে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। তার সর্দি-গর্মি হয়েছে–পানি ছাড়া কোনো প্রতিকার নেই। আবার আমি তাকে ঝাকানি দিলাম। নির্বিকারভাবে সে বললো: আপনারা যান। যাচ্ছেন না কেন?

আমাদের সমস্ত কম্বল ওকে দিলাম। বললাম: যদি সে নিজেকে সুস্থ মনে করে তাহলে কাল যেনো এই পথচিহ্ন ধরে এগিয়ে যায়। তা না হ'লে এখানেই যেনো সে থাকে। বির-মেরদুমা থেকে আমরা কিছু পানি আনতে চেষ্টা করবো।

তার কাছে যে সমস্ত জিনিস ছিলো, সব সে ফেলে দিয়েছে। খাবার আর আমাদের কিছুই রইলো না। অবশ্য পেটের অসুখের জন্য আমাদের খাবার প্রবৃত্তিও নেই।

মুহম্মদ আর আমি রওনা হলাম। বির-মেরদুমায় যে পথ-চিহ্নটি গেছে তা ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা এগিয়ে চলেছি। সূর্য অস্ত গেলো। দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠলো। আধো অন্ধকার সত্ত্বেও আমরা চলা ক্ষান্ত করিনি। আমাদের বির-মেরদুমা পৌঁছতেই হবে। কারণ, সেখান থেকে পানি নিয়ে আমাদের ফিরে আসতে হবে। আমরা উভয়েই নিরাশ হয়ে পড়েছি। টারবক্স হয়তো এতক্ষণে মরেই গেছে। ঠাণ্ডা পড়েছে। বাতাস জোরে বইতে শুরু করেছে। তাতে বালুকারাশি সুন্দর তুষার কণার মতো উড়ে পথচিহ্ন স্থানে স্থানে মুছে ফেলছে। নিজ খেয়াল মতো চলে পুনরায় তার সন্ধান পাচ্ছি।

সাড়ে আটটার সময় পথচিহ্নটি একেবারে হারিয়ে ফেললাম। অনেক চেষ্টা করেও তা পেলাম না। ক্রমে আমরা একটা পাহাড়ের ঢালুতে উঠছি। এর পরই, যতদূর দৃষ্টি যায়–শুধু দুর্গম স্থান দেখা যায়। আমাদিগকে বির-মেরদুমা খুঁজে বের করতেই হবে। আরো কয়েক মাইল আমাদের যেতে হবে।

মুহম্মদ বললো: আমার মনে হয় টারবক্স এতোক্ষণে মরে গেছে।

হ্যাঁ, আমাদের চেয়ে সে ভাগ্যবান। আমরা কোনো দিনই বির-মেরদুমা খুঁজে পাবো না। আর এখানে কোথাও পানি নেই।

আশান্বিতভাবে মুহম্মদ বললো: আল্লাহর উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

অন্তত তিন দিনের পথ।– সেখানেও আমরা পানীয় জল পাবো না।

না, আমরা সমুদ্রের ধারে যাবো না। সেদিন আমরা এক বিন্দু পানিও পান করি নাই। আর তিনদিন সূর্যের তাপ সহ্য করতে পারবো না।

মুহম্মদ তার বাবার কাছ থেকে কুরআনের কিছু অংশ শিক্ষা করেছিলো। এই বিশাল বনে, যেখানে হায়েনা ও শিয়াল আসতেও ভয় পায়, সেই মরুভূমিতে সে এবার

কুরআনের একটি সূরা আবৃত্তি করলো। টারবক্সকে আমাদের কম্বল দিয়ে এসেছি। পরিশ্রমে আমাদের ঘুম আসছে। শরীর গরম রাখবার জন্য দু'জন ঘেঁষাঘেঁষি করে সেখানেই শুয়ে পড়লাম। বাতাস তেমনি বইছে। লাল বালুরাশি শীঘ্রই আমাদের ঢেকে ফেললো।

সকালে উঠেই দেখতে পেলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে সেদিন সকালে কোনো লোকই বৃষ্টির এতো প্রত্যাশী নয়, যতটুকু আমরা। মুহম্মদ মেঘ দেখে বললো: আল্লাহ আমাদের সহায়। আর আমরা মরবো না। কিন্তু এই মেঘ আমি পছন্দ করি না। সূর্য দেখা না গেলে পথ চিনবো কি করে? আমার মনে হয় এদিকেই উত্তর। বলেই সে একদিকে নির্দেশ করলো।

আমাদের উত্তর দিকেই যেতে হবে। তার ধারণা মাফিকই চলতে লাগলাম। আমাদের তৃষ্ণা গত সন্ধ্যার চেয়ে অনেক কম–কারণ রৌদ্র নেই–বাতাসও নেই। প্রায় দু'ঘণ্টা সোজা চললাম। হঠাৎ দূরে শ্বেতবর্ণের একটা আকৃতি দেখা গেলো। আমাদের দিকে আসছে। মুহম্মদ বললো: নিশ্চয়ই এ কোনো বেদুইন হবে।

বেদুইন দেখে এখন আমরা ভয় পাইনি। আমরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর।– দুনিয়ার সমস্ত বেদুইনের সম্মুখীন হতেও এখন আমরা রাযী–যদি আমরা পানি পাই। আকৃতিটি এগিয়ে আসছে। আমরা কাপড় উড়ালাম–সেও তার কাপড় উড়ালো। আমরা দৌড়ে এগিয়ে গেলাম, সেও দৌড়ে এলো আমাদের দিকে। বাঃ এ যে টারবক্স। অজানিতভাবে আমরা বিপরীত দিকে এসে পড়েছি।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আনন্দে সবার চোখে অশ্রু গড়িয়ে এলো। পানি আনবার জন্য হলেও টারবক্সকে ফেলে আসার জন্য অনেক বার আমি ও মুহম্মদ খুব অনুশোচনা করেছি। টারবক্স বললো যে সে এখন বেশ ভালো আছে। সকালে উঠেই সে নিজকে বেশ সুস্থ মনে করে এবং তখনই বির-মেরদুমার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ে। যে পথচিহ্ন গত রাত্রে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই ধরে সে এসেছে।

আবার আমরা তিনজন ফিরে চললাম। এবার আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হলো। বৃষ্টি না হলেও আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। আবার সেই পথচিহ্ন ধরে পানির সন্ধানে চললাম। তিন ঘণ্টা চলার পরই বুঝতে পারলাম যে আমরা বির-মেরদুমা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছি। টারবক্স কিছুক্ষণ ঘুমোতে চাইলো–আমি বারণ করলাম। কারণ, তখন আমরা পানির কাছে পৌঁছে গেছি। কিন্তু সে জিদ ধরলো। তাই আবার আমি আর মুহম্মদ চলতে শুরু করলাম।

তিনটার কাছাকাছি আমরা বির-মেরদুমা পৌঁছলাম। খুব নিকটে এসেই তবে আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের আনন্দের আর সীমা নেই। দড়ি বেধে পানির পাত্র কূপের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং সেই কীট-পর্ণ পরিষ্কার পানিই পান

করলাম। কিন্তু এ যে পানি নয়–জীবন। কয়েকদিন আহার না করে থাকা যায়, কিন্তু পানি ছাড়া এই মরুভূমিতে....।

সেখানেই আমরা টারবক্সের জন্য অপেক্ষা করলাম!

টারবক্স এলো না। শেষটায় পানির পাত্রগুলি পূর্ণ করে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় একশো গজের মধ্যেই তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমরা পাত্রের পানি তার গায়ের উপর ঢেলে দিলাম। মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এরূপ বারি বর্ষণে সে এতো বিস্মিত হয়েছিলো যে আমি তার তেমন বিস্ময়-ভাব কোনোদিন দেখি নাই।

পানি পান করে তৃষ্ণা দূর করে সুস্থ হয়ে বসে তিনজনে তখন আমাদের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম। টারবক্স বললো: আমার বিশ্বাস কেউ হয়তো আমাদেরই সন্ধানে এসে আমাদের খুঁজে বার করবে।

আমরা এতে বেশী নিশ্চিত হতে পারলাম না।

বললাম: আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে এই এরোপ্লেন দুইটি আমাদেরই সন্ধানে এসেছিলো। একমাসের মধ্যে কেউ এদিকে আসবে কিনা সন্দেহ আছে। ততোদিন আমরা অনাহারে মারা যাবো।

আমরা কিছুদিন এখানে অপেক্ষা করতে পারি, ততোদিনে যদি কেউ না আসে তাহলে আমরা নুফিলিয়ার দিকে রওনা হতে পারি।

আমি এতে রাযী হতে পারলাম না। বললাম: আমাদের খাবার কিছুই নেই–আর এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ শক্তি আছে ততক্ষণ তার সদ্ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

আমি এখানেই থেকে যাবো–এখানেই পানি আছে। তুমি কি বলো মুহম্মদ?

আমার মতে যাওয়াই উচিত। এখানে আমাদের উপবাসে মরতে হবে। আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাবো–মুহম্মদ বললো।

আমি আর মুহম্মদ বির-উম্মুল-রিস যাওয়া মনস্থ করলাম। টারবক্স সেখানেই থেকে গেলো। যদি কেউ আসে তাহলে আমাদের জন্য তাদের পাঠিয়ে দেবে এই ঠিক হলো।

সৈনিকদের পরিত্যক্ত একটি বোতল পেলাম। মুহম্মদ তাতে পানি ভর্তি করলো। যতটুকু সাধ্যে কুলোয় ততটুকু পানি পান করে নিলাম। তারপর রওনা হলাম। আগের মতো পথচিহ্ন ধরে চলতে লাগলাম। কিন্তু চিহ্ন খুব অস্পষ্ট। এখানে বালুর ঝড় বয়ে গেছে হয় তো। সন্ধ্যা পর্যন্ত বির-উম্মুল-রিস পৌঁছতে পারবো।

সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্বেই আমরা পথচিহ্ন হারিয়ে ফেললাম। তবে ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখতে পেলাম। আমি মুহম্মদকে জিজ্ঞেস করলাম: পানি না খেয়ে ঘোড়া ক'দিন থাকতে পারে?

বড়জোর দুদিন।

তাহলে এই ঘোড়ার পদচিহ্ন শীঘ্র আমাদের কোনো কূপের কাছে নিয়ে যাবে।

রাত্রি হবার আগেই আমাদের পানির শেষ বোতলটি ফুরিয়ে গেলো। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। সূর্য পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক তেজ বিকিরণ করতে লাগলো। রাত নয়টায় চাঁদের আলোয় একটা পুরনো বদ্ধ ঘর দেখতে পেলাম। মনে হলো কোনো সময় সেখানে সৈন্য বাস করতো। কিন্তু কূপের কোনো সন্ধানই পেলাম না। মধ্যরাত্রে চাঁদ একখণ্ড মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লো। আমরা পথ দেখতে পেলাম না। শুয়ে পড়া ছাড়া করবার আর কিছুই নেই। একটা ঝোপের পেছনে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সূর্য তার পূর্ণ তেজ নিয়ে উদিত হলো। আটটার সময়ই ভীষণ তেজ আমাদের মাথার উপর পড়তে লাগলো। আবার আমাদের তৃষ্ণা বাড়তে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর অবশ হয়ে এলো। হতাশ হয়ে মুহম্মদ বললো: এই পথ ধরে চলতে কেন বলেছিলেন? গাড়ির দাগ ধরে চলাই যে আমাদের উচিত ছিলো। তাহলেই আমরা বির-উম্মুল-রিসে পৌঁছতে পারতাম। এখন আমরা কিছুই জানিনে আমরা কোনো কূপ পাব কিনা।

আমরা উভয়েই এ পথ বেছে নিয়েছিলাম। তুমি বলেছিলে যে ঘোড়ার পদচিহ্ন কোনো না কোনো কূপে পৌঁছে দেবে

হয়তো সে বদ্ধ ঘরই সে কূপ। অন্ধকারে আমরা তা দেখতে পাইনি।

আমি শূন্য বোতলের দিকে চাইলাম। বললাম: আমেরিকানের কথাই ঠিক। বির-মেরদুমাতেই আমাদের থেকে যাওয়া উচিত ছিলো।

নুফিলিয়া পর্যন্ত এত দূর হাঁটতে পারবো না। আর নুফিলিয়া হয়তো আমরা খুঁজেই পাবো না। তা একটা উপত্যকায় অবস্থিত। আমরা কি ফিরে যাবো?

আমি নিজেও মরুভূমির আতঙ্ক অনুভব করতে লাগলাম। যে পথচিহ্ন ধরে এসেছি সে পথ ধরে ফিরে চলাই উচিত।

দুপুরবেলা সূর্যতেজ চরমে উঠলো এবং আমাদের তৃষ্ণা অসহ্য হয়ে উঠলো। ভীষণ স্থান দিয়ে আমরা চলেছি। আমাদের আশেপাশে ঝোপ-ঝাড়, শুকনো ঘাস, ছোট ছোট পাহাড়। একটা ছোট্ট টিলার উপর এক প্রকারের প্রস্তর নির্মিত কি দেখা গেলো। বির-উম্মুল-রিস বলে মনে হলো।

টিলাটি খুব বেশী দূর বলে মনে হলো না,–আধমাইলের কম হবে। কিন্তু রৌদ্রের ঝিকিমিকিতে তার দূরত্ব সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মুহম্মদ অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, সেখানেই সে বসে পড়েছে। আমি একাকী চললাম।

বাস্তবিক তার দূরত্ব একমাইল। পানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আমাকে দ্রুত চলতে বাধ্য করলো। উপরে উঠেই দেখতে পেলাম সেই প্রস্তর নির্মিত স্থানটি একটি প্রাচীন কবর।

পিপাসায় এবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। সেখানে শুকনো ঘাসের উপর কিছু বড় শামুক দেখতে পেলাম, তাই খেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেগুলো মরে শুকিয়ে গেছে।

ফিরে এলাম মুহম্মদের কাছে। আবার চললাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চললাম। বিকেলের দিকে আর এগোতে পারলাম না। শুকনো ঘাস, বন্যফুল চিবিয়েও একবিন্দু পেলাম না। আমাদের জিভ শুকিয়ে কালো হয়ে পড়েছে। তালু এতো শুকিয়ে গেছে যে কথা বলতে পারছি না। সেখানে এক ঘণ্টার বেশী শুয়ে রইলাম। পায়ে ঘা হয়ে গেছে–হাঁটতেও পারছি না।

হঠাৎ টারবক্সকে আমাদের সামনে দেখতে পেলাম। আমরা বুঝতে পারি নাই যে বির-মেরদুমা থেকে মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে আছি। টারবক্স বললো: আমি প্রথম তোমাদের বেদুইন বলে ভেবেছিলাম। তাই তোমাদের কাছে ভয়ে এগিয়ে আসি নাই। আমি আরবী বলতে পারি না। টারবক্স বেশ ভালোভাবেই সেখানে আছে। কূপের কাছেই একটা বালুস্তূপের ভিতর সে একটা গর্ত খুঁজে নিয়েছে। সে কতকগুলো পুরনো টিন কুড়িয়ে পেয়ে তা পরিষ্কার করে পানি ভর্তি করে রেখেছে–আমরা তাই পান করলাম–যতোদূর পারলাম প্রাণভরে পান করলাম।

সেদিন আর যাবার কথা বলি নাই। সেই পানি পেয়ে আমরা খুবই খুশী। সন্ধ্যায় টারবক্স তা'র গর্তে ঢুকলো। আমরা কয়েকটি ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমাদের সাহস ফিরে পেলাম। আমি আর মুহম্মদ রওনা হতে চাইলাম। এবার আর ফিরে আসছি না। টারবক্স এবারও যেতে চাইলো না। বললো: এটা খুবই বিপজ্জনক।

আবার আমরা তাকে পথে ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। আগের মতোই আমরা পথচিহ্ন ধরেই চলতে লাগলাম। কিন্তু এবার আমরা উত্তর দিকে চললাম–সেদিকেই সমুদ্র। সৈনিকটি বলছিলো, সমুদ্র মাত্র তিন মাইল দূরে অবস্থিত। নুফিলিয়া যদিও সমুদ্রতীরে নয়, তবু যে করেই হোক আমরা ঠিক মতোই যেতে পারবো।

পূর্বের মতো এবারও আমরা এক বোতল করে পানি সঙ্গে নিলাম। খুব গরম। এবার পানি খুব কম করে খরচ করছি। খুব পিপাসা সত্ত্বেও আমরা শুধু ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছি।

দুপুরের কাছাকাছি আমরা একটা শুকনো নদীর কাছে পৌঁছলাম। সেখানে এক প্রকার লম্বা খাগড়া জাতীয় ঘাস জন্মেছে। কিন্তু পানি কোথাও নেই। তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে কিছুদিন আগেও নদীতে কিছু পানি ছিলো। সেই ঘাসের কচিপাতা চিবোতে লাগলাম। তাতে পিপাসার খানিকটা শান্তি হলো। শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে সমুদ্রের দূরত্ব সম্বন্ধে সৈনিকটির জ্ঞান অতি অল্প। দুটো পর্যন্ত আমরা নদী অনুসরণ করে চললাম। সেখানে আমরা একটা খচ্চরের পদচিহ্ন দেখতে পেলাম, তাই ধরে

অগ্রসর হলাম। দূরে একটা সাদা রংয়ের ঘর দেখতে পেলাম। এটা কোনো বেদুইনের কবর নিশ্চয়ই নয়। এটা একটা বাড়ী, এতে লোক বাস করে।

আমাদের বোতলে অর্ধেক পানি তখনও আছে। আর যেখানে বাড়ী আছে সেখানে কূপও থাকে। এখন আমরা ইচ্ছামতো আমাদের পানি পান করতে পারি।

যে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে খেতেও এতোক্ষণ ভয় পেয়েছি তার সবটুকুই এখন পান করে ফেললাম। আমার পকেটে পাঁচশো লিরা আছে। মুহম্মদকে বললাম: যথেষ্ট টাকা আমাদের আছে। এই নাও একশো' লিরা। এই বাড়ীতে গিয়ে যা' খুশী কিনে নেবে।

হ্যাঁ, এখানে আমরা ডিম আর মোরগ পাবো। যেখানেই বাড়ী আছে সেখানেই মোরগ আছে। এমনকি আমরা মেষও পেতে পারি। বেশ মজা করে খাওয়া যাবে।

ব্যস্তভাবে বাড়ীটির দিকে চললাম। বাড়ীটা সুরক্ষিত। দরজা বন্ধ। মেষের মল দেখে মনে হলো বাড়ীটা শূন্য নয়। দরজা ধাক্কা দিলাম। কোনো উত্তর পেলাম না। আবার ধাক্কা দিলাম। তবুও নীরব। তখন দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

বাতাস দুর্গন্ধময়। কয়েকটা বড় মাকড়সা দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালালো। একটা টিকটিকি এক দৌড়ে ছাদে পৌঁছে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। ভিতরে আধা অন্ধকার। রৌদ্র থেকে হঠাৎ ছায়ায় ঢুকে প্রথমে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। পরে দেখতে পেলাম যে কক্ষের এক কোণে একটা পাথরের চৌকির উপর একটা লোক শুয়ে আছে–দীর্ঘ শ্মশ্রু-বিমণ্ডিত এক বৃদ্ধা। আমরা নিকটে গেলাম, তখন দেখলাম লোকটা মৃত। অনেক দিন আগে এর মৃত্যু হয়েছে। লাশ প্রায় পচে এসেছে। একটা হাত তার ঝুলে আছে। সেখানে একটা পাথরের কলসী। টেবিলের উপর একখানা কুরআন–সূরা "ইয়াসিন" পাতা খোলা। এক ইঞ্চি পুরু ময়লা সারা ঘরময় জমে আছে। এক কোণে একটা কাঠের বাক্স। হাড়ের টুকরা, পোকামাকড় ও বাদুরের পাখা এবং পাখীর পালকে ভর্তি। দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে এলাম।

মুহম্মদ বললো: এ বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোনো কূপ আছে।–তার কণ্ঠে নিরাশার সুর।

আমরা একটা কূপ খুঁজে পেলাম। কিন্তু তা বালুতে ভর্তি।

নিরাশ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। সেই বাড়ীর কিছু দূরে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম দেখতে পেলাম। কোনো একটি বাড়ীও ভালো দেখতে পেলাম না। এখানেও সবগুলো কূপ বালু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরও খানিক দূরে একটি কবরস্থান। কোনো কোনো কবরে পাথর নেই। শুধু রাইফেল ও লাঙ্গল রাখা আছে তাতে। সর্বত্র মৃত্যুর বিভীষিকা। একটা কবরের পেছন থেকে একটা শিয়াল উঁকি দিচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি বললাম: এ শিয়ালটা পানি পায় কোথায়?

মুহম্মদ কেঁদে ফেললো। বললো: সবটা পানি আমরা খেয়ে ফেলেছি। বির-মেরদুমায় ফিরে যাবার পথও আর খুঁজে পাবো না।

না। সমুদ্র পর্যন্ত আমাদের যেতেই হবে। সেখানে হয়তো আমরা পানি পাবো।

ও-কথা ভাবছেন কেন? সে পানি হবে লবণাক্ত।

কবরে রাখা একটা রাইফেল হাতে নিলাম। এর নল আর আমাদের পানির পাত্র দিয়ে পানি-শোধক একটা যন্ত্র হয়তো তৈরি করা যেতে পারে। কি করে করতে হয় তা আমার জানা নেই। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে।

আমরা সমুদ্রের দিকে চললাম। নদীটি ক্রমে অধিক চওড়া ও উর্বর বলে মনে হচ্ছে। বললাম: এখানে তো প্রচুর শস্য জন্মাতে পারে। সবগুলি বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে কেন বলতে পারো?

খুব সম্ভব এ ইটালিয়ানদের কাজ।

তারাই কি কূপগুলি সব নষ্ট করে দিয়েছে?

আমার বাবাকে যে গ্রামে হত্যা করা হয়েছিলো সে গ্রামেও ওরা এরূপ করেছিলো, এখানেই বা তা করবে না কেন?

সেই লোকদের কি হয়েছিলো?

তাদের বেনগাজী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। সেখানে তাদের ইচ্ছামতো বসবাস করতে পারে–অবশ্য যদি তাদের গুলী করে মেরে ফেলা না হয়ে থাকে।

আর মেয়েদের?

আল্লাহই শুধু তা জানেন। আমার মা সেই সৈনিকদের নিকাহ করেছিলো। অন্যদের আমি দেখি নাই।

ক্রমেই লম্বা ঘাস দেখা দিতে লাগলো। বোঝা গেলো যে শুকনো নদী যেখানে সাগরে মিশেছে সেখানেই আমরা পৌঁছেছি। অকস্মাৎ খানিক দূরে হলদে মতো একটা কি আমাদের সামনে দিয়ে লাফিয়ে গেলো। মুহম্মদ কেঁপে উঠলো। বললো: চিতে। শীঘ্র বালুর! এ বড় ভয়ঙ্কর।

সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। সূর্যের কিরণে সমুদ্র ঝিলমিল করছে। ভাবলাম এবার আমরা বেঁচে গেছি। এখানে কোথাও লোকজন নেই। পিছনে তপ্ত মরু। পানি এখানে প্রচুর কিন্তু পানের অযোগ্য। সমুদ্র সৈকত অস্তমান সূর্যের আলোয় লোহিতাভা ধারণ করেছে। সমুদ্রের ঢেউ এসে ক্রমে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। আমরা তাতেই স্নান করলাম, ফলে তৃষ্ণারও খানিক উপশম হলো। তারপর আগুন জ্বালাবার জন্য লাকড়ী সংগ্রহ করলাম।

পানি শোধরাবার যন্ত্র চেষ্টা করে তৈরি করতে পারলাম না। কেট্‌লিতে পানি গরম করে তাতে কম্বল ডুবিয়ে পানি পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। অবশ্য সামান্য কয়েক ফোঁটা ভালো পানি তাতে পাওয়া গেলো। কিছু শামুক কুড়িয়ে খেলাম। সেই রাত্রের জন্য এই আমাদের আহার। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সমুদ্রতীরে পৌঁছার জন্য খুশী হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সমুদ্রের তীর ধরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। বহুদিন মরুভূমির তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়ে হেঁটে আমাদের পায়ে ঘা হয়ে গেছে। খালি পায়েই এবার চলতে লাগলাম। হঠাৎ মুহম্মদ বলে উঠলো: এই যে পেয়ে গেছি।

কি পেয়ে গেছো?

কি করে ভালো পানি পাওয়া যেতে পারে—তাই! ত্রিপোলীতে খেলা করবার সময় আমরা পানির কাছ থেকে কিছু দূরে গর্ত খুঁড়তাম। সেই গর্তে যে পানি আসতো তাই আমরা পান করতাম।

আমার তাতে বিশ্বাস হলো না। অনেক গর্তই আমরা খুঁড়লাম। কিন্তু ফল একই রকম হলো। লবণাক্ত পানি লবণাক্তই রয়ে গেলো।

অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করলাম। কিছু কাঁকড়া ধরে তা খেলাম। কিন্তু তাতেও তৃষ্ণা নিবারণ হলো না। ছোট ছোট যতগুলো শামুক পেলাম সব খেলাম। ভাবলাম অক্টোপাস ও অন্যসব প্রাণীও হয়তো পাবো। কিন্তু পিপাসা আমাদের বেড়েই চললো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ খানিকটা লবণ পানিও খেয়ে ফেলেছি। দুপুরের কাছাকাছি তা অসহনীয় হয়ে উঠলো।

একটা ভালো খেয়াল চাপলো। গায়ের সমস্ত জামা-কাপড় নিয়ে পানিতে নেমে গেলাম। এবং সেই ভিজা কাপড়ে হাঁটতে লাগলাম। এতে কিছুটা ফল হলো।

পাঁচটার সময় তীরের কাছেই পাঁচটি কূপ দেখতে পেলাম। চারটির পানি এতো লোনা যে তা আমরা খেতে পারলাম। না। পঞ্চমটির পানি ময়লা ও অপরিষ্কার। তাই খানিকটা খেলাম এবং বোতলে ভর্তি করলাম।

সেদিন রাতে আলো জ্বেলে সমুদ্রের তীরে ঘুমোলাম।

পরদিন সকালে মুহম্মদ জিজ্ঞেস করলো: কখন আমরা সমুদ্রের তীর ছেড়ে ভিতরের দিকে যেতে পারবো?

তোমার চেয়ে বেশী কিছুই জানিনে। নুফিলিয়া সমুদ্র থেকে বারো মাইল। সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত সমুদ্রের তীর ধরেই আমাদের অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

সিরটিস এখান থেকে কতদূর? সমুদ্রের উপর অবস্থিত। তা খুঁজে বের করা সহজ।

তা' ঠিক বটে। কিন্তু এতো দূর আমরা হাঁটতে পারবো না। মনে রেখো সাতদিন আমরা কিছুই খাইনি। আড়াই শ' মাইল রাস্তা চলতে পারবো না। এতোটুকু রাস্তা যেতে অন্তত কুড়িদিন লাগবে। না খেয়ে এতো দিন বাঁচবো না। তোমার কি খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

মুহম্মদ মাথা নাড়লো। বললো: না। তবে বেশ ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। দিনের বেলা বিশ্রাম করলে কোনো ফল হবে না। আমাদের চলাই উচিত।

পরে সে হেসে বললো: জানি না আমেরিকান ভদ্রলোক কেমন আছেন? তবে তাঁর কাছে পানি আছে।

হাঁ, তিনি হয়তো এতক্ষণে স্বর্গে গেছেন–শুধু পানি খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না।

মেরদুমায় টারবক্সের অবস্থা চিন্তা করলাম।

সারাদিন সমুদ্রের তীর ধরে চলেছি। চারটায় এক জায়গায় একটা থাম দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম তা' একটি 'সাইন পোস্ট'। বোর্ডে তীর অঙ্কিত আর তাতে লেখা রয়েছে "নুফিলিয়া"। আর তার নীচে লেখা, "সেকেণ্ড স্কোয়াড্রন সেভারী"। আমি আনন্দে বলে উঠলাম: এ যে নুফিলিয়ার কমান্ডান্টের নাম।

মুহম্মদ কোনো জবাব দিলো না। আমরা উভয়েই আনন্দে অধীর হয়ে পড়েছি। হঠাৎ সে আমাকে ডেকে বললো যে, সে একটি কূপ দেখতে পেয়েছে। সে কূপের পানি অত্যন্ত পরিষ্কার। আমরা ভিতরের দিকে চললাম। বললাম: আজ রাতেই আমরা মেরকানী খেতে পাবো। নুফিলিয়া মাত্র বারো মাইল। রাত আটটার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারবো।

আমাদের সামনেই একটা পাহাড়শ্রেণী। প্রথম পাহাড়টিতে আমরা উঠলাম। এর পিছনে আরো উঁচু আর একটা পাহাড়। আমরা তাতেও উঠলাম। আটটা বেজে গেলো। বললাম: এখনই আমরা পৌঁছে যাবো। কিন্তু তখনো নুফিলিয়ার কোনো চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা থেকে অনেক দূরে আরো উঁচু একটা পাহাড় দেখতে পেলাম। বললাম: চলো ওটাতেও চড়ি। সেখান থেকে নিশ্চয়ই আমরা নুফিলিয়ার আলো দেখতে পাবো।

মুহম্মদ নিরুত্তর। সে বসে পড়েছে। এই তাকে প্রথম নিরাশ হতে দেখলাম। তার মাথা হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে।

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম। বললাম: আমরা এখন আমাদের গন্তব্য স্থলের এতো কাছে এসে পড়েছি যে এখন নিরাশ হওয়া শোভা পায় না। ঐ চূড়ায় উঠলেই নিশ্চয় দেখতে পাবো যে নুফিলিয়া খুবই নিকটে।

আমার পেছনে পেছনে মুহম্মদ অতি কষ্টে চলতে লাগলো। আমি দ্রুত চলেছি এই ভেবে যে ওখানে পৌঁছেই নুফিলিয়া দেখতে পাবো। সমুদ্র তীরে মাইল পোস্ট দেখে এ সম্বন্ধে আমি স্থির-নিশ্চিত হয়েছি।

কোনো রকমে সেখানে উঠলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। যতোদূর দৃষ্টি যায় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেদুইনদের একটি আলোর শিখাও দেখা গেলো না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। মুহম্মদ সে পর্যন্ত আসে নাই। আমি অস্বস্তি বোধ করলাম।

চিৎকার করে ডাকলাম 'মুহম্মদ'। কিন্তু কোনো জওয়াব পেলাম না। পাগলের মতো এখন আমার অবস্থা হলো। মুহম্মদ হারিয়ে গেছে। আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কোনো সাড়াই পেলাম না।

এরূপ অবস্থায় মানুষের মনের ভাব যে কি হয় তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ত্রিপোলীর একটা নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় আমি বসে আছি। একা–নিঃসঙ্গ–পানি নেই–খাদ্য নেই–আশা নেই।

মুহম্মদ চলে গেছে।

মুহম্মদ ছিলো একটি অতি সাধারণ নগণ্য বালক। ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা ওকে নোংরা ভিক্ষুক ছাড়া আর কিছুই বলতো না। আমি এখন তারই বিরহে কাতর হয়ে পড়েছি। তারই জন্য আমার হৃদয় বেদনায় ভরে গেছে। ওকে না পেলে হয়তো আমি পাগলই হয়ে যাবো। এই নির্জন বিয়াবানে সভ্য মানুষের বুদ্ধি ও সংস্কৃতির মূল্য কতোটুকু? এখানে সব অর্থহীন–নিরর্থক। এখানে মানুষ একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। মানুষ মানুষের জন্য এখানে একান্তভাবে বেদনা বোধ করে–অনুভব করে অন্য আর একটি মানুষের হৃদয় তার নিজ হৃদয়ের পাশে ধুক ধুক করছে– এই অসীম শূন্যতাকে অবহেলা করবার জন্যই তার প্রাণ কেঁদে ওঠে আর একজনকে পাওয়ার আশায়।

ইউরোপের বিজ্ঞতম দার্শনিকদের কাছে সারাজীবন ধরে যে জ্ঞান আমি সঞ্চয় করতে পারিনি এই পাঁচ মিনিটে এই নির্জন পাহাড়ের চূড়ায় তার চেয়েও অধিক জ্ঞান লাভ করেছি। জীবন আর মৃত্যু এক।

চাঁদের আলো নিষ্প্রভ। বালককে খুঁজতে ফিরে এলাম। তার পরনে ছিল সাদা পোশাক। পাঁচ মিনিট অনুসন্ধানের পর আমি তাকে দেখতে পেলাম মাটিতে শুয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বুঝতে পারলাম বিশ্রামের জন্য সে বসেছিল কিন্তু অবসাদ ও ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় উভয়ে সে রাত কাটালাম।

সারারাত স্বপ্ন দেখেছি। রাত বাস্তব আর দিন অবাস্তব হয়ে গেছে। মনে হলো মন যেনো অন্ধকারকে গ্রহণ করতে নারায, তাই রাতে সে তার স্বর্গ রচনা করে। শরীর যতো দুর্বল হয়ে আসে আত্মা ততোই মুক্ত হতে থাকে। স্বপ্নে আসে আশ্চর্য স্পষ্টতা।

পরদিন সকালে জেগে উভয়েই নিজেদের নির্জীবের মতো মনে হলো। এটাই যে আমাদের শেষ দিন তাতে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। এখন কি করে উপত্যকায় অবরুদ্ধ নুফিলিয়া খুঁজে বের করি?

পুনরায় ফিরে চললাম সমুদ্রতীরে। সেখানে অন্তত পানি রয়েছে। চলার পথে কেউ একটি কথাও বলি নাই। ঠিক দুপুরে পৌঁছলাম সমুদ্রতীরে। তীর ধরে চলেছি– কিন্তু কয়েক ঘণ্টা চলার পর ভিন্ন রকমের তীর দৃষ্টিগোচর হলো। পানির কিনারা ধরে আর চলা যায় না! মাঝে মাঝে খুব বড় বড় শিলা যা কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। কয়েক মাইল তাই স্থলের ভিতর দিয়েই চলতে হলো। এ স্থানটি ঘন উঁচু ঝোপ-কাঁটায় ভর্তি। মনে হলো হায়েনা আর শিয়ালেরা যেন টের পেয়েছে যে, আমরা

অবসন্ন। শীঘ্রই হয়তো আমরা শেষ হবো–কারণ এরই মধ্যে অনেকগুলোই আমরা দেখতে পেলাম। আমাদের আশেপাশে চুপি চুপি ঘুরে বেড়াচ্ছে আগের চেয়েও খুব নিকটে। পাঁচটায় মুহম্মদ সারাদিন পর প্রথম কথা বললো: কোথাও কি একটা গর্ত খোঁড়া যায় না?

কেন?

আমরা তা'তে শুতে পারি। আর হয়তো বেশী দূর আমি যেতে পারবো না। আর গিয়েই বা লাভ কি? নুফিলিয়া খুঁজে পাবো না। দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি?

কিন্তু সেজন্য গর্ত খুঁড়বো কেন?

তাহলে আমরা শান্তিতে মরতে পারবো। কিছু শক্তি থাকতেই পাথর দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে পারবো। আমরা পড়ে গেলে হায়েনা আর শিয়াল আমাদের আক্রমণ করবে।

এই বলে সে কেঁদে ফেললো: মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমার বাবা আমায় ভালো মুসলিম হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই হিংস্র প্রাণীদের আমি ভয় করি।

আমি তাকে সাহস দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। অথচ আমার নিজেরই বেশী সাহস ছিলো না।

সন্ধ্যায় ঝোপের মাঝে একটা সজারু দেখতে পেলাম। আগুন জ্বেলে তাকে পাথর মেরে সেই আগুনে ফেলে দিই–তারই যতোটুকু সম্ভব খেলাম।

পরদিন সারাদিন চলে ভেতরের দিকে কয়েক মাইল গেলাম। সকালে একটা ভালো পানির কূপ পেলাম। কিন্তু কোনো লোক বা পথচিহ্ন দেখতে পেলাম না। চারটার সময় একটা চড়াইয়ের উপর একটা দুর্গ দেখতে পেলাম। তার উপরে দেখতে পেলাম একটা পতাকাশূন্য থাম। এটাও জনমানবহীন।

বিশ থেকে ত্রিশটি কবর দেখে মনে হলো, কিছু দিন পূর্বে এখানে যুদ্ধ চলে ছিলো। চারদিকে খালি টিন ও বোতল পড়ে আছে। কবরের অনতিদূরে হায়েনা আর শিয়াল তাদের বাসা তৈরি করেছে–জমিতে বেশ ফসল জন্মে আছে। মুহম্মদ তার কিছু সংগ্রহ করে আনলো, তাই আমরা খেলাম।

সন্ধ্যার সময় হায়েনাগুলি অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠলো–তারা দুর্গ পর্যন্ত চলে এলো। একটা বদ্ধ ঘরে আমরা আগুন জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সারা রাত তা জ্বললো। হায়েনা ও শিয়াল কাছে ঘেঁষলো না। কিন্তু সূর্যোদয় পর্যন্ত তাদের ঐক্যতান বন্ধ হয়নি।

পরদিন আমাদের উপবাসের দশম দিন। ঘুম থেকে উঠে মুহম্মদকে বললাম: যদি তুমি রাযী হও তবে একটা কথা বলি–

কি?

দেখছো না কতো খালি বোতল পড়ে রয়েছে। চলো এর চারটায় পানি ভরে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পথচিহ্ন অনুসন্ধান করি। যদি না পাই তখন দেখা যাবে। সেখানে হয়তো হায়েনার উৎপাত নেই– সেদিক দিয়ে অন্তত কিছুটা লাভ হবে।

মুহম্মদ মাথা নাড়লো। বোতলে পানি ভর্তি করে ভিতরের দিকে রওনা হলাম।

দশটায় একটা পথচিহ্ন পেলাম। তাই ধরে এগিয়ে চললাম। দু'ঘণ্টা চলার পর দেখতে পেলাম তা তিন দিকে চলে গেছে। কোন্‌টি দিয়ে যে যাবো তা' ঠিক করতে পারছি না। ভাগ্যের উপর ভরসা করে বাঁ দিকেরটি ধরে চললাম। আর ঘণ্টার মধ্যেই একটা উপত্যকায় পৌছে গেলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা রেডিয়োর থাম অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। থেমে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুহম্মদের দিকে চেয়ে বললাম: এই থামটি দেখতে পাচ্ছো?

সেও তা' দেখতে পেয়েছে!

নুফিলিয়া!

একটা বড় কাফেলা নুফিলিয়া পৌছেছে। তাঁদের তাবুর পাশ দিয়ে দুর্গের ফটকের দিকে আমাদের যেতে দেখে বেদুইনরা হা করে চেয়ে রইলো। আমাদের দেখতে খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে। আমাদের উভয়েরই পা খালি। জুতোর শক্ত চামড়ার ঘসায় পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। আমাদের পোশাক ছিন্ন ও মলিন। আমার দাড়িও খুব লম্বা হয়ে পড়েছে। শেষ মাইলটিই খুব কষ্টদায়ক হয়েছিলো।

সান্ত্রী ভয়ে ভয়ে আমাদের লক্ষ্য করতে লাগলো। সে আমাদের চিনতে পেরেছে। সে পরে আমায় বলেছিলো যে, সে ভেবেছিলো অনেক আগেই আমরা মরে গেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ক্যাপ্টেন দ্য-পোলী আছেন কি না?

সে কোনো উত্তর দেয়নি। সে অফিসারদের মেস্ দেখিয়ে দিলো। আমাদের দেখে সৈন্যেরা ছুটে এলো দেখতে। আমাদের আগমন বার্তা যখন জানানো হয় তখন অফিসারেরা খেতে বসেছেন। দ্রুত খাওয়া সেরে তারা ছুটে এলেন।

আমরা বেঁচে আছি: কিন্তু তা আমরা এখনো বুঝতে পারছিনে। আমরা শ্রান্তিও বোধ করছি না। আমাদের চারদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন! একি বাস্তব না স্বপ্ন? আমরা যেন কবর থেকে উঠে এসেছি তেমনিভাবে অফিসারেরা আমাদের দেখতে লাগলেন। তারপর এলেন ক্যাপ্টেন দ্য-পোলী। তিনি আমার কাছে এলেন। তাকে খুব বড় দেখাচ্ছে। অফিসার মেসের উপরে তেরঙ্গা পতাকা ঘুরতে লাগলো। দালানটা ঘুরতে লাগলো। হাজার চোখ যেন আমাদের চারপাশে ঘুরছে।

টারবক্স এখন বির-মেরদুমায় আছে–অনাহারে সে মৃতপ্রায়। এটুকু কোনো রকমে বলতে পারলাম। তারপর সব আমার কাছে অন্ধকার হয়ে এলো।

আমার মাথায় ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা দেওয়ায় আমি জেগে উঠলাম। আমরা খেতে চাইলাম।

একজন অফিসার এক বোতল ব্রান্ডি ও কয়েকটি কাঁচা ডিম নিয়ে এলেন। দুটি গ্লাসে তা ঢালা হলো। কিন্তু মুহম্মদ তা খেতে রাজী হলো না। বললো: এ জিনিসটি নিষিদ্ধ।

বেওকুফ। এখন এর প্রয়োজন আছে– এ সময়ের জন্য এটা নিষিদ্ধ নয়। নাও, খেয়ে ফেলো। ব্রান্ডি ও কাঁচা ডিম খেলাম। এতে আমাদের ক্ষুধা খুব বেড়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন দ্য-পোলী কাছেই বসেছিলেন। তাঁকে বললাম: টারবক্সকে খুঁজবার জন্য কাল দু'টি ঘোড়া আমাদেরকে দিতে পারেন?

মুচকি হেসে তিনি মাথা নাড়লেন। বললেন: টারবক্স বেশ ভালোই আছেন। তিনি এখন আরঘেলায় আছেন। কালকে সকালেই তিনি এখানে এসে যাবেন, এমনকি আজ সন্ধ্যায়ও এসে যেতে পারেন। তার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন: ক'দিন ধরে আপনারা খান না?

দশদিন।

দশদিন! অসম্ভব! আর এ পর্যন্ত হেঁটে এসেছেন?

হাঁ। প্রথম বির-মেরদুমায় গেলাম। তারপর মরুভূমিতে মোটর ত্যাগ করেছি– এরপর পথ হারিয়ে মেরদুমায় ফিরে আসি। আবার মেরদুমা ছাড়লাম– আবার পথ হারালাম। সমুদ্রের তীর ধরে চলতে চলতে অবশেষে নুফিলিয়া পৌঁছেছি।

মুহম্মদের দিকে তিনি চাইলেন। তার দেহ অস্থিচর্মসার।

এও এ কষ্ট সহ্য করতে পেরেছে? এ সম্ভব হতে পারে না। আর এ পর্যন্ত কিছুই খাননি?

ঘাস, সজারু ও শামুক খেয়েছি।

সবাই হাসলো। একজন বললো। আপনি কি সেকেন্ড স্কোয়াড্রন সাভারি পরিচালনা করেন?

হাঁ।

সমুদ্রের তীরে তা লেখা দেখে এসেছি।

হাঁ, সে চিহ্নটি খুব পুরনো, এটা ত্রিপোলী সাইরেনিকার সীমা-নির্দেশক। এটা অবশ্য সমুদ্রের ধারেই পোঁতা ছিলো। বোধহয় সেটাকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে।

ক্যাপ্টেন দ্য-পোলী কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন: এখন আপনার ঘুমানো উচিত। আপনার পক্ষে ঘুমের খুবই প্রয়োজন।

আমাদের একটা রুম দেওয়া হলো। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তা'ছাড়া ক্ষুধা এখন অত্যন্ত প্রবল হয়েছে। আমি খাবারের ঘরে গিয়ে দু'টিন এপ্রিকট কিনলাম।

সন্ধ্যার সময় বেশ একটু ভালো বলে মনে হলো। মুহম্মদ আরবী সৈন্যদের নিকট গিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। আমি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ক্যাপ্টেন দ্য-পোলীর অফিসে গেলাম।

তিনি আমায় বসতে বলে এক গাদা টেলিগ্রাম দেখালেন। বললেন: সবকয়টি আপনার হারিয়ে যাওয়া সম্বন্ধে। দেখলেন তো আপনার জন্য যথাসাধ্য করেছি। এ সপ্তাহেও আমরা আপনার সন্ধান কার্য চালাই। আপনাকে পাওয়ার সব আশাই শেষটায় ত্যাগ করতে হলো। কারণ, আমরা ভাবলাম, আপনি নিশ্চয় মরে গেছেন।

মরার সামিল ত বটে। টারবক্সের খবর কি?

চারদিন আগে এখান থেকে এক ঘোড়-সওয়ার দল পাঠানো হয়। আবার সেই দিনই এক উষ্ট্রচালিত দল আরঘেলা থেকে রওয়ানা হয়। তারা টারবক্সের সন্ধান পায়। সে প্রায় মরেই গিয়েছিলো। কাফেলা তাকে আরঘেলা নিয়ে গেছে।

সে কি এখানে আসছে?

হাঁ। আরঘেলার কামান্ডেন্ট দ্য-রনকো দুটি মোটর পাঠাচ্ছেন। তারা আরঘেলা ত্যাগ করেছে। শীঘ্রই তারা এখানে পৌছবে। তারা আপনার সন্ধান করবে। তারা পথে আপনার গাড়ি পেয়ে হয়তো নিয়ে আসবে। বির-মেরদুমা থেকে আর যেতে পারেননি কেন?

টিউব একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখানে কি টিউব কিনতে পাবো?

ঠিক সাইজের আছে কিনা, তা সন্ধান করে দেখতে পারেন। আমাদের ঘোড়-সওয়ার দল কেমন করে টারবক্সকে পেলো তা শুনবেন না?

নিশ্চয়ই।

ঘণ্টি বাজাতেই একটি আরব-সৈনিক হাযির হলো।

ইবরাহীমকে নিয়ে এসো। তিনি বললেন: এই ইবরাহীমই সেই কাফ্রি সৈনিক যে আমাদের নুফিলিয়া নিয়ে এসেছিলো।

ক্যাপ্টেন তাকে বললেন: বির-মেরদুমার সেই আমেরিকানকে কি করে পেলে, তা বলো।

ইবরাহীম ইতস্তত করে বললো: আরবীতে বলতে পারি?

হাঁ, তাই বলো।

বির-মেরদুমায় পৌছে দেখতে পেলাম এক জোড়া বুট বালুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে। ভাবলাম কেউ হয়তো মরে আছে। কিন্তু একজন সৈনিক বুট ধরে টানতেই বালুর গর্ত থেকে আমেরিকানটি বেরিয়ে এলো। ও আল্লাহ! কি অদ্ভুত চেহারা! যেন একটা পাগল (মাহবুল)। তার সমস্ত চেহারা বালিতে ঢাকা। আমাদের দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইলেন যেনো জ্বিন দেখেছেন। আমি তাকে মোটর ও অন্য দু'টি লোক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে, তা' তিনি জানেন না। 'তারা চলে গেছে'–অবশেষে এই বলে মরুভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তিনি বালুতে লুকিয়েছিলেন কেন–তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমার কথা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তিনি এমন এক ভাষায় কথা বললেন যা আমি জীবনে কোনোদিন শুনি নাই।

আমি তার গর্তের দিকে ইশারা করলাম। তখন তিনি বুঝলেন, বললেন: বদ্দু! তিনি ভাবলেন যে আমরা নিশ্চয়ই বেদুইন?। আমি তাকে কিছু খাবার দিলাম।

এক ঘণ্টা পর আরঘেলার কাফেলা এসে পৌঁছলো–হাবাস–ইরিত্রিয়ান সৈন্যদল। অন্য দুটি লোকের সন্ধান করতে হবে বলে তাকে আরঘেলায় পাঠিয়ে দিলাম।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন: আমেরিকানটি যে চিঠিটা তোমায় দিয়েছিলো তা' কি তোমার কাছে আছে?

আইওয়া। হাঁ বলে সে তা আনতে গেলো। অল্পক্ষণ পরই সে এক টুকরা কাগজ আর একটা মোজা নিয়ে ফিরে এলো। মোজাটি আমার, পুরাতন বলে বির-মেরদুমা থেকে বারো মাইল দূরে আমি তা ফেলে দিয়েছিলাম। চিঠিটি সে আমার হাতে দিলো–তা ইংরেজীতে নুফিলিয়ার ঠিকানায় লেখা। তাতে লেখা ছিলো: পাঁচ দিন হয় আমার বন্ধু ও আরব ছেলেটি মরুভূমিতে চলে গেছে। যতো শীঘ্র সম্ভব তাদের সাহায্যের জন্য লোক পাঠান।

এ মোজা তুমি কোথায় পেলে?

না-আম, ইয়া সিদি। আপনাকে আর বালক ভৃত্যকে খুঁজতে গিয়ে তা কুড়িয়ে পেয়েছি। এটা নিয়ে এসেছি এজন্য যে আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন তা প্রমাণ করবার জন্য। কিন্তু সবচিহ্ন সেখানে লুপ্ত হয়ে যায়।

দ্য-পোলীর সঙ্গে আলাপ শেষ করে এইমাত্র যে বেদুইন-কাফেলা এসেছে এবং পরদিনই যাদের সিরটিস পাঠানো হবে তাদের দেখতে গেলাম। তারা কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে ছিলো। শেখ আমাকে তাঁর তাঁবুতে চা খেতে আমন্ত্রণ করলেন। আমি কে এবং উত্তর আফ্রিকার আরবদের জীবন-যাত্রা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যই যে আমি এসেছি তা তাকে বললাম। আমরা আরবীতে কথা বললাম। যখন তিনি জানতে পারলেন যে আমি মুসলিম তখন তাঁর সমস্ত সংকোচ কেটে গেলো। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন: আল্লাহ্ আমাদের সহায়। জীবন আমাদের কাছে খুব আরামপ্রদ নয়। ওরা সবাই যদি নুফিলিয়ার ইটালিয়ানদের মতো হতো তা' হলে ওরা অন্তত আমাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতো। কিন্তু এখানকার ক্যাপ্টেনের মতো খুব কম ইটালিয়ানই আছে। আমাদের দেশে বিদেশীকে যদি আসতেই হয় তাহলে ওর মতো লোকেরই আসা উচিত। আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি, আর উনিও আমাদেরে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেন না। অন্যরা এতে খুবই পটু।

আপনারা কোথায় যাবেন?

সিরটিস। সেখান থেকে তারা যেখানে যাবার আদেশ করবে সেখানেই যেতে হবে। আমরা আর প্রতিরোধ করতে পারিনি। অনাহারে আমরা মৃতপ্রায়।

আপনারা এসেছেন কোথা থেকে?

দেশের অভ্যন্তর থেকে। একমাস আগে আমরা ছিলাম স্বাধীন। ওরা শেষে এমনভাবে আমাদের কূপগুলি কংক্রীট দিয়ে বন্ধ করে দেয়, আমরা যাতে আমাদের ঘোড়া ও উটের জন্য পানি পেতে না পারি। বাধ্য হয়ে সমুদ্রের তীরে চলে যেতে হয় এবং অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই।

আপনারা সিরটিস যাচ্ছেন?

আমার চোখের সামনে সিরটিসের বাইরে অবস্থিত সেই ক্যাম্পের দৃশ্য ভেসে উঠলো। সেখানে বেদুইনরা দারিদ্র্যের মধ্যে ধ্বংস হচ্ছে। শেখ জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কোথায় যাবেন?

সাইরেনিকা।

মাথা নেড়ে উচ্চারণ করলেন: সাইরেনিকা।

বলে মুচকি হাসলেন। পরে বললেন: এখানকার চেয়ে আলো বেশী সেখানে দেখতে পাবেন। ত্রিপোলীতে যাহোক এ সব অত্যাচার কতকটা সহ্য করা যায়। কিন্তু সাইরেনিকার গভর্নর দয়ামায়াহীন দৈত্য বিশেষ। নাম তার জেনারেল গ্রাজিয়ানী। বেদুইনদের সেখানে কুকুরের মতো গুলী করে বা ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

কেন?

তিনি ঘাড় নাড়লেন। বললেন: কেন বলছেন? সেখানে দুপক্ষেই চলছে অস্ত্রের লড়াই। আমাদেরে শান্তিতে বাস করতে দিলেও এর চেয়ে কতকটা ভালো হতো। আপনাকে এসব কথা বলা আমার উচিত নয়। নিজ চক্ষেই আপনি তা দেখতে পাবেন।

আমি তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলাম। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: আসসালামু আলায়কুম। আপনি যে আমাদের দেখতে এসেছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।

একটা ঘৃণার ভাব নিয়ে আমি ফিরে এলাম। আমার ধারণা হলো যে আরব-সৈনিকেরা ক্যাপ্টেন দ্য-পোলী ও তাঁর অফিসারদের বেশ পসন্দ করে। তাদের খুব প্রশংসা করে ওরা। তিনি শুধু একজন সৈনিক নন, তিনি একজন মানুষও বটে। তিনি এদের এবং এদের চিন্তাধারা বুঝাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। আমি দুর্গে ফিরে এসে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করলাম এবং প্রশ্ন তুললাম: এসব বেদুইন কোথায় যাবে?

সিরটিস।

সাইরেনিকায় কি সত্যই যুদ্ধ চলছে?

তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন: হাঁ। তবে তার সঙ্গে ত্রিপোলীর কোন সম্পর্ক নেই। এখানে অনেকটা শান্তি বিরাজিত। ত্রিপোলী আর সাইরেনিকা দুটি আলাদা উপনিবেশ। সেখানে কি হচ্ছে তা আমি সঠিক জানিও না। সেখানে ক'বছর বেশ শান্তি ছিলো। এবার আবার গোলমাল শুরু হয়েছে।

কেন?

সবাই নেটিভদের ভালো করে বুঝতে পারে না।

একথাই আমি শুনেছি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সবেমাত্র বসেছি অমনি দুর্গের ছাদের উপর সাইরেন বেজে উঠলো। ক্যাপ্টেন দ্য-পোলী ছাদে গেলেন। পরমুহূর্তেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য একজন সৈনিক পাঠিয়ে দিলেন। আমি যেয়ে দেখি ক্যাপ্টেন বির-মেরদুমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। তিনি অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন: ওদিকে কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

ভালো করে চেয়ে দেখতে পেলাম একটা ক্ষীণ আলো আমাদের দিকে আসছে। ক্যাপ্টেন বললেন: ঐ আপনার বন্ধু আসছেন।

আলো ক্রমেই নিকটে আসছে। দেখতে পেলাম তিনটি মোটর বালুরাশির সঙ্গে সংগ্রাম করে এগিয়ে আসছে, এ তারই আলো। সার্চলাইটের আলো তাদের পথ নির্দেশ করছে। আধঘণ্টার মধ্যে গাড়িগুলি এসে পৌঁছলো। প্রথম গাড়ির সামনের আসনে টারবক্স উপবিষ্ট। তার পাশে একজন ইটালিয়ান অফিসার।

অফিসারদের মেসের সামনে গাড়ি থামতেই টারবক্স আর অফিসারটি লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামলো। টারবক্সের পরিধানে তখনও আরব-পোশাক। তার দেহ অত্যন্ত শীর্ণ। প্রথমে সে আমাকে দেখতে পায়নি। তার পরই তার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমাকে দেখেই সে বলে উঠলো: মুহম্মদ কোথায়? আমার পেছনে মুহম্মদকে দেখেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললো: আমি নিশ্চিতভাবেই মনে করেছিলাম যে, তুমি মরে গেছো। তোমার কোনো সংবাদই পাওয়া গেলো না। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে এখন আমরা তিনজনই এখানে মিলিত হয়েছি।

অফিসারটি আমার কাছে এসে আমায় করমর্দন করলেন, টারবক্স আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। অফিসার বললেন: আমি টারবক্সের আচরণে প্রীত হয়েছি। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি পৌঁছেছেন। পৌঁছেই আপনার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যের বিষয় যে তার আর প্রয়োজন হবে না।

আমি তাকে আমাদের মরু-ভ্রমণের কথা সবিস্তারে বললাম। টারবক্স বললো: আমার দিনগুলিও খুব সুখে কাটেনি। প্রতিটি দিন আমি পাহাড়ের চূড়ায় বসে মরুভূমির দিকে চেয়ে কাটিয়েছি। গতকালের পূর্বে কেউ সেদিকে আসেনি। আমি উটে চড়ে আরঘেলা যাই।

তার কথা শুনে না হেসে থাকতে পারলাম না। কারণ এর আগে টারবক্স কোনোদিন উটে চড়েনি। জিজ্ঞেস করলাম: কেমন লাগলো?

মাথা নেড়ে সে বললো: মারাত্মক! আরঘেলা পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার যা অবস্থা ছিলো তাতে আমাকে জীবিত না বলে মৃত বলাই চলে। সারাটি দিন আমাকে সামুদ্রিক

রোগে পেয়েছিলো। তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্রে জাহাজ চড়া আর উটে চড়া প্রায় একই রকম। সেই কাফেলায় ছিলো শুধু ইরিত্রিয়ান। কাউকে কোনো কথা বলতে হয়নি। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আবার বললো: যাহোক, ও-সব শেষ হয়েছে এবার।

সবাই ভিতরে গেলাম।

অফিসারটি বললেন: আমরা কি কাল সকালেই রওনা হতে পারি না?

নিশ্চয়। যতোশীঘ্র সম্ভব আমাদের যাওয়া দরকার।

রাস্তা কেমন? ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন।

ভয়ংকর রকম খারাপ।

পাঁচ বছর আগে মাত্র একবার আরঘেলা থেকে এখানে মোটর এসেছিলো– ক্যাপ্টেন বললেন।

সন্দিগ্ধভাবে অফিসারটি বললেন: এখন আমাদের দেখতে হবে আপনার মোটরটি পাওয়া যায় কিনা। আমার মনে হয়, বেদুইনরা তা পুড়িয়ে ফেলে থাকবে।

সে রাতে শান্তিতে ঘুমুতে পারলাম না। মরুভূমিতে রাতি ছিলো আমার কাছে আরামপ্রদ। কতো মধুর স্বপ্ন দেখেছি সেখানে শুয়ে শুয়ে। এখন এখানে পানি ও খাবার পেয়েও রাতটি আমার কাছে নরকসদৃশ মনে হচ্ছে, ভালো ঘুম হচ্ছে না–শুধু দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঘুমুলেই দেখি আমি যেনো সীমাহীন মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।.... ভীষণ সেই মরুভূমি। ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক। বাস্তবে যে ভয় পাইনি তার চেয়ে শতগুণ বেশি ভয় হচ্ছে এখন। ঘুম ভেঙ্গে যায়।.... আবার ঘুম আসে, আবার সেই দুঃস্বপ্ন। এরপর অনেক দিন পর্যন্ত প্রতি রাতেই এই সব দুঃস্বপ্ন আমি দেখেছি।

রাত প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগান প্রস্তুত করে ইরিত্রিয়ান সৈনিকরা মোটরে স্টার্ট দিলো। আমরা দশদিন আগে যেখানে গিয়েছিলাম সেই পথেই তারা চললো। আমার পাশেই বসেছিলো এক বিরাটকায় সার্জেন্ট। সে যে কোন্ জাতির লোক তা ঠিক করা কঠিন। হয়তো তার দেহে কিছু আরব রক্তও আছে। সে বেশ ভালো আরবী বলতে পারে।

বোতল থেকে সিফ্‌টি পান করে সে আমাকে বললো: এই নৃশংস বেদুইনদের মতো আর কাউকে আমি এতো ভয় করি না।

একজন ইরিত্রিয়ান সৈনিক তাকে জিজ্ঞেস করলো: কোনো বেদুইনের সঙ্গে কি আপনার মোকাবিলা হয়েছে কখনো, মুস্তফা?

অনেক, অনেক বেদুইনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারাও এই মুস্তফাকে বেশ চেনে। আমার চোখের দৃষ্টি দেখেই তারা বুঝতে পারে তার অর্থ কি।

কোথায় তাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন?

তুমি কি কালা নাকি? হাজার বার আমি তোমাদের সে কথা বলিনি? তোমাদের মন পড়ে আছে আরঘেলার নষ্টা কস্‌বীদের কাছে–এসব কথা মনে থাকবে কেন?

সবাই হেসে উঠলো। মুস্তফা বলে চললো: ইংরেজরা যখন আমাদের পক্ষে ছিলো, আমি সেই যুদ্ধে সেনৌসীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। সে ছিলো লড়াইয়ের মতো লড়াই। যাকে বলে লড়াই। সে লড়াইয়ের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। একদিন আমি মরুভূমিতে একা অনেকটা এগিয়ে গেছি এমন সময় দেখতে পেলাম (আল্লাহর কসম–সত্যি বলছি) দূরে একদল বেদুইন সৈনিক। তারা তাদের রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে আসছে। অন্য কেউ হলে ভয়ে মুর্ছা যেতো। কিন্তু স্থির ছিলো কে?–এই মুস্তফা। আমিও আমার রাইফেল কাঁধে তুললাম। সেখানেই সেই অবস্থায়ই তাক করে তাদের দলপতিকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিলাম। আবার আমি তাক করেছি এমন সময় একটা বুলেট–

"বেদুইন, বেদুইন!" সামনের গাড়ি থেকে চিৎকার করে উঠলো। মুস্তফা শেষটুকু ভুলে গেলো। মরার মতো হলো তার চেহারার অবস্থা। তার মোটা দেহ কাঁপতে লাগলো। অফিসার তাঁর দূরবীন দিয়ে ভালো করে দেখে জানতে পারলেন যে, ওটা বেদুইনের দল নয়–একদল হরিণ।

সেদিন মুস্তফার আর গল্প বলা হলো না।

মেরদুমায় যখন পৌঁছলাম সূর্য তখন ডুবে গেছে।

তাঁবু ফেলা হলো। পাহাড়ের উপর মেশিনগান বসানো হলো। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে মরুভূমিতে আমার মোটরের সন্ধান করতে হবে।

সকাল বেলা কুয়াশা ঢাকা ছিলো। বাইরে আগুন জ্বলছে। গাড়ির সন্ধানে আমরা খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। আগের সেই চিহ্ন ধরে চলেছি। আমি অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করলাম: এ রাস্তা কোথায় গেছে?

এটা আট বছরের পুরনো। লিবিয়া মরুভূমির একটা অধুনা পরিত্যক্ত মরূদ্যানে গেছে।

মেরদুমা থেকে তা কত দূর?

প্রায় তিনশ' মাইল।

আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা ফিরে এসেছিলাম। এর অর্ধেক পথ যাবার মতো পেট্রোলও আমাদের ছিলো না।

আমরা এতো দূর এসেছি যে, এখন আমাদের গাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। অফিসারটি বললেন: বেদুইনরা পেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

টারবক্সই তা প্রথম দেখতে পেলো। গাড়িটা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়নি। যেভাবে ছেড়ে গিয়েছিলাম তেমনি আছে। শুধু বালু ভর্তি হয়ে আছে।

তখন মাত্র দশটা বেজেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই টায়ার ঠিক করে ফেললাম। মুহম্মদ আর আমি আমার গাড়িতে বসলাম। আবার চললাম বির-মেরদুমার দিকে। একটায় সেখানে পৌঁছেই আরঘেলা রওনা হয়ে পড়লাম। রাত দশটায় আরঘেলা পৌঁছলাম। নুফিলিয়ার মতো এও একটা দুর্গ। এর কমান্ডেন্ট কর্নেল রন্‌কো। নুফিলিয়া

থেকে আরঘেলা পর্যন্ত লিবিয়া মরুভূমির এই স্থানটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক। এগারো দিন সেখানে ঘুরে ফিরেও কোনো বেদুইনের দেখা পাই নাই।

আরঘেলায় এসে ত্রিপোলী আর সাইরেনিকার পার্থক্য বুঝতে পারলাম। এখানে একটিও আরব-সৈন্য নেই। ইটালিয়ান উপনিবেশ ইরিত্রিয়া থেকে সমস্ত সৈন্য আমদানী করা হয়েছে।

কর্নেল দ্য-রনকোকে জিজ্ঞেস করলাম: আরব-সৈন্য রাখেন না কেন?

এদের বিশ্বাস করা যায় না, শত্রুদের সঙ্গে এরা বন্ধুত্ব করে বসে।

ইরিত্রিয়ানরা কি খুব ভালো যোদ্ধা?

এরা বিশ্বাসযোগ্য। এরা আরবদেরে ঘৃণা করে, কারণ তারা মুসলমান আর এরা খ্রিস্টান। সাইরেনিকার আরবরা ভালো যোদ্ধা নয়। তাই ইরিত্রিয়া থেকে সাহসী সৈন্য আনতে হয়েছে।

এখানকার আরবরা তা'হলে সৈনিক হতে চায় না?

না। ত্রিপোলীর মতো এখানে নয়। ইরিত্রিয়ান আর বেদুইনদের মধ্যে ভীষণ হিংসা। কয়েক বছর আগে কয়েকজন ইরিত্রিয়ান তিনটি আরবকে ধরে পুড়িয়ে ফেলে।

পুড়িয়ে ফেলে?

হাঁ। একটা ভীষণ অগ্নিকুণ্ড করে তাতেই তাদের নিক্ষেপ করে।

তাদের কি সেজন্য শাস্তি দেওয়া হয়নি?

না। এরা আমাদের সবচেয়ে ভালো ও সাহসী সৈনিক। বেদুইনদের সম্বল মাত্র তাদের মরুভূমি। তারা কম ইরিত্রিয়ানকে নির্মমভাবে হত্যা করেনি। যুদ্ধের সময় দয়া-মায়া থাকা উচিত নয়।

সাইরেনিকা সম্বন্ধে এই-ই আমার প্রথম ধারণা।

টারবক্সের অসুখ খুবই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তার উপর বির-মেরদুমার দুর্ভোগ। আমাদের সঙ্গে চলা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। বেনগাজী পৌঁছেই আমরা তাকে সেখানে রেখে যাওয়া স্থির করলাম।

আমরা মাত্র একদিন আরঘেলায় ছিলাম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আজেদাবিয়া দুর্গের দিকে রওনা হলাম; আরঘেলা ও আজেদাবিয়ার মাঝখানের স্থানটি, যে স্থানটি আমরা পার হয়ে এসেছি ঠিক প্রায় তদ্রূপ। তফাৎ মাত্র এই যে পথ হারানোর ভয় নেই, কারণ এই দুটি দুর্গের মাঝখানে গাড়ীর চাকার পথ রয়েছে।

২৯শে মার্চ খুব ভোরে আমরা রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। দুর্গের প্রায় সমস্ত অফিসার তখনো ঘুমিয়ে আছেন, শুধু কর্নেল দ্য-রনকো আমায় বিদায় অভিনন্দন জানাতে জেগেছেন।

গাড়ী ছাড়ামাত্র একটি আরব ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে বললো: মেহেরবানী করে আপনাদের গাড়িতে করে আমায় নেবেন?

আমি গাড়িতে স্থান আছে কিনা দেখলাম। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রে গাড়ি ভর্তি হয়ে আছে। মুহম্মদকে জড়ো-সড়ো হয়ে গাড়ির পিছনে বসতে হয়েছে। বললাম: দেখতেই পাচ্ছ গাড়িতে স্থান নেই।

মিঃ টারবক্সের পাশে সামনের সিটে বসতে পারে। মুহম্মদ বললো।

আমি বললাম: তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি যেতে পারবো না। গাড়ির চাকা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। আমার এই আপত্তি যুক্তিসংগত ছিলো। অতিরিক্ত টায়ারটি ব্যবহারের উপযোগী নয় বলে ফেলে দিলাম। আরঘেলায় নতুন একটিও পাইনি। সামনের বাঁ দিকের চাকাটিও নষ্ট-প্রায়। ছেঁড়া জায়গায় চামড়া দিয়ে মজবুত করে বেঁধে নিলাম।

গাড়ির কোনো কিছু খারাপ হলে আমি সাহায্য করতে পারি– আরবটি বললো। তাকে গাড়িতে উঠতে বলে রওনা হলাম। সেদিন সন্ধ্যায়ই সেখানে পৌঁছবার কথা।

পথ বেশ চওড়া ও সমতল এবং ঝোপঝাড়ে ভর্তি। জমাট লবণের একটা হ্রদের উপর দিয়ে চলতে হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা চলার পর পথের ভালো ষাট মাইল অতিক্রম করেছি এমন সময় আরবটি জিজ্ঞেস করলো: আমাদের সঙ্গে প্রচুর পানি আছে কিনা। আমি বললাম যে, পাঁচ গ্যালনের অধিক পানি আছে।

সেখানে পানি পাওয়া অসম্ভব। সমস্ত কূপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কেন?

কোনো বেদুইনকেই এ অঞ্চলে আসতে দেওয়া হয় না। এখানকার প্রত্যেকটি বেদুইনই ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।

নুফিলিয়া থেকে আরঘেলা আসার পথে আমরা একটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত গ্রাম দেখেছি। তার লোকগুলি গেলো কোথায়?

একমাত্র আল্লাহই তা জানেন। হয়তো সিরটিস। আর আত্মসমর্পণ না করে থাকলে হয়তো তাদের হত্যা করা হয়েছে।

সমুদ্রতীরে মৃত লোকটির কথা মুহম্মদ বললো। আরবটি মন দিয়ে তা শুনলো।

হয়তো তা কোনো বুজুর্গ লোকের হতে পারে। তিনি মৃতদের পরিত্যাগ করতে চাননি। কূপ বন্ধ করে দেওয়াতেই হয়তো তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আর তুমি নিজেই বা আজেদাবিয়া যাচ্ছো কেন?

আরঘেলা আর আজেদাবিয়াতে আমার দোকান আছে। চারদিনের আগে যাত্রীবাহী মোটর ছাড়বে না, এরই জন্য আমি আপনাদের সঙ্গে এসেছি। আপনি কি ইংরেজ?

আমরা কোথাকার লোক তা বললাম। গাড়ি থামিয়ে কোথাও কিছু হয়েছে কিনা দেখবার জন্য সামনের চাকায় দৃষ্টি দিলাম। তা দেখে খুব ভরসা হলো না। যে কোনো মুহূর্তেই তা ফেটে যেতে পারে। ব্যবসায়ী নামায পড়তে গেলো, আমিও তার সঙ্গে গেলাম। নামায শেষ হলো, সে আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে চাইলো। বললো: আপনি যে মুসলিম তা তো জানতাম না। আপনাকে খ্রিস্টানের মতো দেখা যায়।

হাঁ, আমি আপনার মতোই ইসলামের সত্য বিশ্বাসী।

আপনি কি আগে খ্রিস্টান ছিলেন?

হাঁ, আমার দেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। বহু লোকের কোনো ধর্মই নেই।

তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে?

হাঁ, আল্লাহ আছেন বলে তারা স্বীকার করে না।

আপনি কি করে ইসলাম গ্রহণ করলেন?

আরবী শিখতে গিয়ে ইসলামকে জানতে পেলাম। পরে আরো অধিক পড়তে গিয়ে আমার বিশ্বাস জন্মালো।

আপনার এতে বিশ্বাস জন্মালো কেন?

কারণ ইসলামই একমাত্র সরল পথ। এ-পথ অনুসরণ করলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় অতি সহজে।

আপনি যা বললেন তা খুবই সত্যি। আমি নিজে একজন সেনৌসী। আমাদের সম্প্রদায় সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

এখানে এই সাইরেনিকায় আপনি আমাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন। সিদি আহমদ ইদরিসের শিষ্য। সিদি আহমদ সেনৌসী কর্তৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত।

মেকনেসের সিদি আহমদ ইদরিস?

হ্যাঁ। আমরা ঈসা পয়গম্বরের অনেক কথা মানি। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো: এত জ্ঞান আপনি কোথা থেকে লাভ করলেন? তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন: আল্লাহ আমায় এই জ্ঞান দান করেছেন। তা ছাড়া নির্বোধের বোকামীও আমি দেখেছি। তাই তাদের সংসর্গ আমি পরিহার করে চলি। অন্যের যা কিছু খারাপ আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি তা থেকে দূরে থাকি। সেনৌসীর শিক্ষাও তাই। সুচারু কলা বা কাব্য দ্বারা আপনি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন না। বরং তা দ্বারা আপনার আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে তাকে পবিত্র করতে পারেন। পবিত্র হৃদয় যার, সে-ই আল্লাহকে দেখতে পায়।

সূফীরাও এ কথাই বলে থাকে।

সিদি আহমদ সেনৌসীও একজন সূফী ছিলেন।

এখানে কি তাঁর শিষ্য সংখ্যা অনেক?

হ্যাঁ, সাইরেনিকার প্রত্যেকটি লোকই সেনৌসীকে তার গুরু বলে মনে করে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত শিষ্যের সংখ্যা খুব বেশী নয়। এখানে তাঁর মতবাদ অনুসরণ করা মুশকিল। ইটালিয়ানরা সেনৌসী-পন্থীদের সকলকেই শাস্তি দেয়। নিজ চক্ষেই তা দেখতে পাবেন।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মোটর ছাড়লাম। দুটোর সময় সামনের চাকার টায়ার ফেটে গেলো। মেরামত করা কঠিন। যতো শীঘ্র সম্ভব আমাদের আজেদাবিয়া পৌঁছতে

হবে। টায়ারের ভিতর ঘাস ভর্তি করলাম। তাতে করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে সমর্থ হলাম। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ও আমরা আজেদাবিয়া থেকে আট মাইল দূরে। সেখানেই তাঁবু গাড়তে হলো। এমন সময় মুহম্মদ তিনটি লোককে উটে চড়ে আমাদের দিকে আসতে দেখতে পেলো। তাদের দেখে বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে হলো না। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় আমরা ওদের ভালো করে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাদের লম্বা রাইফেল দেখে বুঝতে পারলাম যে ওরা বেদুইন।... নিকটে এসে তারা উট থেকে নেমে নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলতে লাগলো।

সেই আরব সওদাগরটি বেরিয়ে এসে ওদের বললো: এরা বেদুইন নিশ্চয়। আমি যেয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলি। বলে সে নিরস্ত্রভাবে হাত উঁচু করে বেদুইনদের কাছে গেলো। তারাও তাকে তাদের কাছে যেতে দিলো। তাদের ভিতর বেশ আলাপ জমে উঠলো।

টারবক্স বললো: আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের সঙ্গে আরব রয়েছে। তা না হলে আমাদের ভীষণ বিপদে পড়তে হতো।

কিছুক্ষণ বেদুইনদের সঙ্গে আলাপ করে আরবটি ফিরে এসে আমাকে তার সঙ্গে বেদুইনদের কাছে নিয়ে যেতে বললো: তাদের দলপতি কালো দাড়িওয়ালা লম্বাকৃতি লোক। তিনি আমায় আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সওদাগরকে দেখিয়ে বললেন: ইনি বলছেন যে আপনি মুসলিম। তা কি সত্য?

হ্যাঁ।

বেশ ভালো। অন্যটি?

তিনি খ্রিস্টান।

ইটালিয়ান নয় তো?

না।

উনি যে আমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন তা তিনি বলবেন না, সে দায়িত্ব কি আপনি নিতে পারেন?

নিশ্চয়, তা আমি পারি।

সওদাগর আমার দিকে ফিরে বললেন: আজেদাবিয়া গিয়ে এ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কেন নীরব থাকতে হবে তার কারণ বুঝতে পারলেন তো? একথা জানতে পারলে ইটালিয়ানরা এরোপ্লেনে এসে এই বেদুইনদের তাড়া করবে।

আমি মাথা নাড়লাম। পরে সরদারের দিকে চেয়ে বললাম, আশা করি আপনারা আজ আমার সঙ্গে আহার করবেন। খাবার তৈরীই আছে।

উটগুলির সামনের পা শক্ত করে বেঁধে বেদুইনরা আমাদের তাঁবুতে এলো। তারা তাদের রাইফেল উটের পিঠে রেখে এলো। আমি মুহম্মদকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললাম আমাদের খাবার পরিবেশন করতে। সানন্দে সে তাতে রাযী হলো।

বললো: তা আমি খুব ভালোভাবেই করতে পারবো, ওদের খাবার রীতি আমার বেশ জানা আছে।

তাঁবুর আলো জ্বালানো হলো। আমরা সবাই গোল হয়ে বসলাম। এবার আমি আমার মেহমানদের খুব ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। সরদারটি খাঁটি আরব–বয়স বড় জোর ত্রিশ বছর। অন্য দু'জনের গায়ে কাফ্রি রক্ত বিদ্যমান। সরদার জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

আমি মরক্কো থেকে রওনা হয়ে আফ্রিকার ভিতর দিয়ে যে মোটরে করে এসেছি তা বললাম। স্বাধীনতার জন্য আবদুল করীমের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের সংবাদ এখানেও পৌঁছেছে বলে মনে হলো, কারণ তিনি চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন: মারাকেস, সেই যেখানে আবদুল করীম লড়াই করছেন? তাঁর সংবাদ কি?

আমি তাকে আবদুল করীমের পরাজয় ও রি-ইউনিয়ান দ্বীপে তাঁর নির্বাসনের কথা বললাম।

আল্লাহই একমাত্র বিচারকর্তা। তিনি বললেন। সর্বত্র একই অবস্থা। ইসলাম আজ ধ্বংসের পথে।

আমি বললাম: না, ঠিক তা নয়। এই বিপদের মধ্যেই ইসলাম জয়ী হবে। সর্বত্রই তা পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে–ভারতে, চীনে, এমনকি ইউরোপেও।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন: এখানে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। আমাদের গ্রামগুলি বোমা ফেলে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে–আমাদের নারীদের বন্দী করে নিচ্ছে। ইটালিয়ানদের এই সব শয়তানীর সঙ্গে আমরা কিছুতেই পেরে উঠছি না।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমি তাকে সিগারেট দিতে গেলাম। হাতের ইংগিতে তা তিনি গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেন। পরে বলে যেতে লাগলেন: আপনি আজেদাবিয়া যাচ্ছেন, সেখানে আমাদের সঙ্গে এক যুদ্ধে যারা বন্দী হয়েছে তাদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

কুফ্‌রা থেকে।

তা কোথায়?

তাজ্জব হয়ে তিনি আমার দিকে চাইলেন। বললেন: কুফ্‌রা চিনেন না? লিবিয়া মরুভূমির ইহা বড় মরূদ্যান। সৌভাগ্যের বিষয় যে আজো তা স্বাধীন।

ইটালিয়ানদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য আমরা সবাই অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে আছি। যে কোনো সময়ে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের এই ক্ষুদ্র দলটি আজ পর্যন্তও যেসব মরূদ্যান স্বাধীন রয়েছে সেগুলি পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছি। অনেকেই ফিরে এসেছে, কেউ কেউ নিহত হয়েছে আর যে দু'জনের কথা

একটু আগেই বলেছি, তারা দু'একদিনের মধ্যেই আজেদাবিয়ার ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলবে। আমরা যতোদূর সম্ভব শীঘ্র ফিরে যাচ্ছি।

মুহম্মদ সেখানে এলো। তাকে দেখেই তিনি বললেন: এ তো বেদুইন! ও কোথা থেকে এসেছে?

আমি তাকে মুহম্মদের সমস্ত ইতিবৃত্ত বললাম। শুনে সরদার তাকে প্রশ্ন করলেন: তোমার বাবা কে?

হামিদ-বিন্ আবদুল আজিজ।

এল্-মরুকের সেই হামিদ-বিন্ আবদুল আজিজ?

মুহম্মদ মাথা নাড়লো।

তোমার বাবা ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম–তুমিও তাঁর মতো হতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ তোমার সহায় হবেন।

তার মুখে গর্বের হাসি ফুটে উঠলো।

তুমি কোথায় যাবে?

বেন্‌গাজীতে। সেখানে আমার চাচা আছেন, তার সঙ্গে বাস করতে যাচ্ছি।

খাওয়ার পর সবাই শুতে চললাম। তিনজন বেদুইন তাঁবুর ভিতর শুতে কিছুতেই রাযী হলো না। কম্বল মুড়ি দিয়ে তারা উটে চড়লো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সন্ধ্যার কাছাকাছি আমরা কোনো রকমে আজেদাবিয়া পৌঁছলাম।

সেখানে আমাদের তাঁবু গাড়বার প্রয়োজন হয় নাই। সওদাগরের আমন্ত্রণে আমরা তার বাড়ীতে ক'দিন রইলাম।

আজেদাবিয়ার শহরটি খুব ছোট। চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমাদের পৌঁছবার পরদিন সারা শহরটি চঞ্চল হয়ে উঠে। যে দুটি বেদুইনের কথা আরব সরদার আমাদের বলেছিলেন তাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে, এবার ফাঁসি হবে।

পরদিন বাজারে তাদের ফাঁসি হয়ে গেলো। আরবদের মেরে আতংক ও ত্রাসের সৃষ্টি করবার জন্যই বাজারে প্রকাশ্য স্থানে ওদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেই ইরিত্রিয়ান সৈনিকদের একটা ছোট দল সেই স্থানটি ঘিরে দাঁড়ায়। তারা তাদের সংগীন বাগিয়ে ধরেছে–যেনো কেউ কাছে আসতে না পারে। অবশ্য তখন কেউ সেদিকে আসেনি। কারণ আরবরা তাদের দরজা বন্ধ করে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করছে।

বন্দী বেদুইন দুটিকে আনা হলো। দু'জনই এক সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ।

তাদের চোখে-মুখে গর্বের চিহ্ন–মৃত্যুর বিভীষিকার কোনো চিহ্নও তাদের চেহারায় নেই। ফাঁসি-মঞ্চে তাদের আনা হলো। একজন অফিসার একখণ্ড কাগজ বের করে

পাঠ করলেন: আইন-সিদ্ধ সরকারের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় বিদ্রোহ করায় এবং যুদ্ধরত অবস্থায় অস্ত্রসহ বন্দী হওয়ার দরুন তোমাদের প্রতি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মারার আদেশ হয়েছে।

পড়া শেষ হলে বাজনা বেজে উঠলো। বেদুইন দুটি শান্তভাবে করমর্দন করে ফাঁসি মঞ্চে আরোহণ করলো।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেলো। এদের এভাবে দেখে একটি ইটালিয়ান সৈনিক বলে উঠলো: মরতে যাচ্ছে,–এজন্যও হতভাগাদের মনে একটুও ভয়ের ভাব আসেনি।

পরদিন সকালে আমরা আমাদের যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা এবার বেশ ভালো। আজেদাবিয়া ছেড়ে ছ'ঘণ্টা পরই আমরা সাইরেনিকার রাজধানী বেনগাজী পৌঁছলাম। সিরিয়া মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ শেষ হলো।

বেনগাজী আর ত্রিপোলী প্রায় একই ধরনের। দুটি স্থানেই আধুনিক ধরনের বড় বড় উদ্যান। ইটালিয়ানরা দুটি স্থানকেই অদ্ভুত রকমে আধুনিক করে গড়ে তুলেছে। উভয় শহরেই মেদীনা বা আরবদের আবাসস্থল থেকে ইউরোপীয়দের আবাসস্থল পৃথক করে রাখা হয়েছে। উভয় শহরের প্রাচীরগাত্রে মুসোলিনীর মস্তক অঙ্কিত। উভয় শহরেই ইউরোপীয় ধরনের হোটেল আছে। আরাম, রুচি বা পারিপাট্য ইউরোপীয় হোটেলের চেয়েও অনেক উন্নত।

বেনগাজীর সভ্যতা ইটালিয়ানদের সৃষ্টি। প্রতিদিন বিকাল চারটায় এলবারগো ইটালিয়ান পামকুঞ্জে অরকেস্ট্রার বাজনা বেজে ওঠে, রেস্তোরায় সুসজ্জিত টেবিলে আধুনিক মার্জিত পোশাক ও ফ্যাসিস্ট ব্যাজ পরিহিত ইটালিয়ানরা ভিড় জমায়। এখানকার রেস্তোরায় যারা আসে তারা অধিকাংশই অফিসার। বেনগাজীর সর্বত্রই অফিসারদের ভিড়। ইরিত্রিয়ান পরিচালকরা ব্যস্তভাবে তাদের পরিচর্যায় রত।

ঠিক চারটায় টারবক্স, মুহম্মদ ও আমি এলবারগো ইটালিয়া পৌঁছলাম। মোটরের অবস্থা শোচনীয়।

আমাদের পরিধানে তখনো আরব পোশাক। আমাদের পোশাক ও শরীরের অবস্থা দেখে ইটালিয়ানরা উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলো। আমরা বহু কষ্টে এলবারগো ঢুকলাম। সাইরেনিকার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পুনরায় যাত্রা করবার আগে আমাকে খুব ভালো করে গোসল করে নিতে হবে।

টারবক্স আর যেতে চাইল না। তার শরীর ও পেট ঠিক করবার জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব তাকে ইউরোপ যেতে হবে। বেনগাজীতে এলে ঠিক হলো যে এবার আমাকে একাই যেতে হবে। মুহম্মদ বেনগাজীতে তার চাচার কাছে থেকে যাবে, কি আমার সঙ্গে মিসর যাবে তা তখনো ঠিক করতে পারেনি।

গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে গোসল সেরে, পোশাক পরিবর্তন করে রেস্তোরায় বসে আরাম করছি, ঠিক সেই সময় সিনর বোমবারডি সেখানে হাযির হলেন। সিনর বোমবারডি ভিনিসের অধিবাসী। স্বভাবতই তিনি অন্যান্য ইটালিয়ানদের মতো সামরিক ফ্যাসিস্ট-পন্থা অনুসরণ করেন না। তাই বলে তিনি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী নন। বুদ্ধিমানের মতো তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করেন না। তাঁর হৃদয় শিশুর হৃদয়ের মত সরল ও কোমল। আরবদের যখনই ফাঁসি দেওয়া হয়, যা সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা–এবং স্বদেশপ্রেমিক ইটালিয়ানরা বিশ্বাসঘাতকদের শেষ দুরবস্থার ফটো গ্রহণের জন্য ক্যামেরা হাতে বধ্যভূমিতে ভিড় করে, তখন বোমবারডি দরজা বন্ধ করে নিজ গৃহে চুপ করে বসে থাকেন। তিনি এ সবের কিছুই বুঝতে পারেন না। বেনগাজীর ইটালিয়ানদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যতিক্রম। রোমানদের সম্পূর্ণ বিপরীত–ও তাদের কাছে সম্পূর্ণ অনুচিত ও হাস্যকর ধারণা ছিলো তার আরবদের প্রতি। আরবরাও যে মানুষ–মানুষের মতো অনুভূতি যে তাদেরও আছে, তা তিনি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন। তাই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলার দৃশ্য তিনি দেখতে পারেন না।

একদিন এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিলো। তিনি আমায় বললেন: আমি ভিনিসের অধিবাসী। যুদ্ধের সময় অস্ট্রেলিয়ানরা আমাদের শহরটি প্রায় দখল করে নিয়েছিলো। মনে করুন, তারা যদি শহরটি দখল করে নিয়ে তাদের বিরোধী প্রত্যেকটি লোককে ফাঁসিতে ঝুলাতো তা হলে কেমন হতো?

এই বলে তিনি আমায় তাঁর কার্ড দিলেন। তাতে লেখা 'এনাকিকো বোমবারডি শিভরলের প্রতিনিধি–বেনগাজী'।

তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি তাকে বললাম: আমরা মোটরে করে লিবিয়া মরুভূমি অতিক্রম করে এসেছি।

শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন: শিভরলে গাড়ির প্রচারের জন্য এ যে এক সুবর্ণ সুযোগ। আপনার গাড়িখানি কি মেরামত করে দিতে পারি? খুব সস্তায় আমি তা করে দেবো। আমার চালক কি আপনার গাড়ি গ্যারেজে নিয়ে যাবে? আমি অনুমতি দিলাম। সোফার গাড়ি নিয়ে গ্যারেজে গেলো। আমি তাকে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতে লাগলাম। তিনি বললেন: কিন্তু এ পথ যে অতিক্রম করা অসম্ভব। পূর্বে আর কেউ এ পথে আসে নাই। আমি আপনাকে বেনগাজীর সংবাদপত্র 'সাইরেনিকার' সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। তিনি সানন্দে আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁর কাগজে প্রকাশ করবেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আকস্মিকভাবে সম্পাদক সেখানে এসে হাযির। পুনরায় আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতে হলো।

মুহম্মদ তার চাচার কাছে গেলো। টারবক্স আর আমি খুব করে ঘুমিয়ে নিলাম।

পরদিন সকালে আমাদের নাম সবার মুখে মুখে। সাইরেনিকা পত্রিকা আমাদের ভ্রমণ–বৃত্তান্ত বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করেছে। বারো বছরের মুহম্মদ রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলো। সে একটা বড় সিগার টানতে টানতে সকাল বেলা হোটেলে এসে হাযির। বললো: আমি আর যাবো না। দু'শ লিরা বেতনে আমি এখানে একটা চাকরি পেয়েছি। এখানেই আমি আমার চাচার কাছে থাকবো।

আমার বলবার কিছুই ছিল না। মুহম্মদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আর কোনোদিন তার সাক্ষাৎ পাইনি। এক ঘণ্টা পর হোটেলের ম্যানেজার সিনর মেলভিসিনি আমার কক্ষে এসে বললেন যে, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। হলেই তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে ইটালিয়ান ভাষায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কাল রাত্রে কি আপনিই এখানে এসেছেন?

হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে এখনই পুলিশের বড় কর্তার কাছে যেতে হবে।

তার সঙ্গে থানায় গেলাম। আমাকে অপেক্ষা করতে বলা হলো। নানা রকমের লোকের ভিড় এখানে।

বোরখা পরিহিতা মেয়েরা সন্তান কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সঙ্গে করে খাবার নিয়ে এসেছে। বুঝা গেলো অনেকক্ষণ তাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আরো অনেক লোক সেখানে আছে। কেউ বা বসে বসে ঘুমুচ্ছে। আধঘণ্টা অপেক্ষার পর আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম: আর কতক্ষণ আমায় অপেক্ষা করতে হবে? জানতে পারলাম যে, আমার পালা আসতে অনেক দেরী। বড় কর্তা সদর অফিসে গেছেন। শীঘ্রই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন।

বারোটা বাজলো। জিজ্ঞেস করলাম, খাবার জন্য যেতে পারি কিনা। উত্তরে জানলাম, নিশ্চয়ই নয়। আমার খাবার সঙ্গে করে আনা উচিত ছিলো। যে ডিটেকটিভটি আমায় নিয়ে এসেছে তার ধারণা আমি একজন সাংঘাতিক অপরাধী। কারণ আমি ইটালিয়ান ভাষা বলতে পারি না। সকলেরই নাকি তা জানা উচিত।

প্রায় দুটোর সময় বড় কর্তা ফিরে এলেন। সঙ্গে তাঁর সহকারী। সে-ই আমার ফরাসী ভাষার বক্তব্য ইটালিয়ান ভাষায় তার কর্তাকে অনুবাদ করে শোনায়। বড় কর্তা ইটালিয়ান ভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষাই জানেন না। পরে বুঝতে পারলাম যে, সহকারীটি ফরাসী ভাষাও জানে না। খুব মুশকিলে পড়তে হলো। সহকারী আমায় জিজ্ঞেস করলো: আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ত্রিপোলী থেকে।

কিন্তু আপনার যে সেজন্য অনুমতিপত্র নেই।

এখানেই সে ইটালীয় ফরাসী ভাষায় এমন এক গোল বাঁধিয়ে বসলো যে আমি কিছুই বুঝতে না পেরে তাকে পরিষ্কার করে বলতে বললাম। তাতে সে ক্রোধে টেবিল চাপড়িয়ে বললো: ইটালিয়ান ভাষা না শিখে এখানে আসাই আপনার অপরাধ। আমি বলছি আপনার অনুমতিপত্র নেই।

পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে দেখালাম। সে তা পড়ে বড় কর্তার হাতে দিলো। নাকে চশমা এনে তিনি তা পড়লেন। ঘাড় নেড়ে তা টেবিলের উপর রেখে বললেন: বেনগাজী পৌঁছেই আপনি আমায় খবর দেননি কেন?

তা তো আমার জানা ছিলো না?

আপনাকে যেতে মানা করছি।

অনুমতি ছাড়া যাবার ইচ্ছাও নেই।

আমরা আপনার উপর নযর রাখছি। আপনি আরবী বলেন কেন?

কারণ, আরবী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আমার অনুরাগ আছে।

সংস্কৃতি! আরবদের কোনো সংস্কৃতিই নেই, আমাদের গড়া এই বেনগাজীতে ঘুরে দেখে যান। দেশের অভ্যন্তরে ঘুরবার কোনো প্রয়োজন হবে না।

আমি মিসর যাবার অনুমতি পেতে চাই।

তা পেতে খুব বেগ পেতে হবে।

সেখানে কি কোনো গোলমাল আছে?

সহকারী হাসলো।

না, সব শান্ত। কিন্তু সেখানে যাবার কোনো রাস্তা নেই। আমরা সে দায়িত্ব নিতে পারবো না।

গভর্নমেন্টের কাছে প্রার্থনা করবো। সহকারী আবার হাসলো। বললো: কিন্তু কাগজপত্র এখানেই তৈরী হয়। তা'হলে বেশ বুঝতে পেরেছেন আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না।

সাইরেনিকা হয়ে যাওয়া যে খুবই মুশকিল তা বুঝতে পারলাম।

হোটেলে ফিরে সিনর মেলভিসিনিকে জিজ্ঞেস করলাম যে, গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে কিনা? ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন: খুব সম্ভব তা পারেন। কিন্তু জেনারেল গ্রাজিয়ানীর সঙ্গে কথা বলা বড় মুশকিল–তাঁর প্রত্যেকটি চালচলন খাঁটি সৈনিকের আর তাঁর ব্যবহারও বড় রুক্ষ।

জেনারেল গ্রাজিয়ানী এখানে কতোদিন ধরে আছেন?

একমাস মাত্র। পূর্ববর্তী গভর্নর ভালো কাজ করতে পারছেন না বলে রোমে অভিযোগ ওঠে–তারই ফলে জেনারেল গ্রাজিয়ানীকে এখানকার গভর্নর করা হয়। কেজান ও মুরুকের বিরুদ্ধে তিনিই অভিযান চালান। বড় কঠোর–আগাগোড়া তিনি পাক্কা সৈনিক।

এ কথা শুনে বেশী ভরসা পেলাম না। জুতো পরিষ্কার করতে গিয়ে এক মুচির সঙ্গে আলাপ। সে বললো: আপনি কি মোটরে করে যাবেন? যাবেন না।

কেন যাবো না?

সারা দেশে বিদ্রোহ চলছে। সে পথে যেই যায় আল-মাহাফদিয়ান তাকেই গুলী করে মেরে ফেলে—এমনকি আরবদেরও।

আল-মাহাফদিয়া কি?

সাবধানে সে এদিকে সেদিকে চাইলো। পরে বললো: শেখ আহমদ মোখতারের অধীনে বিদ্রোহী দল। তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার। পার্বত্য দেশ সম্পূর্ণ তাদের অধীন।

তাদের কি তুমি দেখেছো?

না। আল্লাহ আমায় রক্ষা করুন।—তাহলে আজ আমায় এখানে জীবিত দেখতে পেতেন না।

তারা কি বেনগাজীর নিকটে আছে?

হ্যাঁ, খুব নিকটে মেগ বা বাসের নিকট তারা আছে। এখান থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে। ইদানিং তারা ভয়ংকর রকম হিংস্র হয়ে উঠেছে।

কেন?

তাদের যে কেউ ইটালিয়ানদের কাছে ধরা পড়ে তাকেই তারা ফাঁসি দেয় বা গুলী করে হত্যা করে। তারা যদি কোনো আরবকেও এদের সংস্পর্শে আছে বলে সন্দেহ করে তাহলে তাকেও হত্যা করে। এদের সম্বন্ধে শীঘ্রই আপনি আরো অনেক কিছুই জানতে পারবেন। বিকেলে টারবক্সের সঙ্গে দেখা। সে বললো যে, ইংরেজী বই কিনতে সে এক ইহুদীর দোকানে যায়। তাকে দেখে ইহুদী জিজ্ঞেস করলো: শুনলাম আপনি নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

এ প্রশ্ন হাজার বার শুনেছি।

সেজন্য বলছি না। ইহুদী বললো: আমি নিজেও ইসলাম সম্বন্ধে উৎসুক। আমার এক আরব বন্ধু আছেন। তিনি এখানকার একজন শিক্ষক। একজন মস্তবড় দার্শনিকও। ইসলামী দর্শনে তিনি মস্তবড় আলিম। তাঁর সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করুন।

আমার ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি কি প্রায়ই এখানে আসেন?

তিনি কালই এখানে আসবেন। কাল শুক্রবার, তিনি মসজিদে যাবেন। প্রতিদিন সকালে তিনি এখানে আসেন।

তাঁকে বলো, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি কাল দশটায় আসবো হোটেলে। ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় আমি আরব মহল্লায় গেলাম।

বেনগাজীর মেদীনা ত্রিপোলীর মেদীনার মতোই বড়। প্রতিটি রাস্তায় আরব ধরনের ছোট ছোট কাফে। তাতে আধ পেনিতে কফি ও হুক্কা পাওয়া যায়। আমি

একটা কাফেতে ঢুকলাম। ঘরটি লোকে ভর্তি–সবাই কফি, তামাক ইত্যাদি খাচ্ছে আর গ্রামোফোনের গান শুনছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই সবার দৃষ্টি পড়লো আমার উপর। শুনতে পেলাম সবাই বলছে, মুসলিম।

আরব কাফেতে আমার প্রবেশ বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো, কারণ আমার পরিধানে ছিল ইউরোপীয় পোশাক। আর ইটালিয়ানদের কাছে তা তাদের সম্মানের হানিকর। আমি কফি ও হুক্কা দিতে বললাম। কিছুক্ষণ পর একজন লোক আমার কাছে এলো। বললো: তাহলে আপনিই মোটরে করে মরুভূমি পার হয়ে এসেছেন? লোকটি আরবীতে কথা বললো। আমিও আরবীতে উত্তর দিলাম। পরে হঠাৎ তিনি ইংরেজীতে আলাপ শুরু করলেন। বললেন: আমার নাম এল. গ্রেকো–আমি ইংরেজ।

ইংরেজ?

আমার দেশ মাল্টা। আপনি মিসর যেতে চান? আমি আপনাকে অনেক মূল্যবান তথ্য দিতে পারি। আমি বিশ বছর ধরে এখানে আছি।

ইটালিয়ানরা আসবারও আগে?

হ্যাঁ, তিন বছর আগে। ইটালিয়ানরা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বেনগাজী অধিকার করে। ঠিক সেই সময়ই ত্রিপোলীও দখল করে। তুর্কিরা যখন এখানে ছিলো সে কথাও আমার মনে আছে।

পার্বত্য-অঞ্চলে যেরূপ শোনা যায় বাস্তবিক সেখানে কি অবস্থা তাই?

খুবই খারাপ। যুদ্ধের অবস্থা এতো খারাপ আর কখনো হয় নাই।

তা হলে বাস্তবিকই সেখানে যুদ্ধ চলছে?

হ্যাঁ, সেখানে রীতিমত যুদ্ধ হচ্ছে। মাঝখানে এক বছর ছাড়া আঠারো বছর এই যুদ্ধ চলছে। পার্বত্য লোকেরাই তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। কিন্তু আর বিশেষ আশা নেই।

একবছর শান্তি ছিলো কেন?

তখন এখানে একজন খুব ন্যায়পরায়ণ ও বিবেচক গভর্নর ছিলেন। তিনি আরবদের তাদের দেশের কর্তৃত্ব দান করেছিলেন–তার পরিবর্তে ইটালিয়ানদের জন্য কিছু সুবিধা-সুযোগ তিনি চান। সেই বিবেচক গভর্নরকে সরিয়ে নেওয়া হয়। দেশটি তারা অধিকার করে নিয়েছে। আহমদ মোখতারকে বেনগাজীতে এনে বন্দী করবার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়েছিলো। আহমদ মোখতার খুব চতুর লোক। তিনি পর্বত ছেড়ে আসলেন না। সেখানে তারা তাকে ধরতে পারে নাই।

শান্তির সময় তাঁকে বন্দী করতে চেয়েছিলো কেন?

শান্তির ভাওতা দিয়ে সারাটা দেশ দখল করাই ছিলো আসল উদ্দেশ্য। সাইরেনিকা উর্বর দেশ। আরবদের হাতে তা ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই হলো ইটালিয়ানদের

ধারণা। তারা ভেবেছিলো আহমদ মোখতারকে বন্দী করতে পারলে পার্বত্য লোকদের ধ্বংস করা খুবই সহজ হয়ে উঠবে।

এখন?

এখন তারা ভীষণভাবে লড়াই করছে। জেনারেল গ্রাজিয়ানী আসার পর থেকে নিষ্ঠুরভাবে কাজ চালানো হচ্ছে। সমস্ত বন্দীকে হয় ফাঁসি না হয় গুলী করে হত্যা করা হয়। যদি কোনো বে-সামরিক লোক তাদের প্রতি সামান্য মাত্রও সহানুভূতি দেখায় তাহলে তাকেও কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। বড় ভয়ংকর ব্যবস্থা।

ইউরোপ এর কিছুই জানে না?

তারা কি করে জানবে? সমস্ত সংবাদ টেলিগ্রাম সেন্সর করা হয়। কেউ যাতে কিছু দেখতে না পায় গভর্নমেন্ট সেদিকে খুব কড়া দৃষ্টি রাখে।

এখানে অবস্থা এত খারাপ কেন? ত্রিপোলীতে তো অবস্থা বেশ শান্ত।

মৃত ব্যক্তি কথা বলতে পারে না। ত্রিপোলীর মরুভূমিতে যে বেদুইনরা যুদ্ধ করতো তারা হয়তো নিহত হয়েছে, আর নয়তো অনেক আগেই পালিয়েছে। আর শহরের লোকেরা বস্তুবাদীর রক্তের শেষ বিন্দুটুকু দিয়েও তাদের আদর্শ রক্ষা করবে। আপনার দেশ কোথায় জানি না। তবে একবার ভাবুন দেখি যে যদি কোনো বিদেশী জাতি তা অধিকার করে সেখানকার অধিবাসীদের পশুর মতো ব্যবহার করে এবং যারাই প্রতিরোধ করে তাদেরই গুলী করে হত্যা করা হয় তাহলে তার কি কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না?

নিশ্চয়ই।

এখানেও অবস্থা তাই। লোকেরা তাদের স্বদেশের জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করছে, কিন্তু তাদের জয়ের আশা খুব কম। বিষাক্ত গ্যাস আর মেশিনগানের বিরুদ্ধে তারা কি করতে পারে? আর একেই বলা হয় সভ্যতার অগ্রগতি।

কফি পান করে এল. গ্রেকো বলতে লাগলেন: পর্বতের ভিতর দিয়ে হয়তো আপনাকে যেতে দিতে পারে, কিন্তু আপনার উপর কড়া নযর রাখা হবে–একথা নিশ্চিত। আমি যখন সেখানে যাই আমার চারদিকে গুপ্তচর থাকে। কিন্তু আমি বৃটিশ প্রজা, তাই তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। পথে মের্জে আপনি একটি খুব ভালো ইটালিয়ান অফিসারের সাক্ষাৎ পাবেন–বেশ ন্যায়পরায়ণ লোক। তার কাছে আরব ও ইটালিয়ানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি মানুষের মতো ব্যবহার করেন। পার্বত্য লোকেরাও তাকে ভালোবাসে। তারা তার কোনো অনিষ্ট করে না। কিন্তু সে হাজারে একজন মাত্র।

ইটালিয়ানরা আর ভালো নীতি অনুসরণ করে না কেন?

ফ্যাসিস্ট-পন্থী হয়ে অবধি ইটালিয়ানরা সম্পূর্ণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। বাস্তবিকপক্ষে ওরা লোক মন্দ নয়। কিন্তু বর্তমানে নিজেদের দুনিয়ার সেরা বলে ওদের ধারণা

জন্মেছে। ইটালিয়ান ছাড়া আর কিছুই ওরা পসন্দ করে না। তারা নিজেদের রোমানদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। অনভিজ্ঞ ছোকরা অফিসারদের প্রত্যেকেই বলে থাকে যে শীঘ্রই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

ফ্যাসিজম কি ইটালীর অভ্যন্তরীণ শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে?

ইটালীতে তা হয়তো হতেও পারে। ইটালী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম। কিন্তু এখানে অবস্থা খুবই সাংঘাতিক। প্রতিদিন বহু লোককে হত্যা করা হয় সামান্য কারণে।

এল. গ্রেকো দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। পরে বললো: অথচ এখানে বেশ ভালো হতে পারতো। এখানকার আদিবাসীরা খুব ভালো– কিন্তু তাদের সঙ্গে এরা খুব খারাপ ব্যবহার করছে, তাই অবস্থা আজ এমন সংকটজনক।

আমরা কি কথা বলছিলাম তা কেউ বুঝতে পারেনি। বেনগাজীর কোনো কোনো লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করবার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু তাদের সবাই বললো: সেখানকার অবস্থা কোনো সময়ই এর চেয়ে ভালো ছিলো না। সাইরেনিকার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কেউ কোনো কথা বলতে সাহস পেলো না।

অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন ভোরে সেই বইয়ের দোকানে শিক্ষক আহমদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি যুবক, কিন্তু তাঁর চেহারা বিমর্ষ। আধুনিকতার ছাপ তার গায়ে লাগেনি। সেই পুরনো আরব পোশাকই তাঁর পরিধানে। তিনি আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমি মুসলিম বলে খুবই আনন্দিত হলেন। ইহুদী পুস্তক বিক্রেতার কাছে অনেক আরবী বই ছিলো। আহমদ আলী একটা আরবী বই হাতে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন: সূফী মতবাদ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?

না, খুব বেশী না।

তাহলে আপনার এ সম্বন্ধে জানা উচিত, কারণ তা না হলে কোথায় কি ঘটছে তা ভালো করে বুঝতে পারবেন না। আর ইসলামের উন্নতির ধারা সম্বন্ধেও কোনো ধারণা করতে পারবেন না। এই যে বইটি দেখছেন তা ওমর ইবনুল ফরীদের লেখা। দু'শত বছর আগে তিনি এই বইটি লিখেছিলেন। ইসলাম সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার কবিতা এতে আছে।

আহমদ বই খুলে পড়তে লাগলেন।... পড়া শেষ করে বইটি রেখে দিলেন।

বইটি সূফী মতবাদের চরম বিকাশ। সূফী মতবাদই ইসলামের উচ্চতম সোপান। আত্মাকে আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণ বিলীন করে এক করে দেবার চেষ্টাই এতে করা হয়েছে।

কি উপায়ে?

যদি মানুষ নিজের অজ্ঞাত সত্তায় নিজকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে এবং সেই সঙ্গে বস্তুজগতের দাসত্ব থেকে নিজেকে ভিন্ন করে ফেলে, তার সমস্ত চিন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহতে স্থিরভাবে নিবদ্ধ করে তাহলেই একদিন আল্লাহর প্রেমের মদিরার একবিন্দু সে পান করতে সমর্থ হবে। সেই থেকে সে আর কোনো দিন আল্লাহকে ভুলতে পারবে না। সমস্ত দৈহিক আনন্দ বস্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত সমস্ত বস্তু তার কাছে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বলে গণ্য হবে। সূফীদের প্রথম পর্যায়ে তখন পৌছলো। সে যদি খ্রিস্টান হয় তবে ত্রিত্ববাদে এক আল্লাহর সন্ধান পাবে, মূর্তিপূজক হলে প্রস্তর খণ্ডেই সে আল্লাহর একত্বের আভাস পাবে।

আবার তিনি বইটি নিয়ে আর একটি কবিতা পড়লেন।

আমি বললাম: কিন্তু সূফীরা কি ইসলামকে সত্য ধর্ম বলে বিশ্বাস করেন?

তিনি মুচকি হাসলেন। বললেন: সকল ধর্মেই ইসলাম রয়েছে। ইসলাম ধর্মের বিধান পালন করে আল্লাহর শক্তি আপনি খুব সহজেই অনুভব করতে পারেন। ইসলামের অর্থ–আল্লাহর পথ, তা আপনি জানেন। অন্য সকল ধর্মেই নীতিকথা আছে, কিন্তু ইসলামে একটি মাত্র জিনিস আছে–এক এবং অভিভাজ্য আল্লাহতেই শুধু আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে–আর বিশ্বাস করতে হবে কুরআন–আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের ইহাই পথপ্রদর্শক।

আমি নিজেও বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামের বিধান অনুসরণ করা কতো মূল্যবান। যখন থেকে আমি তা অনুসরণ করছি তখন থেকে আমি আনন্দ ও সুখ অনুভব করছি, তা এর আগে কখনো পাইনি। আমি নতুন করে দেখতে পাচ্ছি যে প্রকৃতি কতো সুন্দর, আবার আমি সংগীতের সৌন্দর্যও শুনতে পাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন আমার কোনো ধর্ম ছিলো না, এসব থেকে আমি তখন সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলাম।

খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের এটাই পার্থক্য। অবশ্য খ্রিস্ট ধর্মেও এমন সব লোক আছেন যাঁরা অনেক ভালো এবং আল্লাহর পথ তারা অনেক মুসলিমের চেয়েও অধিক সুন্দরভাবে অনুসরণ করেন। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম ধর্ম-বিশ্বাস ও আত্মার মুক্তির উপরই শুধু জোর দেয়। আমাদের কাছে তা অজ্ঞাত, কিন্তু তা ধর্মকে বাদ দিয়েছে–এই ধর্মই পৃথিবীতে একমাত্র বস্তু যা আল্লাহকে দেখবার দৃষ্টি দান করে।

পারস্য দেশের বিখ্যাত সূফী আল-গায্যালী এক স্থানে বর্ণনা করেছেন যে, একদা ঈসা পয়গম্বর এক স্থান দিয়ে যাবার সময় কতকগুলি লোককে একটা খাদের কাছে বসে থাকতে দেখেন। দেহ তাদের অত্যন্ত শীর্ণ। হযরত ঈসা তাদের জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের কি হয়েছে?

তারা উত্তর দিলো: দোযখের চিন্তা আমাদের এরূপ করেছে।

ঈসা বললেন: আল্লাহ তোমাদের সেই ভয় থেকে মুক্ত করুন। খানিকক্ষণ পর তিনি আরো ক'জন লোকের দেখা পেলেন। তাদের দেহ আরো দুর্বল ও শীর্ণ। তাদেরও তিনি সেই একই প্রশ্ন করলেন। তারা জওয়াব দিলো: বেহেশতে যাওয়ার ইচ্ছাই তাদের এরূপ করেছে। আরো খানিক পর তিনি আরো কয়েকজন অধিকতর শীর্ণ ও কংকালসার লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তাদের চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল। ঈসা তাদেরও সেই প্রশ্ন করলেন: আল্লাহর সন্ধান। আমরা আল্লাহর দেখা পেয়েছি। তাঁর সেই দিদার আমাদের বাকি সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। ঈসা বললেন: কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে। তোমাদের মধ্যেই আল্লাহ আনন্দ পেয়েছেন।

এই ছোট গল্প থেকে যে ব্যক্তি ভয়ের দরুন, আর বেহেশতের জন্য তার ধর্ম পালন করে তার পার্থক্য বুঝা যায়।

কিন্তু সূফীর স্থান এসবের বহু ঊর্ধ্বে, কারণ তার অন্তর পূর্ণ আল্লাহর প্রেমে, যা নিহিত রয়েছে সৌন্দর্য, সংগীত, উচ্চতম আল্লাহর জ্ঞান এবং স্বর্গীয় চারুকলায়। সূফীরা এসব দেখেছে; এসব হচ্ছে আল্লাহর অত্যন্ত সূক্ষ্মতম প্রতিচ্ছবি এবং এর জন্যই এরা সব ভুলে যায়।

আহমদ আলী তার ঘড়ি দেখলেন। পরে বললেন: সাড়ে এগারোটা বাজে প্রায়— মসজিদে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আপনাকে এ সমস্ত বললাম এজন্য যে তাতে আপনি সাইরেনিকা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। যারা পর্বতে লড়াই করছে তাদের প্রত্যেকটি লোক এই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত। প্রতিটি লোক–যতো জীর্ণ তাদের পোশাক আর শীর্ণ তাদের দেহ হোক না কেন, তারা প্রকৃত ইসলাম এবং সূফী মতবাদের বিধান অনুসরণ করে। এরই জন্য তারা এমনভাবে যুদ্ধ করতে পারছে।

কে এদের সূফী মতবাদ শিখিয়েছে?

সিদি আহমদ সেনৌসী। এবার মসজিদে চলুন। সেখানে তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলবো।

মসজিদটি বেশ দূরে। পথে আহমদ আলী বললেন: প্রায় দু'শো বছর আগে মুসতাগেনেসে সিদি আহমদ সেনৌসীর জন্ম হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি ধর্মপ্রাণ হয়ে ওঠেন। উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের অধঃপতন দেখে তিনি মর্মাহত হন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সারাবৌওদের লোকেরা পয়গম্বরের মতো পূজা করছে, যদিও পয়গম্বর মানুষের পূজা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি দেখতে পেলেন–পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া কেমন করে লোক দেখানো ব্যাপারে পরিণত হয়েছে–কিছুই না বুঝে না শুনে একেই তারা তাদের কর্তব্য সম্পন্ন হলো মনে করে। মধ্য বয়সে তিনি মক্কা যান। সেখানে মরক্কোর শ্রেষ্ঠতম সূফী সিদি আহমদ ইদরিসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সিদি আহমদ ইদরিসের প্রভাব সেনৌসীকে

অত্যধিক রকমে প্রভাবান্বিত করে। উত্তর আফ্রিকার উন্নতির সংকল্প নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি লোকদের শিক্ষা দিলেন বিধান অনুযায়ী কাজ না করে নামায পড়া ঠিক নয়। পয়গম্বরের নির্দেশ মতো তাকে চলতে হবে, তাতেই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যাবে–যে আনন্দ দুনিয়াকে বেহেশতে পরিণত করে দেবে। ধর্মকে অনুসরণ করলে আল্লাহর প্রতিমূর্তি অন্তরে গড়ে ওঠে।

সর্বত্রই তাঁর শিষ্য সংখ্যা বেড়ে ওঠে, বিশেষ করে সাইরেনিকার পার্বত্য জাতি এবং কুফ্‌রা মরূদ্যানের অধিবাসীরা সবাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

হ্যাঁ, আমি কুফ্‌রা সম্বন্ধে শুনেছি।

সাইরেনিকার দক্ষিণে মরুভূমির মধ্যস্থলে এটা একটা মরূদ্যান। সেনৌসী এখানকার ও সাইরেনিকার বাদশা হন। সেই থেকে তাঁর বংশধরেরা সাইরেনিকা ও কুফরা শাসন করে আসছেন। বর্তমানে ইটালিয়ানরা সেনৌসীদের বিতাড়িত করেছে–প্রকৃতপক্ষে তারাই সাইরেনিকার শাসনকর্তা। সিদি ইদরিস আলেকজান্দ্রিয়াতে নির্বাসিত।

আমাদের মসজিদে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আযান হলো। মসজিদ নামাযীতে ভর্তি। নামায শেষে সবাই নিজ নিজ গন্তব্য স্থানে চলে গেলো। আমি হোটেলে ফিরে এলাম। সিনর মেলভিসিনি আমায় অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: আপনার একটি মনিঅর্ডার এসেছে।

এক হাজার লিরা ডেনমার্ক থেকে এসেছে। তা আনতে আমি সোজা পোস্ট অফিসে গেলাম।

একটি সিসিলিয়ান কেরানীর কাছে মনিঅর্ডারের কথা বললে সে আমাকে বললো: আপনার পাসপোর্ট দেখাতে হবে।

আমি তাকে পাসপোর্ট দেখালাম। পাতা উলটে দেখে বললো: টাকা দেওয়া যাবে না।

কেন?

আপনার পাসপোর্ট বিধিসম্মত নয়।

তার মানে?

এতে ইটালিয়ান ভাষায় কিছুই লেখা নেই। আর এটা ইটালিয়ান পোস্ট অফিস। আমি যাতে পড়তে পারি সেইভাবে আপনার পাসপোর্টটি ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে। তার আগে টাকা পেতে পারেন না।

দয়া করে টাকাটা দিয়ে দিন। এ-টাকা আমারই। আর পাসপোর্টটি আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ীই দেওয়া হয়েছে।

কেরানীটি মাথা নেড়ে বললো: সাবধানে কথা বলবেন, এটা যে ইটালী তা মনে রাখবেন।

তা বেশ জানি। কিন্তু আপনার ব্যবহার খুবই আপত্তিজনক।

চুপ করুন, নইলে পুলিশে খবর দেব।

বেশ ভালো, চলুন এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

এক সঙ্গেই আমরা থানায় গেলাম।

সেই ক্ষুদে গুপ্তচরটি আমাদের দেখেই খুশী হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলা অবধি সে আমার প্রতি রাগ হয়ে আছে। আমাকে হাজতে রাখতে পারলেই যে সে খুশী হতো তা' তার চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম। আমি এসিস্টেন্টের কাছে সংবাদ পাঠালাম। কিছুক্ষণ পরই তার কাছে যাবার অনুমতি পেলাম।

কেরানী সবিস্তারে সব বললো। আরো বললো যে তার ধারণা, আমি একটি বিপজ্জনক অপরাধী। ফাঁকি দিয়ে এক হাজার লিরা সরকারকে প্রতারণা করছি।

উৎসুকভাবে এসিস্টেন্টটি আমার দিকে চাইলো। পরে বললো: আপনার পাসপোর্টটি দেখাতে পারেন?

পাতা উলটিয়ে তা দেখে কেরানীকে বললো: ঠিক কথাই। ইনি যে নিজেই এটা লিখেননি সে আশ্বাস আপনাকে আমি দিতে পারি না।

কেরানীর মুখে বিজয়ের হাসি। গুপ্তচরটি দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে কি যেনো বলতে চাইলো। রাগে আমি আমার ভিজিটিং কার্ড ফিরিয়ে নিয়ে তা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেললাম। এসিস্টেন্ট হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন: একি করছেন?

আপনি আমার কার্ড পেতে পারেন না। আমি পাসপোর্ট জাল করেছি বলে আপনি আমায় অপমান করেছেন।

এসিস্টেন্ট রাগে লাল হয়ে উঠলো, বললো: আপনাকে এখন বন্দী করা হলো।

পরে গুপ্তচরটিকে বললো: এর উপর নযর রেখো।

সে আমাকে টেনে বের করে নিয়ে পাশের একটা কামরায় রাখলো। আমাকে বসতে নিষেধ করা হলো। সিগারেট ধরাতে গেলে বারণ করা হলো। আমি যে এখন বন্দী।

দু'ঘণ্টা পর পুলিশের বড়কর্তা ফিরে এলেন। আমাকে তার কাছে ডাকা হলো। সহকারীটিও আমার পিছু পিছু এসে হাযির এবং হাত নেড়ে সমস্ত বিষয়টি বর্ণনা করলো। কর্তা সিগারেট ধরিয়ে মাথা নেড়ে বললেন: ব্যাপার খুবই গুরুতর।

কিন্তু ওরা বলে যে আমি নিজেই নাকি পাসপোর্টটি লিখেছি।

কর্তা হাত উঠিয়ে বললেন: আস্তে। সমস্ত কাগজপত্র এখানে ইটালিয়ান ভাষায় লেখাতে হবে।

খানিক চুপ করে থেকে আবার বললেন: আপনি হয়তো জানেন না। আপনার এরূপ আচরণের এটাই একমাত্র কৈফিয়ত হতে পারে। আপনি ইটালিয়ান হলে সরকারী কর্মচারীকে অপমানের অপরাধে আপনাকে জেলে দেওয়া হতো। আপনি বিদেশী, তাই ক্ষমা করা গেলো। এর জন্য আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া দরকার।

বুদ্ধিমানের মতো আমি চুপ করে রইলাম। গুপ্তচরটিকে তিনি ডেকে বললেন: এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পোস্ট অফিসে গিয়ে ওদের বলো যে আমি বলে দিয়েছি ওকে টাকা দিয়ে দিতে...

সিনর মেলভিসিনি ব্যাপারটা শুনে মাথা নেড়ে বললেন: এখানেই এর শেষ মনে করবেন না। এরা আপনার বিরুদ্ধে লেগেছে, তাই আপনাকে খুব সাবধানে চলতে হবে।

রবিবার দিন সকালে ফ্যাসিস্ট সংবাপত্র "সাইরেনিকায়" কালো বর্ডার দেওয়া প্রথম পৃষ্ঠায় একটা মোটাসোটা পাদ্রীর ছবিসহ সংবাদ বেরুলো: ফ্যাসিজম ও পোপের মধ্যে সন্ধি হওয়াতে সরকারী ও ধর্মীয় ক্ষমতার মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। প্রত্যেকটি মর্যাদাবান ফ্যাসিস্টকে রোমান ক্যাথলিক হতে হবে। এক যুবক ইটালিয়ান ইসলামের অনুরক্ত হয়ে পড়ায় তাকে অবিলম্বে ইটালী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ধর্মীয় স্বাধীনতার অস্তিত্ব আর নেই। হেডিং-এ লেখা হয়েছে: "সাইরেনিকার অধিবাসীবৃন্দ শোকাভিভূত"।

আমি প্রাতঃভ্রমণে বের হলাম। সমস্ত কাফে বন্ধ। প্রত্যেক দরজায় কালো ও সাদা পোস্টার লাগানো। তাতে ক্রস চিহ্নসহ লেখা "ডলোর সিট্‌টাডিনি"।

কাফে'র মালিক আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা হলো। তাকে এর মানে জিজ্ঞেস করলাম। ঘাড় নেড়ে সে বললো: পুলিশের নির্দেশ, সমস্ত বন্ধ রাখতে হবে। এবং প্রতি দরজায় পোস্টার লাগাতে হবে: বেনগাজী একটা ক্যাথলিক ও শোক নিমগ্ন শহর।

সাহারার রহস্য–কুফ্‌রা

এল্‌বারগো ইটালিয়ায় যখন ফিরে এলাম তখন খাবার সময় হয়ে গেছে। আমি আমার টেবিলে বসেছি, টারবক্স খেতে শুরু করেছে। সিনর মেলভিসিনি আমার নিকট এসে অন্য টেবিলের কাছে উপবিষ্ট দু'টি ইটালিয়ান অফিসারকে দেখিয়ে বললেন: ঐ যে ছোট্ট অফিসারটি দেখছেন, ইনি ক্যাপ্টেন এলড্রো ফোরনারী। ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আপনার উচিত। উনি আপনাকে অনেক মনোরম বিষয় শোনাতে পারবেন। উনি কুফ্‌রায় বন্দী ছিলেন। কোনো ইউরোপীয়ান কোনো দিন সেখানে যায় নি।

আমি ওকে বেনগাজীতে আর কখনো দেখিনি।

না, উনি মের্জে থাকেন।

আমি শুনেছি সেখানে নাকি খুব ভালো একজন কমানডেন্ট আছেন?

হ্যাঁ, তাঁর নাম ডিওডিসি। সবাই তাঁকে ভালোবাসে।

মেলভিসিনি চলে গেলেন। সেই অবসরে আমি ফোরনারীকে দেখে নিলাম। বেশ খোশ হালে তিনি খেয়ে যাচ্ছেন। তাঁর খাওয়া শেষ হলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম এবং কুফ্‌রা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি সানন্দে রাযী হলেন। বললাম: সিনর মেলভিসিনি বললেন যে, কুফ্‌রার আরবরা নাকি আপনাকে বন্দী করে রেখেছিলো?

হ্যাঁ। হেসে জওয়াব দিলেন। তা এখন শেষ হয়ে গেছে। সে অবস্থায় আর চার মাস আমি কাটাতে পারতাম না। আমার আরবী ভাষা জ্ঞানই আমায় বাঁচিয়েছে। কিন্তু আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, উটের টক দুধ আর খেজুর খেয়ে চার মাস বেঁচে থাকা ঠাট্টার কথা নয়।

কুফ্‌রা কোথায়?

ফোরনারী এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিলেন এবং পেনসিল নিয়ে একটা নকশা আঁকলেন। পরে বললেন: বেনগাজী থেকে প্রায় ছ'শো মাইল দক্ষিণে এবং মিসরের আল-খারগা থেকে তিনশো মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইটালীয় সামরিক কর্তাদের অনেকদিন যাবত ধারণা ছিলো যে সাইরেনিকার গোলমালের কেন্দ্রস্থল এই কুফরায়। আমার উপরস্থ অফিসার কমান্ডেন্ট ডিওডিসির মতো আমারও অভিমত যে আরবদের

দাবি-দাওয়া আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। আমরা যদি কুফরার আমীর মুহম্মদ সেনৌসীর সহিত বোঝাপড়া করে নিতে পারি তাহলে আমাদের অনেক লাভ হবে।

এখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম: মুহম্মদ সেনৌসীকে আমাকে বলা হয়েছে-সিদি ইদরিস সেনৌসী। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকেন এবং তাঁরই নির্দেশে নাকি সমগ্র সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে।

ঠিক কথা। মুহম্মদ সেনৌসী কুফ্‌রায় সিদি ইদরিসের স্থলবর্তী। সেই পরিবারের দুটি শাখা–শ্বেত শাখা–সিদি ইদরিস সেই শাখার অন্তর্গত এবং কৃষ্ণ শাখা–জনৈক সেনৌসীর হাবশী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধর, মুহম্মদ সেনৌসী এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। সিদি ইদরিসের চেয়ে মুহম্মদ সেনৌসী ইটালিয়ানদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। তিনি আরবদের জন্য পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি করেন। তাই আমরা মুহম্মদের সঙ্গেই আলোচনা চালাই।

সিদি ইদরিস কি এ কথা জানেন?

প্রথম তা মনে হয়নি। কিন্তু এ কথা শোনার পর থেকেই প্রকৃত সংকট আরম্ভ হয়। কুফ্‌রায় অভিযান চালানোর ভার পড়লো আমার উপর। কিন্তু সে কাজ খুব সহজ ছিলো না। ওয়েসিসের একশো কুড়ি মাইল দূর থেকেই বিস্তৃত মরুভূমি ভীষণ আকার ধারণ করেছে। সেখানকার বালি এত পাতলা আর হালকা যে, মোটর চালানো সেখানে অসম্ভব। এমন কি উটও সেখানে চলতে পারে না। কোনো উপায়েই তা পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়।

কোনো ইউরোপীয় এর আগে কুফ্‌রায় যায়নি[১]; কিন্তু বড় আশ্চর্য যে, সেখানে একজন ইউরোপীয় মহিলা গিয়েছিলেন–রজিটা ফবরেস তাঁর নাম। অবশ্য তিনি শহরের খুব বেশী দেখেন নাই। মাত্র এক রাত সেখানে তিনি ছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে ইউরোপীয়দের ষড়যন্ত্রের অগ্রদূত হিসাবে সন্দেহ করে এবং শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ না করলে তাঁকে হত্যা করার ভয় দেখানো হয়। তাই তাঁকে তাড়াতাড়ি মিসরে ফিরে যেতে হয়।

মুহম্মদ সেনৌসীর সংস্পর্শে আসি একটা আকস্মিক ঘটনার ভিতর দিয়ে। আমীরের এক পুত্র সাংঘাতিক রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ভালো চিকিৎসা হলেই শুধু তাকে বাঁচানো সম্ভব। একজন ভালো ডাক্তার পাঠাবার জন্য আমাকে সরকারীভাবে বলে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সন্ধির আলাপও করতে পারি। সাইরেনিকার গভর্নমেন্ট (জেনারেল গ্রাজিয়ানীর আগমনের সামান্য পূর্বে) এই সুযোগ ছাড়তে

১.ফোরনারীর এ ধারণা ভুল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পরিব্রাজক রলফস (Rohlfs) ইউরোপীয়ানদের মধ্যে প্রথম সেখানে যান। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে একজন ফরাসী যুদ্ধবন্দীকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে–যে বৎসর Rosita Fobres সেখানে যান সেই বছরই দক্ষিণ দিক থেকে একজন ফরাসী অফিসার কুফ্‌রায় যান।

চাইলেন না। একজন ডাক্তার, একজন বেতার বার্তাপ্রেরক এবং আমাকে সহ একদল অভিযাত্রী সেখানে পাঠানো হলো।

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আমরা বেনগাজী থেকে রওনা হলাম। আমরা অতি দ্রুত দক্ষিণের শেষ আউট-পোস্ট (বেনগাজী থেকে যার দূরত্ব একশো পঁচিশ মাইল মাত্র) পৌঁছলাম। সেখানে আমীর প্রেরিত উটের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েক দিন পর কাফেলা সেখানে এসে পৌঁছলো,–সঙ্গে স্বয়ং মুহম্মদ সেনৌসী আর তাঁর দুই পুত্র। তাদের একজন সেই অসুস্থ বালক। তৎক্ষণাৎ বালকের চিকিৎসা হলো।

পরে আমরা কুফ্‌রার দিকে রওনা হলাম। রাস্তা এত খারাপ যে, উট চলার পক্ষেও তা খুবই কঠিন। তাই আমাদের খুব ধীরে চলতে হয়। সেই বৃহৎ বালু-সমুদ্রে এসে চলা আরো মুশকিল হয়ে উঠলো। রাস্তা মাঝে এতো খারাপ যে উট এগুতে চায় না। চাবুক মেরে মেরে রক্ত ঝরে না পড়া পর্যন্ত উটগুলি কিছুতেই চলে না। সেই নরম বালুরাশির উপর দিয়ে অতি কষ্টে ধীরপদে উটের দল এগিয়ে চলে।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফোরনারী উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন যেনো সেই দুস্তর মরুর ছবি তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে। পরে আবার তিনি বলতে লাগলেন: অদ্ভুত জীব এই উটগুলি। এদের অনুভূতি শক্তি সকল প্রাণীর চেয়ে অধিক। আরোহীরা এদের প্রতি বিশেষ নযর রাখার প্রয়োজন মনে করে না। উট ঠিকমতো পথ চলে। লুবা বালুর ঝড় শুরু হবার বহু পূর্বেই এরা তা টের পায়। বালু-ঝড়ের আভাস পেয়ে উটগুলি ব্যস্ত ও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং হাঁচির মতো এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ করতে শুরু করে। এদের প্রকাণ্ড নাক দিয়ে পানি ঝরে পড়তে থাকে। এদের দৃষ্টিশক্তিও অদ্ভুত রকমের প্রখর। যখনই সীমান্ত রেখায় কোনো কিছু দেখতে পায়–মানুষের চোখে যা দেখা অসম্ভব–তখনই অদ্ভুতভাবে এরা মুখ খিচাতে থাকে এবং কান খাড়া করে তোলে–আরোহীরা বুঝতে পারে যে কোথাও একটা কিছু ঘটেছে।

পানি না পান করে উট কতোদিন চলতে পারে?

কমপক্ষে এক সপ্তাহ। যাক, পথে আমাদের প্রচণ্ড বালি-ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। এ সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে যাই। তিন সপ্তাহ চলার পর আমরা মরুভূমির সবচেয়ে সংকটময় স্থানে পৌঁছি। এই স্থানটিতে বালুর এক অতি উচ্চ স্তূপ বহুদূর বিস্তৃত হয়ে মরুভূমির উত্তর অংশ ও কুফরার মাঝখানে এক দুর্লংঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করেছে। এখানেই সেই ঘটনা ঘটে, যাতে আমাদের সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যায়।

কয়েকদিন ধরে এই বিস্তৃত বালুর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বহু কষ্টে চলতে হয়। পানি সেখানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। উটেরও পানির দরকার। একদিন বিকেলে উটগুলি চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাদের সন্দেহ হলো বা সীমান্ত রেখায় এমন কিছু দেখতে পেয়েছে যা আমরা তখনো টের পাইনি। আমরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু

আমরা ভীত হই নাই; কারণ, আমীর আর তাঁর পুত্রেরা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আধ ঘণ্টা পর উষ্ট্রারোহীর একটা বড় দল সীমারেখায় দেখা গেলো। সম্মুখে দলের নেতা পতাকা হাতে আসছে। গুণে দেখলাম তাদের সংখ্যা প্রায় একশো। এরা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। আমীর তাই ভাবলেন যে, এই সেনাবাহিনীকে কুফরার থেকে তাদের অভ্যর্থনার জন্য পাঠানো হয়েছে।

তারা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আসেনি। তারা যতোই নিকটবর্তী হতে লাগলো ততোই তারা অর্ধ-বৃত্তাকারে রাইফেল তাক করে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলো।

তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। আত্মরক্ষার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সিকি ঘণ্টার মধ্যে আমীর ও তাঁর পুত্রগণ নিজেদের তাঁবুতে বন্দী হলেন। বাইরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হলো। আমাদের বেঁধে বালির উপর ফেলে রাখা হলো।

পরে জানতে পারলাম যে, কুফরায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ইটালিয়ানদের প্রতি মুহম্মদ সেনৌসীর ব্যবহার লোকদের মনে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করেছে। সেই গোত্রের প্রকৃত নেতা সিদি ইদরিস এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। যখন জানা গেলো যে, ইটালিয়ান অফিসারেরা কুফরায় আসছে তখন সিদি মুহম্মদকে পদচ্যুত করে সাময়িকভাবে গণতন্ত্র ঘোষণা করা হলো।

আমীর নিজে যদি আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে না আসতেন তাহলে হয়তো এর প্রতিরাধ সম্ভব হতো। তাঁর কয়েক মাসের অনুপস্থিতিই তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার সুযোগ দান করে। এরই ফলে তারা আমাদের কাফেলা আক্রমণ করে।

বন্দী হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের প্রশ্ন করা হলো। আমীর তখনো তাঁর তাঁবুতে। কুফরা পৌঁছবার পূর্বে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি। অল্পক্ষণই আমাদের পরীক্ষা করা হলো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হলো যে, আমাদের ইচ্ছা কি? আমরা আমাদের সামরিক অধিকার কুফরায়ও বিস্তার করতে ইচ্ছা করছি কিনা? আমরা তা অস্বীকার করলে তারা জানতে চাইলো সঙ্গে কতো টাকা এনেছি। আমি উত্তর দিলাম। কারণ, আমিই একমাত্র আরবী জানি। বললাম যে, যা তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে তা ছাড়া আর কিছুই আমাদের কাছে নেই। সে কথা কেউ বিশ্বাস করলো না। তারা আমাদের জেরা করতে লাগলো। তাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমরা কোথাও প্রচুর টাকা-পয়সা লুকিয়ে রেখেছি। আমরা শুধু অস্বীকার করছি। তারপর আমাদের প্রতি দণ্ডাদেশ হলো–পরদিন ভোরে গুলী করে আমাদের হত্যা করা হবে।

তাঁবু থেকে খানিক দূরে মরুভূমিতে আমাদের নেওয়া হলো এবং আমাদের নিজেদের কবর খুঁড়বার জন্য আদেশ দেওয়া হলো। তারপর আমাদের একসার করে দাঁড়া করানো হলো। একটা ছোট সৈনিকদল আমাদের প্রতি রাইফেল তাক করে

প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। নেতা তাঁর হাত ঊর্ধ্বে উঠালেন। আমরা আমাদের ভাগ্যের অপেক্ষা করছি, এমন সময় নেতাটি আমাদের বললেন: এবার বলো টাকা কোথায় রেখেছো?

আমি উত্তর দিলাম যে, আমাদের আর টাকা-পয়সা নেই। থাকলে আমরা তাকে সে কথা বলতাম। কারণ, টাকার চেয়ে জীবনকে আমরা বেশী মূল্যবান মনে করি। আমাদের শাস্তিদান তখনকার মতো মুলতবি রাখা হলো। কুফরায় নিয়ে গিয়ে আমাদের আরো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

তারপর শুরু হলো সেই একশো পঁচিশ মাইল বালুময় রাস্তা অতিক্রমের পালা। আমাদের উটে চড়তে দেওয়া হলো না। তাদের উটের সঙ্গে আমাদের দৌড়ে চলতে হলো। দ্রুত দৌড়ে চলতে না পারলে তার ফল খুব ভালো করেই আমাদের অনুভব করতে হতো।

ডাক্তার আমাদের কষ্টের কথা নেতাকে বললে সে বললো: এর চেয়েও আরো কঠোর শাস্তি তোমাদের পাওয়া উচিত। আমার ভাইকে তোমাদের সৈন্যরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে।

এবার আমাদের শুধু খেজুর খেতে দেওয়া হলো; কারণ বেদুইনরা তাদের সঙ্গে আর কিছুই আনেনি। ক্ষুধা বলে কোনো কিছুই যেনো এদের নেই। কিন্তু আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লাম। একটি একটি করে দিন কাটতে লাগলো। আমাদের গ্রেফতারের চৌদ্দদিন পর আমরা কুফরা দেখতে পেলাম।

বালুরাশির বিস্তৃত সমুদ্রের মাঝে ওয়েসিসটিকে ঠিক একটি সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছে। মহাসাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপের মতো বাইরের দুনিয়া থেকে এটা একেবারে বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিমে টিবেস্তি পর্বতমালা–এখানে মানুষের বাসস্থান আছে–কিন্তু কোনো ইউরোপীয়ান সেখানে যায় নাই। পূর্ব দিকে একমাসের পথ মিসর। দক্ষিণ দিকে নিকটতম দেশ ফরাসী-অধিকৃত সুদান। তাও বহুদিনের পথ।

কুফরায় আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হলো তা বেশ অদ্ভুত। বেদুইনরা আমাদের প্রতি বিরূপ–স্ত্রীলোক আর ছেলেমেয়েরা আমাদের সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করে। তারা কখনো কোনো ইউরোপীয়ান দেখেনি। তারা আমাদের উপর থুথু, পাথর এবং মাটির টিলা ছুঁড়ে মারতে লাগলো। মাঝে মাঝে ভয় হতো যে, যে-কোনো সময় ওরা আমাদের চোখ উপড়ে ফেলতে পারে। অল্পক্ষণ পর এই শাস্তি থেকে আমরা রেহাই পেলাম। আমাদের একটা পাথরের ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হলো। এখান থেকে পালানোর কথা চিন্তাও করা যায় না।

পরদিন আবার আমাদের একটা প্রশস্ত ঘরে প্রশ্ন করা হলো। প্রত্যেক পরিবারের কর্তা সেখানে উপস্থিত ছিলো। আমাদের পশ্চাদপটে রেখে আমীরের বিচার শুরু হলো।

কুফরার কায়েদ (বিচারপতি) আমাদের প্রশ্ন করলেন। তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে, কুফরার সমস্ত অধিবাসী একমত যে আমীর খ্রিস্টান ইটালিয়ানদের কাছে তাদের দেশকে বিক্রি করে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাতে করে তিনি ইসলামের একটি পবিত্র আইন ভঙ্গ করেছেন।

আমীর তা অস্বীকার করলেন। তিনি কুফরায় শুধু একজন ডাক্তার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

কায়েদ বললেন: না, আমরা বিশ্বাস করি না। উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য দেশ যেমন ফরাসীদের কাছে বিক্রয় করে দেওয়া হয়েছে তেমনি করে আমাদের এই ওয়েসিসটিও বিক্রি করতে চেয়েছিলেন আপনি। সেই কারণেই আপনি আর আমাদের আমীর থাকতে পারেন না। আপনি সিদি আহমদ সেনৌসীর পৌত্র। সেজন্য আমরা আপনার কোনো অনিষ্ট করবো না। তবে এ সপ্তাহ শেষ হবার পূর্বেই আপনাকে কুফরা ত্যাগ করতে হবে।

তাই স্থির হলো। আমীর সেই নির্দেশ মেনে নিলেন এবং কুফরা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন।

অল্পক্ষণ আমাদের প্রশ্ন করা হলো। প্রথম সপ্তাহ প্রতি রাতে আমাদের বলা হতো যে পরদিন ভোরে আমাদের গুলী করে মারা হবে। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু পরদিন ভোরে কোন না কোন অজ্ঞাত কারণে সে দিনের জন্য তা মুলতবি রাখা হতো।

সারাদিন আমাদের মেলার জানোয়ারের মতো সর্বত্র তামাসা দেখিয়ে বেড়ানো হতো। আমাদের কাছে এসে আমাদের জামা-কাপড় ও শরীরের চামড়া স্পর্শ করে আমরা বাস্তবিক মানুষ কিনা তা জানাবার জন্য সকলকেই অনুমতি দেওয়া হতো। এমন কি মেয়েরা পর্যন্ত বে-পরদাভাবে আমাদের দেখতে আসতো। –যেসব মানুষের কাছে মেয়েদের পরদা করা উচিত তারা আমাদের সেই মানুষের পর্যায়ের বাইরে বলেই মনে করতো।

প্রথম সপ্তাহের কষ্টের পর আমরা খানিকটা শান্তি পেলাম। আমীর সুদান চলে গেলেন। জানতে পারলাম যে পরে তাঁকে ফরাসীরা গ্রেফতার করে। কারণ এক সময় তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

ওয়েসিসে আমাদের ভাগ্য সম্বন্ধে বেশ আলোচনা হতো। অধিকাংশ লোকই আমাদের হত্যা করার পক্ষপাতী ছিলো। কারণ ইটালিয়ানরা অনেক আরবকে হত্যা করেছে। আবার কারো কারো ইচ্ছা যে কুফরার দাস বিক্রির বাজারে আমাদের বিক্রি করে দেওয়া হোক। যে আমাদের কিনবে সে পুনরায় আমাদের সুদানে বিক্রি করবে। সেখানে আজো দাসপ্রথা বিদ্যমান। আমাদের ইচ্ছা যে শেষোক্ত দলের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। একবার সুদানে যেতে পারলেই আমরা নিরাপদ। আর একদল ছিলো, যারা

আমাদের ইসলাম গ্রহণ করতে উপদেশ দিতো। কারণ তাহলে সমস্ত শাস্তির হাত থেকে আমরা মুক্ত হবো এবং স্বাধীন মানুষের মতো কুফরায় বাস করতে পারবো।

প্রকৃতপক্ষে আমরা দাস ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না তখন। আমাদের কঠোরতম কাজ করতে হতো। আমাদের খেতে দেওয়া হতো প্রচুর, কিন্তু খেজুর আর উটের দুধ। অবশ্য কখনো বা সামান্য মেষের গোশত দেওয়া হতো, কিন্তু রুটি কোনো দিনই দেওয়া হতো না। রুটি সেখানে অজ্ঞাত।

একদিন আকস্মিকভাবে এ অবস্থার শেষ হলো। অনেক রাত অবধি তাদের মধ্যে বিবাদ চলে–আমরা তখন শুয়ে পড়েছি, এমন সময় একজন আরব এসে আমাদের ডাকলো। সে আমাদের উঠে পোশাক পরে তার সঙ্গে যেতে বললো। তার হুকুম তামিল করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর ছিলো না। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

উটে চড়িয়ে আমাদের মরুভূমিতে নিয়ে আসা হলো। সঙ্গে পঞ্চাশ–ষাটজন সশস্ত্র প্রহরী। আমাদের চলতে হচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

শীঘ্রই বুঝতে পারলাম যে, আমাদের চুরি করে আনা হয়েছে। যে দলটি আমাদের বিক্রি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো, অন্যদের সঙ্গে একমত হতে না পারায় এই সহজ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। তাই তারা আমাদের চুরি করে সুদানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বেশ মোটা টাকা পাবে। কিন্তু তারা অধিক দূর অগ্রসর হতে পারলো না। শীঘ্রই ব্যাপারটা কুফরায় জানাজানি হয়ে গেলো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ লড়াই শুরু হয়ে গেলো। দু'দলেই প্রায় ডজন খানেক লোক হতাহত হলো। তারপর দু'দলে আপোস হয়ে গেলো। আমাদের কুফরায় ফিরিয়ে আনা হলো।

এর মীমাংসার জন্য আমি তাদের একটা যুক্তি দিলাম। তাদের দলপতিকে বললাম: শুনুন, হত্যা বা বিক্রি না করে অর্থের বিনিময়ে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া কি সহজ এবং লাভজনক নয়?

নানা দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হলো। বহু আলোচনার পর স্থির হলো যে, দু'লাখ লিরার পরিবর্তে আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। আমাদের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে আমাদের গভর্নমন্টে জড়িত হোক আমি তা পসন্দও করিনি। আমি এতে সম্মত হলাম না। বললাম: দু'লাখ লিরা যে কতো সে সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা আছে কি?

সে ধারণা কারোর নেই। আবার আমরা বিষয়টি আলোচনা করলাম। কিন্তু মুশকিল দাঁড়ালো টাকাটা কি করে পাওয়া যাবে তাই নিয়ে। বেদুইনরা বললো যে, আমাকে টাকার জন্য আমার গভর্নমেন্টের কাছে লিখতে হবে এবং মিসর থেকে তারা টাকাটা নিয়ে আসবে। প্রস্তাবটি আমার মনঃপুত হলো না। বললাম: এভাবে টাকা আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের একজনকে বেনগাজী গিয়ে সেখান থেকে টাকা আনতে হবে–অন্যেরা সবাই এখানে থেকে যাবে।

তারা আমার এ প্রস্তাব মানলো না। অনেকক্ষণ আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলাম, কিন্তু একমত হওয়া গেলো না।

ফোরনারীর স্বর রুক্ষ হয়ে এলো। এক গ্লাস পানি পান করে আবার বলতে লাগলেন: কুফরার পানি খুব ভালো। সেখানে ভালো পানি পাওয়ার যে কি আনন্দ তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না।

ধন্যবাদ, তা আমার জানা আছে। মরুভূমিতে দশদিন আমাকে খাবার ও পানি ছাড়া কাটাতে হয়েছে।

ফোরনারী বলতে লাগলেন: দিন যেতে লাগলো। তখনো আমরা বন্দী। আমাদের থাকবার জন্য ঘর তৈরী করতে খড় দেওয়া হলো। আমাদের সঙ্গে ব্যবহারও একটু ভালো চলতে লাগলো। তারপর একটা আকস্মিক ঘটনায় আমাদের মুক্তির পথ হলো।

সাইরেনিকায় ইটালিয়ানদের উপর একটা বড় রকমের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করা হলো। প্রতিদিন ব্যাপকভাবে তার মহড়া চলতে লাগলো। এক হাজারেরও উপর সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করা হলো। তাদের ধারণা হলো যে, এবার তারা বেনগাজীই দখল করতে পারে।

বেনগাজী আক্রমণ না করতে তাদের উপদেশ দিলাম। বললাম যে, ইটালিয়ানদের মেশিনগান এই এক হাজার লোককে অতি সহজেই ধ্বংস করে দেবে। তারা আমার কথা বিশ্বাস করলো না। বললো: আপনি ইটালিয়ান, তাই ইটালিয়ানদের পক্ষে কথা বলছেন। আরবরা অত্যন্ত সাহসী। একজন আরব পাঁচজন ইটালিয়ানের সমান এবং এই হিসাবের উপর নির্ভর করে অভিযানের পরিকল্পনা করা হলো।

অবশেষে একদিন সেই এক সহস্র সৈনিক ইটালিয়ানদের আক্রমণ করতে রওনা হলো। তারা যাত্রা করলো। এদিকে আমাদেরও সুযোগ হলো। যে সমস্ত শেখ সেখানে থেকে গেলো তাদের সকলকে ডেকে বললাম যে, দু'লাখ লিরা আনবার জন্য আমাদের যেতে দেওয়া হোক। তারা সম্মত হলো। এবারও কিন্তু মুশকিল দাঁড়ালো কি করে টাকাটা পাওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে। একজন শেখকে বোঝাতে সমর্থ হলাম, তিনি অনেক আলাপ-আলোচনার পর অন্যদের রাযী করাতে সমর্থ হলেন। ঠিক হলো যে, আমি মিসর যাবো এবং সেখান থেকে বেনগাজী যাবো। টাকাটা মিসরে আমানত করা হলে অন্য বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে।

একদল বেদুইনকে তাদের উটসহ তাড়া করলাম এই শর্তে যে, আমরা সেখানে পৌঁছেই তাদের সমস্ত প্রাপ্য চুকিয়ে দেবো। তারা আমার কথায় বিশ্বাস করলো।

আমরা মিসর রওনা হলাম। ভীষণ সে ভ্রমণ। একমাসের অধিক সময় লাগলো। আমাদের পানি ফুরিয়ে গিয়েছিলো। সামান্য পানি তাদের ছিল। বেদুইনরা বললো তা খেয়ে ফেলতে। পানি না খেয়ে আরো অনেকক্ষণ থাকবার অভ্যাস তাদের আছে।

মরুভূমিতে আহার না করে বা পানি না খেয়ে তারা থাকতে পারে, কিন্তু আমরা মরে যাবো।

অবশেষে আমরা মিসর পৌঁছলাম। আমার আনন্দের আর সীমা নেই। এই প্রথম মৃত্যুর আশংকা থেকে মুক্ত হলাম। এই কয়টি মাস প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকাই প্রাণে জেগেছে।

তারপর খুব তাড়াতড়ি সব বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। আমি কায়রো পৌঁছলাম। সেখানে বৃটিশ হাইকমিশনার লর্ড লয়েডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। নিজকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করতে তিনি আমায় বললেন। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আমিই নাকি এই প্রথম প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছি।

কুফরার দাসত্বপ্রথা সম্বন্ধে খবর কি?

দাসদের প্রতি বেশ ভালো ব্যবহারই করা হয়। সেখানে কাফ্রিরাই শুধু ইসলাম গ্রহণ করেনি। যাদের সুদানে বিক্রি করা হয়, তাদের দ্বারা সমস্ত কঠিন কাজ করানো হয়। যদি কোন ক্রীতদাসীর গর্ভে কোনো আরবের সন্তান হয় তাহলে মা ও সন্তান উভয়কেই মুক্তি দেওয়া হয়।

ক্রয়-বিক্রয় কি করে চলে?

উক-এল-রাজিমে প্রতি বৃহস্পতিবার দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার বসে। ভালো একটি দাসের দাম এক হাজার লিরা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

আমার গল্প এখন পেশ করছি।

কায়রো থেকে বেনগাজী গেলাম। প্রয়েজানীয় টাকাও পেয়ে গেলাম। টাকা নিয়ে খাগরা ওয়েসিসে গেলাম। অন্যান্য বন্দীকে সেখানে নিয়ে এলে তাদের টাকা দেওয়া হলো। পূর্ণ দু'টি মাস তাদের জন্য আমাকে খাগ্‌রা অপেক্ষা করতে হলো। তারা এসে একটা ভয়ংকর গল্প বললো। আমার চলে আসার কিছুদিন পর সাইরেনিকা অভিযাত্রীরা ফিরে আসে। মাত্র চারশো লোক জীবিত ফিরে এসেছে। অবশিষ্ট সবাই মেশিনগানের গুলীতে নিহত হয়েছে। তারা এসেই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমাদের তৎক্ষণাৎ হত্যা করার দাবি জানালো। কিন্তু টাকার লোভের কাছে রক্তের লোভ পরাজিত হলো। আমরা বেঁচে গেলাম। কুফরা বড় অদ্ভুত স্থান। সেখানকার লোকেরা যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে তা তাদের নিজেদের তৈরী। বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। আমার দীর্ঘকাল অবস্থানকালে কোনো ইউরোপীয় দ্রব্য সেখানে ব্যবহৃত হতে দেখিনি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফোরনারী বললেন অদ্ভুত হলেও কুফরার অধিবাসীদের আমার খুব ভালো লাগতো।

সাইরেনিকার অবস্থা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি, জিজ্ঞেস করলাম।

এ ব্যাপারে আমি খুব ভালো অভিমত প্রকাশ করতে পারি না। আমার মত এই যে, আরবদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা আমাদের উচিত। ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্যের সংস্কৃতির সমন্বয়েই শুধু সুফল পাওয়া যেতে পারে।

এখানকার আর সবাই কি আপনার এই মত সমর্থন করে?

না। খুব সামান্য তাদের সংখ্যা। এখানে যারাই আসে তারাই আমাদের পশুর মতো মনে করে এবং তাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করে। যেসব লোক আরবীর একটা অক্ষরও বলতে পারে না, সভ্যতাকে কৃষ্টি বলে যাদের ধারণা, তাদের কাছ থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন? এবার আমায় উঠতে হলো। যদি মের্জে যান তাহলে অনুগ্রহ করে আমার সন্ধান নেবেন।

পরে জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন ফোরনারী এদিক দিয়ে তাঁর বড় কর্তা কমানডেন্ট ডিওডিসিরই জুড়িদার। তিনিও আরবদের প্রিয়পাত্র।

জেনারেল গ্রাজিয়ানী

পরদিন রবিবার। বেনগাজী উৎসব-মুখর। সমস্ত সরকারী গৃহের উপর ইটালিয়ান পতাকা উড়ছে। নতুন ইউনিফরম পরিহিত ইরিত্রিয়ান সৈনিক রাস্তায় মার্চ করে চলেছে। আজই প্রথম ষোল থেকে আঠারো বছরের ইটালিয়ান বালকদের হাতে রাইফেল দেওয়া হবে। বোমবারডী আর জনকয়েক লোক ছাড়া বেনগাজীর সকল ইটালিয়ান পুরুষ এবং বালক কালো শার্ট পরিহিত। দশটায় এলবারগো ইটালিয়ার সম্মুখস্থ প্রধান স্কোয়ারে অবস্থিত গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-এর সামনে তারা মার্চ করে এসে উপস্থিত হলো। অর্ধঘণ্টা পূর্বে তারা তাদের রাইফেল পেয়েছে। সারি বেঁধে তারা গভর্নরের আগমন প্রতীক্ষা করছে।

ফ্যাসিস্ট মার্চের বাদ্য বেজে উঠলো। বেলকনিতে জেনারেল গ্রাজিয়ানীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বালকেরা আনন্দ-ধ্বনি করে উঠলো।

কর্কশ ও রুক্ষকণ্ঠে চিৎকার করে গভর্নর বললেন: তোমরা আজ যে রাইফেল পেয়েছো তা তোমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ইটালীর রক্ষার জন্য এবং প্রয়োজন হলে তার শক্তি ও সম্মান বিস্তারের জন্য তা ব্যবহার করবে। তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে, তোমরা রোমান—অসভ্যদের সঙ্গে তোমরা সংগ্রামরত, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে,–কিন্তু সব সময় তাদের উপর কর্তৃত্ব করবে। তোমরা ওদের প্রভু।–ভুলো না যে তোমরা রোমান।

হাত উঠিয়ে ইটালিয়ান তেরংগা পতাকা দেখিয়ে বললেন: আবার এদেশের উপর ইটালীয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। এ পতাকা যেনো কোনদিন এখান থেকে স্থানচ্যুত না হয়। ইভিভা ইটালিয়া।

বালকেরা সমস্বরে ইভিভা চিৎকার করে উঠলো। আবার বাদ্য বেজে উঠলো। ফ্যাসিস্ট-মার্চ সঙ্গীত গেয়ে বালকের দল সে স্থান ত্যাগ করলো। এক ব্যাটেলিয়ান ইরিত্রিয়ান সৈনিক অপর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার জেনারেল গ্রাজিয়ানী তাদের সম্ভাষণ করে বললেন–একজন দো-ভাষী তা অনুবাদ করে ইরিত্রিয়ানদের ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দিলো: হে ইরিত্রিয়ার বীর সৈনিকবৃন্দ, তোমরা আমার ত্রিপোলীর মুরজুক এবং ফেজানের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় আমার সঙ্গে ছিলে। তোমরাই আজ

আবার আমার সঙ্গে রোমান-লিবিয়ার উপর নতুন করে ইটালিয়ান ঈগলের পক্ষ বিস্তারের জন্য লড়াই করছো। তোমাদের এই আন্তরিকতা, বীরত্ব ও সহযোগিতার জন্য তোমাদের সেনাপতির ধন্যবাদ গ্রহণ করো। নতুন সংগ্রাম তোমাদের সামনে আসছে–আমাদের সঙ্গে তোমরাও নিশ্চিতভাবেই জয়ী হবে। আমাদের ও তোমাদের ধর্ম এক। এসো আমরা সমস্বরে ইটালী এবং তার উপনিবেশ ইরিত্রিয়ার জন্য ইভিভা ধ্বনি করি।

সেনাপতি তাঁর হস্ত উত্তোলন করলেন। কৃষ্ণকায় সৈনিকদের মধ্যে যে সমস্ত ইটালিয়ান অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলো সেই ধ্বনিতে তারাও যোগ দিলো।

পরে ইরিত্রিয়ান সৈনিকেরা গান গেয়ে রাস্তায় নাচতে লাগলো। আরবরা নীরবে সমস্ত দেখলো; কিন্তু বেশীর ভাগ আরবই এই অনুষ্ঠানের সময় দরজা বন্ধ করে নিজ গৃহে বসে রইলো।

টারবক্স আর আমি আহার শেষ করে হোটেলের ছাদে বসে আছি– এমন সময় বোমবারডি আমাদের কাছে এলো। বললো: গাড়ি প্রস্তুত। পারমিট পেলে যে কোনো দিন আপনারা যেতে পারেন।

সোমবার সকালে জেনারেল গ্রাজিয়ানীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম। জেনারেল এড্জুটেন্ট কর্নেল মাফাল্ডিয়া আমায় অভ্যর্থনা করলেন।

জেনারেল গ্রাজিয়ানীর কক্ষে ঢুকলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললেন। পরে চোশ্ত ফরাসীতে বললেন: আপনিই কি মরক্কো থেকে মোটরে করে এসেছেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে আর যেতে দেওয়া যায় না।

কিন্তু মিসরের এত কাছে এসে গেছি। সেখানে পৌঁছতে পারলে আমিই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলে পরিগণিত হবো যিনি মোটরে আফ্রিকার পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন।

এটাই কি আপনার ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য?

না। আরব কৃষ্টি ও তাদের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে চাই।

আমাদের এখানকার সাফল্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

সভ্যতার দিক থেকে তা খুবই ভালো। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কিছুই লিখতে চাই না।

তাহলে কোন্ সম্বন্ধে লিখবেন?

ইউরোপে যা দেখতে পাওয়া যায় না সেসব ব্যাপারেই আমি লিখবো।

আপনি যদি নিজে সমস্ত দায়িত্ব নেন তা হলে আপনি হয়তো যাওয়ার অনুমতি পেতে পারেন। পরে আমার এডজুটেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন।

গাড়ি প্রস্তুত ছিলো। সমস্ত জিনিসপত্র তাতে ভর্তি করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে রেখে হোটেলে গেলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কেরাবিনিয়ারির প্রধান কর্তা এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন: আপনার গাড়ি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কারণ আমি চলে যাচ্ছি।

কিন্তু আপনার তো অনুমতিপত্র নেই।

না, কিন্তু শীগগিরই তা পেয়ে যাবো।

অনুমতিপত্র ছাড়াই চলে যেতে চান?

না।

গেলেও খুব বেশী দূর যেতে পারবেন না।

আমি যাতে চলে না যাই সেজন্য তিনি একজন পুলিশ মোতায়েন রেখে গেলেন। পরে এ-ও জানতে পারলাম যে, আমি যেতে চাইলে আমায় গ্রেফতার করবার জন্য প্রত্যেক পোস্টে তিনি টেলিগ্রাম করে রেখেছেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি পাস ছাড়াই চলে যাবো।

তিনটার সময় কর্নেল মাফালডিয়ার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন যে অনেক চিন্তা করে আমায় অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে। আমি নিহত হলে ইটালিয়ান গভর্নমেন্ট দায়ী হবেন না, আমায় এই মর্মে একটা ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করতে হবে। পুলিশের বড় কর্তা বিরক্তির সাথে আমার পাসপোর্টে অনুমতি লিখে দিলেন।

আনন্দে হোটেলে এসে দেখি একটি আরব যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে বললো: আমার নাম হামিদ। আমি কি আপনার সঙ্গে মিসর যেতে পারি?

তোমার বয়স কতো?

উনিশ বৎসর। আমি মোটর চালাতে জানি।

এতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করলাম না। কারণ আমি নিজেই মোটর চালাতে চাই। কিন্তু একাকী যাওয়াও দুর্বিসহ। তাই রাযী হলাম।

পরদিন ভোরে যাত্রা করবো।

সকালে উঠেই টারবক্সের কাছে গেলাম। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে চড়লাম। হামিদ মোটরেই ঘুমিয়ে ছিলো। তাকে ডেকে জাগালাম। পরে উত্তর দিকের ফটকে গেলাম। এখান দিয়েই মের্জে যেতে হয়। এখান থেকে আশি মাইল। কাঁটা তার দিয়ে ফটক বন্ধ করা ছিলো। শব্দ শুনে আবিসিনিয়ান সার্জেন্টটি এলো। বললো: আপনাকে যেতে না দিবার জন্য কড়া নির্দেশ আছে। আর বিশেষ করে এই সকালে তা' হতে পারে না।

কেন?

এই পথে সাত মাইল দূরে একটা ছোট্ট দুর্গে তিনটি বিদ্রোহীকে গুলী করে হত্যা করা হবে।

আমার যাবার অনুমতি আছে। বলে তাকে তা দেখালাম। সে তা পড়তে না পেরে ফিরিয়ে দিয়ে বললো: এর কিছুই আমি জানি না। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আপনাকে আটকে রাখতে।

পুলিশের কর্তাকে ফোন করা হলো। ফোনে জওয়াব এলো। রাগত স্বরে সে বললো: এর কিছুই আমি বুঝতে পারি না। আপনি যেতে পারেন। বলে সে কাঁটা তারের বেড়া খুলে দিলো। রাস্তা আমার জন্য মুক্ত হলো।

মের্জে যাওয়ার প্রথম পঞ্চাশ মাইল পথ সমতল ভূমির উপর দিয়ে গেছে। তারপরই শুরু হলো পবর্তমালা–ডের্না পর্যন্ত। মের্জ থেকে তিনশো মাইল দূরে। সেখানে ভীষণ যুদ্ধ চলছে।

প্রায় দশ মিনিট গিয়েই পথের বাম পার্শ্বে একটা দুর্গ দেখতে পেলাম। হামিদ বললো: তিনটি আরবকে গুলী করে মারা হবে সেখানে।

তা দেখে যাবে?

হামিদ মাথা নাড়লো। বললো: আমি সে দৃশ্য দেখতে পারবো না। মোটরেই সে বসে রইলো। আমি নেমে তা দেখতে গেলাম।

প্রস্তুতি চলছে। দশটি ইরিত্রিয়ান সৈনিক মার্চ করে পূর্ব দিকের দেওয়ালের কাছে এলো। বেনগাজী থেকে একটা লরী ইরিত্রিয়ান সৈনিকদের কাছে থামলো। সৈনিকদের কাছ থেকে চল্লিশ গজ দূরে আমি দাঁড়ালাম। একজন অফিসার এসে সৈন্যদের কাছে দাঁড়ালো। তারা তাঁকে সামরিক কায়দায় সম্মান জানালো।

তিনটি লম্বা শক্তিশালী আরবকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেখানে আনা হলো। আমি আরো এগিয়ে গেলাম যাতে ভালো করে সব দেখতে-শুনতে পারি। লরী-চালক একজন আরব। সে নিকটে এলো। একজন বন্দী হঠাৎ বলে উঠলো: আহমদ যে!

সালাম চাচা! আপনাকে এখানে এ অবস্থায় দেখতে পাবো তা ভাবিনি কখনো।

আমিও না। বলে সে হাসলো। বললো: কেমন আছিস?

ভালোই।

একটি অফিসার একখণ্ড কাগজ হাতে এনে তা জোরে পড়তে লাগলো। চাচাটি আহমদের সঙ্গে কথা বলে চলেছে–পরিজনবর্গ সম্বন্ধে সব কথা জিজ্ঞেস করছে। অফিসারটি তাকে চুপ করতে বললো।

কথা বলবো না কেন? শীগগিরই তো তা শেষ হবে। আর আপনি যা পড়ছেন তা তো আমার জানাই আছে।

অফিসারটি পড়েই চললো।

আহমদকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো। সৈনিকদের আদেশ দেওয়া হলো। রাইফেল উঠিয়ে তারা এক সঙ্গে গুলী ছুঁড়লো। মুহূর্ত মধ্যে তিনটি আরব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। লাশগুলি লরীতে ভর্তি করে বেনগাজী নিয়ে যাওয়া হলো।

ফিরে এলাম মোটরে। হামিদ আমায় বললো: এ দেখতে গেলেন কেন আপনি?

আমি তা জানতাম না।

এ দেখা আমাদের নিষিদ্ধ। এদের কোনই অপরাধ নেই।

জওয়াব না দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিলাম।

বেনগাজী থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ বেশ ভালো রকমেই গেলাম। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছি। হঠাৎ স্টীয়ারিং বিকল হয়ে গেলো। এদিক-ওদিক ঘুরে শেষটায় গাড়ি পথের পাশে একটা গর্তে পড়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে চলতে লাগলো। কোনো রকমে গাড়ি থামাতে সমর্থ হলাম। কিন্তু মুশকিলে পড়লাম কোন্ দিকে যাবো তাই নিয়ে। গাড়ি চালানোর চেষ্টা করা বিপজ্জনক। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে একটা সামরিক লরী সেখানে এসে উপস্থিত। আমি তাতে করে বেনগাজী ফিরে গেলাম। হামিদ রয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে বোমবারডিকে সমস্ত বললাম। তিনি আমার যথেষ্ট সাহায্য করলেন। বললেন: আমার লরী আর ড্রাইভারকে নিয়ে যান। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে স্টীয়ারিং রড পরিবর্তন করে দেবে।

ড্রাইভারকে নিয়ে দ্রুত চললাম। তখনও বেলা বেশী হয়নি। দুপুরের মধ্যেই আমরা প্রস্তুত হতে পারবো। এবং সেদিন সন্ধ্যায়ই আমরা মের্জে পৌঁছতে পারবো। তাতে আমার সময় বেঁচে যাবে।

চল্লিশ মাইল পথ গিয়েই আমাদের গাড়ির সন্ধান করতে লাগলাম। কারণ এখানে কয়েক স্থানে রাস্তার বড় বড় মোড় ফিরতে হয়। কিন্তু গাড়ি কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি বললাম: এখানেই গাড়ি রেখে গেছি।

আরো আট মাইল পথ গিয়ে আমরা থামলাম। আর অগ্রসর হয়ে লাভ নেই। মোটরটি অদৃশ্য হয়েছে। ড্রাইভার মাথা চুলকিয়ে বললো: আপনি কি নিশ্চিতভাবে জানেন যে এটা বেনগাজী থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে ছিলো?

নিশ্চয়ই। স্পীডোমিটারে তাই উঠেছিলো।

তাহলে গাড়ি চুরি হয়ে গেছে।

না, তা হতে পারে না, কারণ গাড়িটি চলতে পারে না। তাছাড়া হামিদকে তার তদারক করতে বলেছিলাম।

সে তো বেনগাজী ফিরে যেতে পারে না। তাহলে পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হতো।

আমরা পথটি পরীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু গাড়ির চাকার কোনো দাগ কোথাও দেখতে পেলাম না।

চলুন, গাড়ি যেখানে রাখা হয়েছিলো সে স্থানটি দেখি। তাহলেই বুঝতে পারবো গাড়ী কোন্ দিকে গেছে।

খানিক অনুসন্ধানের পর যেখান থেকে গাড়িটা গর্তে পড়েছিলো সে স্থানটি পেলাম। সেখান থেকে গাড়ির চিহ্ন বেনগাজীর দিকেই গেছে। সামনের দিকে যায়নি।

তাহলে তা বেনগাজী ফিরে গেছে।

আমরা ফিরে চললাম বেনগাজীর দিকে। এখান থেকে বেনগাজীর মধ্যে পাঁচটি সামরিক পোস্ট আছে। প্রথম পোস্টটিতে গিয়ে একটি আরব সৈনিককে জিজ্ঞেস করলাম: এ পথে কোনো মোটর যেতে দেখেছো?

না'আম, ইয়া-সিদি। এক ঘণ্টা আগে তা ভীষণবেগে চলে গেছে।

ক'জন লোক ছিলো তাতে?

একজন মাত্র।

নিশ্চয়ই এ হামিদ। পথে তার সঙ্গে আমাদের দেখা হলো না কেন? তা'ছাড়া গাড়ির চাকা এতো ঢিলে ছিলো যে তো চালানো মুশকিল।

আমরা লরী চালালাম। প্রতিটি পোস্টে জিজ্ঞেস করে একই উত্তর পেলাম। ওটাই যে আমার গাড়ি এতে আর সন্দেহ রইলো না।

আমরা গ্যারেজে পৌঁছেই গাড়িটা দেখতে পেলাম। হামিদ পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি নিয়ে তুমি চলে এলে কেন? রাগতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

একটি লোক এসে আমায় বললো যে, রাস্তায় গাড়ি রাখা যাবে না।

তা সত্য নয়। তোমাকে সেখানেই থাকতে বলেছিলাম, পথে আমাদের সঙ্গে দেখাই বা হলো না কেন?

আপনার রওনা হবার দু'মিনিট পরই আমি এখানে পৌঁছি।

কোন্ সাহসে এই বিকল গাড়ি নিয়ে তুমি ফিরে এলে?

দড়ি দিয়ে তা আমি শক্ত করে বেঁধে নিয়েছি।

এবার আমি একাই চললাম। হামিদকে বেনগাজীতে রেখে গেলাম। তিনটায় যাত্রা করলাম। বিনা-বিপত্তিতেই এবার বাবুক দুর্গ পর্যন্ত চলে এলাম। মের্জের পঁচিশ মাইল দূরে একটি পর্বতের পাদদেশে তা অবস্থিত।

ছ'টা বেজে গেছে। ক্রমবর্ধমান অন্ধকার সত্ত্বেও মের্জে চলে যেতে চাইলাম। কিন্তু সেখানকার কমান্ডেন্ট বারণ করলেন। বললেন: রাতে এখান থেকে মের্জে গেলে আপনার জীবন বিপন্ন হবে।

কেন?

অনেক দূর থেকে বিদ্রোহীরা আপনার গাড়ির আলো দেখতে পাবে। আর এ-কথাও জেনে রাখুন যে পর্বতগুলি এদের দ্বারা ভর্তি। আজ রাত আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। কাল এগারোটায় আপনি যেতে পারবেন।

কাল সকালে রওনা হতে পারি না কেন?

কাল এগারোটায় রসদপূর্ণ তিনটি লরী মের্জে যাবে। তাদের সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী থাকবে। তাদের সঙ্গে গেলে আপনার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই।

আমি আরবদের ভয় করি না।

আপনি ওদের জানেন না। ওরা যে কতো দুর্দান্ত তা আপনি ভাবতেও পারেন না। দেখামাত্রই ওরা আপনাকে গুলী করবে।

এখানে আমরা তাঁবু গাড়তে পারি কি?

না, তাও সম্ভব নয়। কারণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহীরা রাতে দুর্গ আক্রমণ করে। দুর্গের বাইরে তাঁবু ফেলতে কিছুতেই দেওয়া যেতে পারে না আপনাকে।

স্থির হলো দুর্গের মধ্যে প্রাঙ্গণে আমার তাঁবু গাড়বো। সারারাত দুটি ইরিত্রিয়ান সৈন্যকে তাঁবু পাহারা দিতে আদেশ দিলেন।

পরদিন এগারোটায় লরী তিনটি ও প্রহরী এসে উপস্থিত হলো।

খুব শান্তিতেই মের্জে পৌছলাম। রাস্তায় কোথাও কোনো জন-প্রাণীর দেখা পাইনি। তবে আমাদের খুব ধীরে চলতে হয়েছে। বেনগাজী থেকে বাকুর পর্যন্ত রাস্তা বেশ ভালো। তারপর থেকেই তা ভয়ংকর রকম খারাপ। পার্বত্য প্রদেশের ভিতর দিয়ে পথ। দু'পাশে পাইনের গভীর জংগল। উপর থেকে নীচে, নীচে থেকে উপরে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। মাঝে মাঝে বন্য প্রাণী দেখা গেলো। একটা লম্বা টিকটিকিও গাছের ডালে শিয়াল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো।

একটায় আমরা মের্জে পৌছলাম।

প্রথমেই দেখা করলাম ক্যাপ্টেন ফোরনারীর সঙ্গে। এর আগের দিন তিনি ফিরেছিলেন। উভয়েই আশ্চর্য হলাম। তিনি বললেন: কাল একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে আপনি এখানে পৌছা মাত্র আপনাকে আটকাতে, আর আজ এই ঘণ্টাখানেক আগে খবর পেলাম আপনাকে যেতে দিতে।

এখনই কি আমি চলে যেতে পারি?

তা কমান্ডেন্ট ডিওডিসির সঙ্গে আলোচনা করে দেখতে পারেন। তাঁর সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো। আপনি থাকবেন কোথায়?

আমার তাঁবুতে।

তা হতে পারে না, এটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। আজকের মতো হোটেলে থাকাই ভালো। একটি মাত্র তো রাত।

হোটেলেই গেলাম।

তিনটায় গেলাম গভর্নমেন্ট অফিসে।

এই পার্বত্য প্রদেশে ইটালিয়ানদের হেড কোয়ার্টার এই মের্জ। কমান্ডেন্ট ডিওডিসি এখানকার কর্তা। তাঁর শান্তিপ্রিয় মনোভাব এবং আরবদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার সাইরেনিকার কর্তা জেনারেল গ্রাজিয়ানীর একনায়কত্বের জন্য বাধাপ্রাপ্ত

হয়েছে। তাই তিনি এ সম্বন্ধে সাধারণত কোনোরূপ অভিমত প্রকাশ করেন না। এ বিষয়ে তিনি খুবই সতর্ক। কিন্তু বহু আরবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমি দৃঢ়ভাবে জানতে পেরেছি যে আরবরা তাঁকে খুব ভালোবাসে। তারা গ্রাজিয়ানীর দলকে ঘৃণা করে। আরবরা আমায় বলেছে যে গ্রাজিয়ানী তাদের রক্ত নিংড়ে বের করতে চায় আর ডিওডিসি আমাদের সঙ্গে শান্তির হাত প্রসারিত করেন।

এ কথা নিশ্চিত যে ইটালিয়ানরা পশু-শক্তি দ্বারা সাইরেনিকার লক্ষ লক্ষ অধিবাসীকে পদানত করতে চেষ্টা করছে। ফরাসী বিপ্লবের ভয়ংকর সময়ে তথায় প্রতিদিন গড়ে তিন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হতো। বছরে তার গড় প্রায় বারোশ'তে দাঁড়ালো। আমার সাইরেনিকা অবস্থানকালে দৈনিক ত্রিশটি আরবের প্রাণদণ্ড হয়ে থাকে। যুদ্ধে নিহত এবং ইরিত্রিয়ানদের দ্বারা নিহতদের সংখ্যা এতে ধরা হয়নি। এ দেশের মাটি এ দেশবাসীরই রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

ডিওডিসির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে, তিনি অন্যান্য ইটালিয়ান সমরনায়কদের মতো দেশের প্রকৃত অধিবাসীদের প্রতি "কুকুর, পশু" ইত্যাদি শব্দ কোনো দিন ব্যবহার করেন না।

সাইরেনিকায় ইটালিয়ান উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপার এমনই নীচ প্রকৃতির যে, যে কোনো ইউরোপীয়ান এসব দেখে শ্বেত জাতি বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করবেন। এখানে আধুনিক প্রথায় যে যুদ্ধ চলছে তা অসভ্যজনোচিত ও নির্মম। অবশ্য ডিওডিসি একমাত্র ব্যতিক্রম।

ক্যাপ্টেন ফোরনারী আমায় ডিওডিসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি দাঁড়িয়ে আমার করমর্দন করলেন। বললেন: আমি বড় দুঃখিত যে কাল সকালেই আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না। কারণ এ দায়িত্ব বড় কঠোর। পরশু সকাল পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। সেদিন একদল সৈনিক সাইরিন যাবে।

তাহলে আমায় একা ভ্রমণ করতে দেওয়া হবে না?

না। বেনগাজী থেকে নির্দেশ এসেছে যে সেই সৈন্যদলের সঙ্গে সাইরিন হয়ে আপনাকে ডের্না যেতে হবে। একজন কর্নেল সেদিন যাবেন, তাঁকে সাইরিন পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখান থেকে আর একদল সৈনিক তাঁকে নিয়ে ডের্না যাবে।

তাহলে কি এই স্থানটি খুবই বিপজ্জনক?

সাইরিন পর্যন্ত খুব বেশী বিপজ্জনক নয়। তা মাত্র একশো পঁচিশ মাইল পথ। সাইরিন থেকে ডের্না খুবই বিপজ্জনক। এদিক দিয়ে গেলেই আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী।

আর ডের্না থেকে মিসর?

তাও খুব বেশী খারাপ নয়। প্রথম আপনাকে তবরুক যেতে হবে। সেখান থেকে মিসরের সাললাম মাত্র কয়েক মাইল দূরে। এ সম্বন্ধে ডের্নার কমানডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

মের্জে দেখবার মতো কি আছে?

শহরে তেমন কিছুই নেই। এই বাড়ীটি তুর্কীদের ছিলো। বাইরে তুর্কীদের কামান এখনো দেখতে পাবেন। তা'ছাড়া শহরটি অতি আধুনিক। আপনি ইচ্ছা করলে কাল শহরের বাইরে বেদুইনদের প্রকাণ্ড বন্দীশালা দেখতে যেতে পারেন। তবে তার বন্দোবস্ত আজ রাতেই করতে হবে। আজ রাতে দয়া করে আমার এখানেই আহার করবেন। ক্যাপ্টেন ফোরনারী আপনাকে আমার গৃহে নিয়ে যাবে।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। নীচের তলায় দেওয়ালে সাইরেনিকা সরকারের কয়েকটি ঘোষণাপত্র টাংগানো দেখলাম। তাদের একটিতে লেখা: মের্জের অধিবাসীদের প্রতি–

২৮শে এপ্রিল ব্যবসায়ী কামেদ বিন মুহম্মদ সরহদী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিশেষ দয়া করে তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে তার প্রতি আজীবন কঠোর পরিশ্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে যেনো কেউ মনে না করে যে তার এই অপরাধের জন্য ভবিষ্যতে আরো দয়া দেখানো হবে। এই ব্যক্তি পর্বতবাসী বিদ্রোহীদের আসবাবপত্র ও আহার যুগিয়েছিলো। এইরূপ অপরাধের শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড।

ছ'টায় আমি আবার কমান্ডেন্টের অফিসে গেলাম। সেখানে ক্যাপ্টেন ফোরনারীর সঙ্গে দেখা হলো। তখনই আমরা রওনা হলাম ডিওডিসির গৃহে। তা খুব বেশী দূর নয়।

আহারের পর তিনি আমায় তাঁর পাঠাগারে নিয়ে গেলেন। তাঁর পুস্তক সংগ্রহ খুবই চমৎকার। বিশেষ করে প্রাচ্য সম্বন্ধীয় পুস্তকের সংগ্রহ। একজন ফরাসী সাংবাদিকের একটা বই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বইটি রীফযুদ্ধের সময় রীফ নেতা গাজী আবদুল করীমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ। বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছি— এমন সময় ডিওডিসি আমায় জিজ্ঞেস করলেন: আবদুল করীম সম্বন্ধে আপনার প্রকৃত ধারণা কি?

আমি তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করি এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে পসন্দ করি। তিনি একজন সামরিক প্রতিভা। সামান্য ক'জন লোক নিয়ে তিনি স্পেনিশদের একটি দুর্গ আক্রমণ করে তার সমস্ত বন্দুক, রাইফেল ও অন্যান্য সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র যা সেখানে ছিলো সব হস্তগত করেন। তারপরই শুরু হলো যুদ্ধ। তিনি একাকী ফরাসী ও স্পেনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ চারটি বৎসর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর সে প্রচেষ্টাকে আমি তাঁর গৌরবময় সাফল্য বলে মনে করি।

হাঁ। বড় অদ্ভুত সে বীরত্ব। এখানকার পার্বত্য বিদ্রোহীদের দমন করতে আমাদের খুবই বেগ পেতে হচ্ছে। রীফ পর্বতমালার চেয়ে এ স্থানটি কি বেশী খারাপ?

না, প্রায় একই ধরনের। অবশ্য সাইরেনিকার পর্বতসমূহ রীফ পর্বতমালার চেয়ে ঘন জংগলে পূর্ণ।

মরক্কো কি বর্তমানে শান্ত?

হ্যাঁ। ফরাসী ঔপনিবেশিক পদ্ধতি আমি বেশ পসন্দ করি। স্থানীয় লোকদের কি করে জয় করতে হয় তা তারা বোঝে।

তা ঠিক। কিন্তু জনগণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি না রেখে।

না কেন?

ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রাচ্যে পাশ্চাত্যের সভ্যতা আমদানী করেছে সত্য কিন্তু সেখানকার কৃষ্টিকে তারা ধ্বংস করেছে। সভ্যতা ও তার ফ্যাক্টরীসমূহের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার পচা ঘা-ও বিস্তার লাভ করেছে। স্থানীয় কারিগরেরা নিজ দেশে আর্টিস্ট বলে গণ্য। অতি অল্পেই তারা তুষ্ট। এই সভ্যতার আওতায় এসে তারাও বস্তুতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। ঠিক ইউরোপের বেশীর ভাগ লোকদের মতো সে অসন্তুষ্ট ও অধঃপতিত হয়, মদ খায় এবং নিজের ধর্মকে অবহেলা করে। সে নিজকে খুব মূল্যবান মানুষ বলে মনে করে।

ডিওডিসি হাসলেন। বললেন: আপনার কথা হয়তো খুবই সত্যি, কিন্তু আমার মনে হয় এ বিষয়টি এখানেই শেষ করা ভালো। কারণ আপনি জানেন যে আমরা এ সম্বন্ধে একমত হতে পারি না।

পরদিন সকালে ডিওডিসি তার গাড়িতে করে আমায় নিয়ে বেদুইনদের ক্যাম্পে গেলেন। মের্জ থেকে তা দু'মাইল দূরে। ডের্নার পথে পর্বতের মাঝখানে বেদুইনদের ক্যাম্পটি অবস্থিত।

ক্যাম্পটি খুব বড়। এতে প্রায় পনেরো শো তাঁবুতে ছ' থেকে আট হাজার লোক বাস করে। চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া। প্রত্যেকটি প্রবেশপথে মেশিনগানের কড়া পাহারা। আমাদের দেখে ছেলেমেয়ের দল দৌড়ে কাছে এলো। তাদের গায়ে ছেঁড়া কাপড়। সবাই ক্ষুধার্ত। কমান্ডেন্ট এলেই তার কাছ থেকে পয়সা নেওয়া তাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। তারা হাত বাড়িয়ে ইটালীয় ভাষায় চিৎকার করে ছুটে এলো: উন্ সোল ডো, সিনোর, উন্ সোল ডো।

ডিওডিসি মোটর থামালেন। পকেটে হাত দিয়ে পয়সা বের করে তাদের দিলেন।

বেদুইনরা আমাদের কাছে এলো। তাদের দেহে ও চেহারায় দৈন্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অনেকেই রুগ্ন কংকাল-সার।

ডিওডিসি আরবীতে তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। পিছন থেকে একটি লোক এগিয়ে এসে বললো: অবস্থা বড় খারাপ ইয়া সিদি। যুদ্ধ যতোদিন চলবে ততোদিন আমরা কি করবো? বদ্দুরা পাহাড় থেকে নেমে এসে আমাদের ভেড়া ও ঘোড়া নিয়ে যায়। আর পশুদের জন্য ঘাস এখানে পাওয়া যায় না। আমাদের পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমিতে যেতে অনুমতি দিলে বড় উপকার হয়।

ডিওডিসি তাকে সান্তনা দিলেন: শীঘ্রই যুদ্ধ শেষ হবে।

হাঁ, আল্লাহ আমাদের প্রতি মেহেরবান হোন। তা না হলে আমাদের অনাহারে মরতে হবে।

ডিওডিসি কোনো উত্তর দিলেন না। ফেরার পথে তিনি বললেন: বাস্তবিকই এরা কৃপার পাত্র! আমরা ওদের টিনে ভর্তি খাদ্য দেই। কিন্তু তা আর কতোদিন দেওয়া যাবে? বেদুইনদের দ্বারা ওরা প্রায়ই আক্রান্ত হয়। তারা এসে আত্মসমর্পণ করার জন্য এদের ভর্ৎসনা করে। কিন্তু এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। আত্মসমর্পণের সময় এদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রও সমর্পণ করতে হয়েছে। তবে আশা করছি এই বীভৎস অবস্থা শীঘ্রই শেষ হবে।

বেদুইনদের বন্দী

পরদিন ভোরে সৈনিকদল রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আগের দিন সন্ধ্যায়ই ডিওডিসির নিকট বিদায় নিয়েছি। ডের্নাযাত্রী কর্নেল যে গাড়িতে বসেছেন তার পিছনে আমার গাড়ি রাখলাম, সৈন্যদলটি বেশ বড়ই ছিলো। দুটি আরমার্ডকারের প্রত্যেকটিতে তিনটি করে মেশিনগান ছাড়াও তিনটি লরীতে ইরিত্রিয়ান সৈনিক ভর্তি। দলের নেতা একজন ইটালিয়ান সার্জেন্ট। রওনা হবার সময় চিৎকার করে সে আমায় বললো: লাইনের মধ্যেই গাড়ি রাখবেন। বেদুইনরা যদিই আমাদের উপর গুলী চালায় তবুও যেনো দ্রুত গাড়ি চালাবার চেষ্টা করবেন না।

আমি তার কথায় সায় দিলাম। রাস্তায় কি ঘটতে পারে ভেবে মনটা একটু দমে গেলো।

পূর্ব সীমারেখায় গাঢ় মেঘ দেখা দিলো। সূর্য তখনও ওঠেনি। আমরা যখন পর্বতের দিকে এগিয়ে চলেছি তখনো বেশ অন্ধকার ছিলো। পর্বতের নিকটবর্তী হচ্ছি আর মেঘও উপরের দিকে উঠছে। সমস্ত পূর্বাকাশ যেনো আগুনের সমুদ্রে পরিণত হলো। পর্বতের দিক থেকে বাতাস বইছে। পর্বত থেকে বন্যফুলের সুবাস বয়ে আসছে। মাথার উপর অতিকায় শকুনের দল বীভৎস চিৎকার করে উড়ে বেড়াচ্ছে। ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। রাস্তা খুবই খারাপ। মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ড। গাড়ি বহু কষ্টে চলছে। কয়েকবার, বিশেষ করে মোড়ের কাছে আমার দস্তুরমতো ভয় হতে লাগলো যে গাড়ি বুঝি থেমে যায়। আধঘণ্টা উপরের দিকে চলে একটা মস্ত বড় চড়াইয়ের কাছে এসে পৌছলাম। দু'পাশে ঘন জংগলপূর্ণ উপত্যকা। সূর্য তখনো এত নীচে যে উপত্যকায় তখনো বেশ অন্ধকার। পর্বতের পাশে অবশ্য আলো আছে। উপত্যকার নীচ থেকে কুয়াশা উঠছে।

সারাদিন আমরা সেভাবেই চললাম। বহুবার গাড়ি মেরামত করে পাঁচটায় পর্বতশ্রেণীর কাছে এসে পৌছলাম। ডানদিকে সেই বিখ্যাত মৃত্যু পরিখা। এখানে বহু যুদ্ধ হয়েছে। মানুষের বহু কংকাল তখনো সেখানে পড়ে আছে।

চড়াইয়ের উপর একটা দুর্গ। নীচে থেকে তাকে একটা চৌ-কোণা বাক্সের মতো দেখাচ্ছে। নিকটে এসে দেখতে পেলাম তা পাহাড়ী বন্দুক আর মেশিনগানে ভর্তি। উপরে ইটালীয় পতাকা উড়ছে।

এটি মারাউয়া দুর্গ। এখানেও বহু বেদুইন আত্মসমর্পণ করেছে। দূরে জংগলের ভিতর স্বাধীন বেদুইনদের ক্যাম্প থেকে ধূয়া উড়ছে। এদেরই ইটালিয়ানরা বিদ্রোহী আখ্যা দিয়েছে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিয়ার্ডি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমি আমার তাঁবু গাড়তে চাইলে অদ্ভুত হাসি হেসে বললেন: না, তা হতে পারে না। আপনি এখন মারাউয়াতে আছেন। আপনাকে প্রাচীরের ভিতর শুতে হবে।

ব্যারাকে একটা রুমে আমায় থাকতে দেওয়া হলো।

সূর্য অস্ত গেলো। কাঁটা তারের বেড়ার বাইরে বেদুইনদের ক্যাম্পে আলো জ্বলছে। এখানকার বেদুইনদের অবস্থা মের্জের বেদুইনদের চেয়ে একটু ভালো বলে মনে হলো। শোবার আগে আমি বেদুইনদের ক্যাম্পে বেড়াতে গেলাম। সেখানে একজন বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলাম: আহমর মোখতার কোথায়?

হেসে সে জওয়াব দিলো: আহমর মোখতার! হাত দিয়ে পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করে বললো: ঐ পর্বত ও উপত্যকার সর্বত্রই তিনি আছেন।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমি দুর্গে ফিরে এলাম। সান্ত্রী অভিবাদন জানালো। ক্যাম্পের দিকে মেশিনগানের মুখ ঘুরিয়ে দিলো। কারণ পর্বতের সর্বত্রই একহাত বিশিষ্ট নেতা আহমর মোখতারের আত্মা ঘুরে বেড়ায়।

এক কাপ কফি খেয়েই পরদিন ভোরে আমরা রওনা হলাম। এবার পথে অধিক বিলম্ব হলো না। সাইরেনিকার পথ ঢালু। দুপুরেই আমরা সেখানে পৌঁছতে পারবো–অবশ্য পথে যদি কোনো বিপদ না ঘটে। কর্নেলের সঙ্গে আমার আলাপ করবার সুযোগ হলো। বেশ ফরাসী বলতে পারেন–ঠিক ফরাসীদের মতো। কিন্তু তিনি তার অন্যান্য ল্যাটিন জাত ভাইদের অত্যন্ত ঘৃণা করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম: ইরিত্রিয়া থেকে সাইরেনিকায় এত অধিক সৈন্য আমদানী করা হয়েছে কেন? উত্তরে তিনি বললেন: কারণ একমাত্র এদের উপরই আমরা নির্ভর করতে পারি। আরবরা অলস আর ওদের বিশ্বাসও করা যায় না। সামান্য উত্তেজনাতেই পালিয়ে যায়। ইরিত্রিয়ানরা আমাদের খুব ভক্ত। আমি বহুদিন ইরিত্রিয়ায় ছিলাম। সেখানে কোনোদিন কোনো গোলযোগ বা বিদ্রোহ হয়নি। ইটালিয়ান সভ্যতার দ্বারা তারা যে কতোটুকু উপকৃত হচ্ছে তা তারা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। আমরা যে অধিক শক্তিশালী একথা বুঝবার আগে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীকে আমাদের হত্যা করতে হবে।

এখানেই আলোচনা বন্ধ করলাম।

পথে অনেক কষ্টে গাড়ি চালাতে হলো। রাস্তার অবস্থা এত খারাপ যে বহু কষ্টে গাড়ি নিয়ে সাইরেনিকা পৌঁছতে পারলাম। গাড়ির অবস্থা দেখে তাকে চেনাই মুশকিল।

ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে সাইরেনিকা বারো মাইল দূরে দুটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এদের মাঝখানে প্রাচীন যুগের রোমান শহরটি মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। গাড়ির স্প্রীং নষ্ট হয়ে গেছে। বহু ব্যয় ও তোষামোদের পর একটা লরীর পুরনো স্প্রীং যোগাড় করলাম।

দু'জন ইরিত্রিয়ান সৈনিক আমায় ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো: সব প্রস্তুত। শীঘ্র চলুন। নিজেরাই আসবাবপত্র আমার গাড়িতে তুলতে লাগলো। তখনো বেশ অন্ধকার রয়েছে। মাত্র চারটা বেজেছে। একজন সৈনিক বললো: এখনই আমাদের রওনা হতে হবে। যেতে হবে একশো পঁচিশ মাইল। সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছতে হবে। এই স্থানটি সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। আমার বিলম্ব দেখে কর্নেল রেগে আছেন–একটা অভিবাদন পর্যন্ত তিনি আমায় করলেন না। গাড়িতে চড়েই তিনি যাত্রার নির্দেশ দিলেন।

ঘণ্টা দু'এক একটা সমতল ভূমি দিয়ে চললাম। তার পরই আবার শুরু হলো পার্বত্য অঞ্চল। তারপর ঘন জংগলের ভিতর দিয়ে চলতে হবে।

স্প্রীং আবার বিকল হলো। বাধ্য হয়ে আমায় থামতে হলো। সব গাড়ি এগিয়ে গেলো। শেষের গাড়ির ড্রাইভার আমার অবস্থা দেখে তার গাড়ি থামিয়ে আমার নিকট এলো। পরে সে চিৎকার করে বললো: জলদি করুন। এখানে একলা থাকতে পারবেন না, স্থানটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।

বুঝতে পারলাম এক ঘণ্টার আগে কিছুতেই আমি নড়তে পারবো না। তাকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললাম। মাথা নেড়ে সে বললো: তাহলে আমায় যেতে হলো। গাড়ি মেরামত হলে আপনি সাইরেনিকায় ফিরে যাবেন। এ স্থানটি বেদুইনে পূর্ণ। হয়তো তাদের হাতে পড়ে যেতে পারেন।

কয়েক মিনিটেই তার গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আমি সম্পূর্ণ একা। তাড়াহুড়া করবার প্রয়োজন নেই। গাড়ির পাশে শুয়ে ভাবছি, হঠাৎ দূরে ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমার চিন্তা ভাঙলো। উঠে বসলাম। কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছু দূরে দেখতে পেলাম একপাল মেষ। সেখানে পৌঁছতে প্রায় পনেরো মিনিট লাগলো–দু'টি ছোট্ট বালক সেই মেষ চরাচ্ছে। আমায় দেখে ছোট ছেলেটি দৌড়ে পালাতে চাইলে বড়টি তার হাত ধরে ফেললো। বড়টির বয়স চৌদ্দ বছর। বললো: কি লজ্জার কথা নাজমি, মেষের তত্ত্বাবধান করতে আমাদের বলা হয়নি?

সে তার লাঠি বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি তাকে থামিয়ে বললাম: আমি তোমাদের মেষ নিতে আসিনি। কিছু দুধ বেচবে?

আপনি ইটালিয়ান। দুধ পেতে হলে আপনার জাত ভাইদের কাছে যেতে হবে।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমি ইটালিয়ান নই, আমার বাড়ী ভিন্ন দেশে।

তার সন্দেহ তাতেও দূর হলো না। বললো: আপনি কি ইটালিয়ানদের জন্য কাজ করেন না?

না, আমি মারাকেশ থেকে আসছি।

মারাকেশ–কোথায় তা আমি জানি না। কোথায় সে দেশ?

বহুদূরে–পশ্চিমে।

ওয়াল্লাহ্! আপনি ত্রাবেলাস থেকে আসছেন?

না। মারাকেশ আরো বহু দূরে।

সে চুপ করে রইলো। পরে একটি মেষ দোহন করে আমায় খানিকটা দুধ দিলো। আমি তা খেয়ে দাম বাবত তাকে কয়েকটি লিরা দিলাম। সে তা ফিরিয়ে দিলো। বললো: এসব আমি চিনি না।

বেদুইনদের মধ্যে যে মুদ্রা প্রচলিত তা আমার কাছে নেই। তাই তাদের মোটরে যেতে বললাম। দেখতে চাইলাম সেখান থেকে তাদের কোন জিনিস দিতে পারি কিনা যা তাদের কাজে লাগতে পারে।

সানন্দে তারা আমার সঙ্গে যেতে রাযী হলো। এখন আর তারা আমায় ভয় করে না। আমি তাদের কিছু চকোলেট দিতে গেলে তারা ইতস্তত করতে লাগলো। কারণ, তারা পূর্বে এর স্বাদ গ্রহণ করেনি। মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিলো। তারপর একটা পুরনো আরবী পোশাক যা মরক্কো থেকে এনেছিলাম তাই নিতে রাযী করালাম। তারা আমার গাড়ি মেরামত করতে যথেষ্ট সাহায্য করলো। গাড়ি মেরামত করতে বেশ বেগ পেতে হলো। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম: তোমরা কোথায় থাকো?

আমাদের লোকজন ঐ পর্বতে–একদিনের পথ দূরে ক্যাম্পে আছে।

তোমরা কি ইটালিয়ানদের ভয় করো না?

হাঁ, ভয় করি। কিন্তু ওরা আমাদের দেখতে পারে না। তারা শুধু ঐ রাস্তা দিয়েই চলাফেরা করে।–আমরা তা থেকে অনেক দূরে থাকি। আর তারা এতো দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যায় যে সাধারণত তাদের কেউ দেখতেই পায় না।

তারা যদি তোমাদের দেখে ফেলে তাহলে তারা তোমাদের কি করবে?

কিছুই হয়তো করবে না। আমরা খুব ছোট্ট কিনা। তারা আমার এক বড় ভাইকে গুলী করে মেরে ফেলেছে। কারণ, নেকড়ের হাত থেকে মেষ রক্ষা করার জন্য তার কাছে একটা রাইফেল ছিলো।

তাদের কাছে বিদায় নিয়ে ডের্নার দিকে রওনা হলাম। এখানকার দৃশ্য খুবই মনোরম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সরু পথ ধরে কখনো উঁচু মালভূমি, কখনো বা পাইন বনের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম।

দুপুরের কাছাকাছি দু'টি পর্বতশ্রেণীর কাছে এসে রাস্তা মিলিয়ে গেছে। পর্বতশ্রেণী ক্রমে উঁচু নিকটতর হয়ে চলেছে–দুটি পর্বতশ্রেণী ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ। মাঝে মাঝে গাছপালা ঢাকা গর্ত।

বেজায় গরম বোধ হতে লাগলো। কেমন যেনো ঘুম পেতে লাগলো। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলাম। প্রথম বুঝতে পারিনি যে এটা গুলীর শব্দ। ভেবেছিলাম গাড়ির কোথাও কিছু খারাপ হয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার শব্দ হলো। একটা বুলেট এসে পেছনে রক্ষিত তাঁবুর কাপড়ে পড়লো। পর্বতের ঢালুর দিকে চাইতেই বাঁ-দিকে গাছের মাথার উপর ধূয়া উড়তে দেখলাম। তখনই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, বেদুইনরা সেখান থেকেই গুলী ছুঁড়ছে। আমি তৎক্ষণাৎ মোটর থামালাম। পরবর্তী বুলেটের আশংকায় আরবদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই লম্বা রাইফেল হাতে দু'টি লোক জংগলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো। তারা রাইফেল বাগিয়ে এগিয়ে আসছে। আমি নড়লেই গুলী করবে। চুপ করে মোটরে বসে রইলাম।

আরো চারজন রাইফেলধারী আরব এসে হাযির। বুকে তাদের বুলেটপূর্ণ বেল্‌ট বাঁধা। গাড়ির খুব নিকটে এসে একজন চিৎকার করে বললো: নির্বিঘ্নে চলে যাবে মনে করেছিলে, না? ইটালিয়ানদের গাড়ি চালিয়ে তোমার মতো বিশ্বাসঘাতক চলে যেতে পারে না।

তার কথা ভালো বুঝতে পারলাম না। সবাই গাড়িতে চড়লো। একটি দীর্ঘকায় লোক–খুব সম্ভব এদের দলপতি–আমায় জিজ্ঞেস করলো আমার যন্ত্রপাতি কোথায় লুকিয়ে রেখেছি। আমি তাকে সত্য কথা বললাম যে আমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। সবাই মিলে গাড়িতে সন্ধান করতে লাগলো। একটি যুবক আমার উপর নযর রাখলো।

অস্ত্রের সন্ধান শেষ করে তারা আমার হাত পেছন দিকে শক্ত করে বাঁধলো। আমায় গাড়ি থেকে নামিয়ে বসতে বললো। চাপাস্বরে নিজেদের মধ্যে কতোক্ষণ আলাপ করলো। তাদের কথা ভালো করে বুঝতে পারলাম না। এদের ভাষা ত্রিপোলী বা বেনগাজীর আরবী থেকে ভিন্ন ধরনের। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে তারা পরামর্শ করছে কি রকম মৃত্যু আমার উপযুক্ত হবে।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর কালো দাড়িওয়ালা লোকটি আমায় একটা লাথি মেরে বললো: কোন্ জাতের কুত্‌তা তুই?

তাদের বুঝিয়ে বললাম যে আমি আফ্রিকান নই। বহু দূর–উত্তর ডেনমার্ক দেশ থেকে আমি আসছি।

ইটালিয়ানদের গাড়ি চালাচ্ছিস কেন তবে?

এটা ইটালিয়ানদের গাড়ি নয়। এটা আমার নিজের গাড়ি। আর আমি আসছি মরক্কো থেকে।

তুমি ত মুসলিম নও, তবে লাল টুপী পরেছ কেন?

হ্যাঁ, আমি মুসলিম। আমি মিসর যাচ্ছি। সেখান থেকে মক্কা যাবো।

সরদার অন্যদের সঙ্গে আরো আলোচনা করে পরে বললো: তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমরা যাতে তোমার কোনো অনিষ্ট না করি সেজন্যই তুমি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিচ্ছো, এবং আরবী পোশাক পরেছো। তুমি একজন ফ্রান্স। এই পর্বতে আমাদের ধ্বংস করতে এসেছো।

আমি তাকে বললাম যে, আমি সত্য কথাই বলছি। কিন্তু সে তা বিশ্বাস করছে না।

মৃত্যু তোমার নিশ্চিত। আমাদের কত্তে ভাইকেই না তোমরা হত্যা করেছো।

একজন আমার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত হলো। ভাবলাম এই বুঝি আমার শেষ। নেতাটি কি ভেবে বললো: মুসলিম হলে তুমি নিশ্চয়ই কুরআন পড়তে জানো। যে-কোনো একটি সূরা বলো শুনি।

আমি একটি সূরা আবৃত্তি করলাম। আবৃত্তি শেষ হলে নেতাটি অন্যদের বললো: একদিনে ও এসব শিখেনি।

আমি আশান্বিত হলাম। বললাম: আমি এখানে এসেছি শুধু আপনাদের জীবন ধারণের প্রথা জানবার জন্য। ইউরোপ আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ইউরোপ কি?

সেখানে ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য জাতের লোক বাস করে।

ইটালিয়ানরাও সেখানে থাকে?

ওরা ওদের রুমী বলে। আমি জওয়াব দিলাম: হাঁ, কিন্তু আমি ইটলিয়ান নই। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের লোক আমি।

আপনার কথা সত্য হলে আপনার সম্বন্ধে কি করা হবে তা বিবেচনা করা হবে। আপনাকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাবো। কি করা হবে সেখানেই তা ঠিক করা হবে।

আমি যে সত্য কথা বলছি তার প্রমাণ সহজেই পাবেন। আমার আসবাবপত্রের মধ্যে আমার কুরআন শরীফ আছে।

আপনার সঙ্গে কুরআন শরীফ আছে? সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো।

আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেইনি। বড় খারাপ কাজ হতো তাহলে। আল্লাহ তাহলে আমাদের ক্ষমা করতেন না।

তারা আমার হাতের বাঁধন ছেড়ে দিলো। এবার থেকে তারা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে লাগলো। অবশ্য তখনো তাদের সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয়নি। গাড়িটা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে উপরে উঠতে লাগলাম। ঘন্টাখানেক চলবার পর নেতাটি সূর্যের দিকে চেয়ে বললো: আসরের নামাযের সময় হয়েছে। আপনি কি আমাদের সঙ্গে নামায পড়বেন?

আমি সম্মতি জানালাম। কাছেই ছোট্ট একটা নালা ছিলো। তাতেই ওযু করে নামায পড়লাম। ইমামতি করলেন নেতা নিজে। নামায শেষ হলে তিনি আমাকে

কুরআন থেকে খানিকটা পড়তে বললেন, কারণ তাদের কেউই কুরআন পড়তে জানে না। আমি কুরআন পড়লাম। চুপ করে গম্ভীরভাবে তারা তা শুনলো।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা চললাম। সেখানেই আমরা রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করলাম। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে আমি নেতাকে জিজ্ঞেস করলাম: ইটালিয়ানরা আপনাদের দেখতে পারে সে ভয় আপনাদের নেই?

না। অনেক সৈন্যসামন্ত এবং দ্রুত গুলী চালনাকারী বন্দুক ছাড়া ওরা শহরের বাইরে আসতে সাহস পায় না। আর অন্ধকারে ওরা আমাদের আক্রমণ করতে ভয় পায়।

আর একজন বললো: আপনি তো ওদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। ওরা আমাদের সম্বন্ধে কি বলে?

ওরা বলে যে, পর্বতের বাসিন্দারা তাদের বন্দীদের প্রতি অত্যন্ত নির্মম ব্যবহার করে।

নেতা অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন: এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আপনি একজন সাচ্চা মুসলিম। আপনি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। আমি আপনাকে বলছি,– আল্লাহর নামে বলছি, যা বলবো তা খুবই সত্যি কথা। আমি চিরকাল পর্বতে বাস করতাম না। আমাকে তাড়া করে এখানে আনা হয়েছে। কারণ এ ছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিলো না। আমার ওয়েসিসে ভীষণ বিপদ দেখা দিলো। এই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে মস্তবড় মরুভূমি। সেখানে বদ্ জীন বাস করে। সেখানকার সমস্ত কূপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কুফ্‌রা পর্যন্ত শুধু মরুভূমি। তারপর আরো দক্ষিণেও মরুভূমি। এর পর কি সব দেশ আছে তা আমার জানা নেই। সেখানে কালো লোকদের বাস। এই পর্বতের অল্প দূরেই সেই ওয়েসিস। সেখানেই আমার পিতা বাস করতেন। পুরুষানুক্রমে সেখানেই তাদের বাস ছিলো। খুব সুখে আমরা সেখানে থাকতাম। আমার এক পুত্র ছিলো–আল্লাহই শুধু জানেন সে এখন কোথায়। মেয়েও ছিলো একটি, বড় ভালোবাসতাম তাকে। খুব সুন্দরী ছিলো।

আমরা সবাই চুপ করে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। চোখ তার অশ্রুসিক্ত। তিনি বলতে লাগলেন: যা ঘটেছিলো তাতেই কাফিরের জাতি আমাদের দেশ অধিকার করেছে। তাদের প্রতি আমার হৃদয় পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। বড় সুখে, বড় শান্তিতে আমরা সেই ওয়েসিসে বাস করতাম। আমার অবস্থাও ছিলো বেশ ভালো। একশোর উপর ছিলো আমার উট। সাইরেনিকায় তখন যুদ্ধ চলছে। সময় সময় আমাদের যুবকরা পর্বতবাসীদের সাহায্যের জন্য সেখানে যেতো। এর বেশী আমরা কিছু জানতাম না, কিন্তু একদিন–

আমার নেতৃত্বে কিছু লোক পার্শ্ববর্তী এক ওয়েসিসে একটা বড় উৎসবে যোগদান করতে যাই। তিন দিনব্যাপী সে উৎসব চলে। উৎসব শেষে আমরা ফিরে আসি। প্রথমই আমার স্ত্রীকে দেখতে পাই। সে দৌড়ে আমার কাছে এলো। চোখে তার শংকার ছাপ। চুল এলামেলো–কাপড় ছেঁড়া। চিৎকার করে সে বললো: বাড়ী এসো না, তোমরা কেউ বাড়ী এসো না।

চিৎকার করে সে কেঁদে উঠলো। আর কোনো কথা তার মুখ থেকে বের হলো না। আমি উট থেকে নামলাম। আমার ভাই এলো। বললো: মুহম্মদ মারা গেছে।

মারা গেছে? সে তো অসুস্থ ছিলো না?

না, তা নয়। তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ইটালিয়ানরা এখানে এসেছিলো। তারা প্রত্যেক পঞ্চম ব্যক্তিকে গুলী করে মেরেছে, কারণ আমরা আত্মরক্ষা করেছিলাম।

আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লাম। কোনো কথা বলতে পারলাম না। আমার ভাই বললো: আয়েশা চলে গেছে।

আয়েশা আমার মেয়ে। আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। চিৎকার করে বললাম: বলো সে কি মরেছে? সে মাথা নাড়লো। বললো: না। কয়েকটি ইরিত্রিয়ান সৈন্যসহ একটা ইটালিয়ান সার্জেন্ট এসেছিলো। তাঁরা সব উট নিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আয়েশাকেও।

আমার বংশকে কি এই লজ্জার হাত থেকে তুমি বাঁচাতে পার নাই? তুমি জানো আমি তাকে কতো ভালোবাসি। আমার নামে এই কলংক স্পর্শ করবার আগে কি তুমি তাকে হত্যা করতে পারো নাই?

অনেক পর তা আমি জানতে পারি। ইরিত্রিয়ান সৈন্যরা সর্বত্র কড়া পাহারা রেখেছিলো।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো কথা বলতে পারি নাই। পরে বললাম: তুমি আমার স্ত্রী আর ছেলেকে দেখো। আহমদের বয়স মাত্র নয় বছর, সে তার মার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। আমি আয়েশার খোঁজে চললাম।

একটি মাত্র উট নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি জানতাম না যে আমি আবার তাকে দেখতে পাবো। কয়েক মাস ধরে বহু শহরে খুঁজলাম। অবশেষে একদিন তাকে পেলাম। ডের্নার এক বেশ্যালয়ে তাকে রাখা হয়েছে।

আমায় সে চিনতে পারলো। আমি তাকে আমার সঙ্গে চলে আসতে বললাম। সে মাথা নেড়ে অনিচ্ছা জানালো এবং কাঁদতে লাগলো। বললো: বাবা, আমি অসুস্থ। এ অসুখ থেকে আর ভালো হবো না।

আয়েশা, আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। তুমি এখানে কি করে এলে?

ইটালিয়ানরা জোর করে আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। তারাই আমায় এখানে রেখেছে।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। বললো: বাবা, আমায় মেরে ফেলুন। আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারবো না। আপনি আমায় হত্যা করলে সকল দুঃখের অবসান হয়।

তাই আমি তাকে হত্যা করি। তার মস্তকে চুম্বন করে পালিয়ে আসি এই পর্বতে। যে ইটালিয়ানই আমার সামনে পড়বে তার মৃত্যু নিশ্চিত। আমি যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে আপনি ইটালিয়ান তাহলে আমার প্রথম গুলীতেই আপনি নিহত হতেন। আপনার মাথায় লাল টুপী দেখে অপেক্ষা করবার ইচ্ছা করলাম।

সবাই চুপ। আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। আমার প্রাণে গভীর বেদনার সৃষ্টি হলো। তিনি বলে যেতে লাগলেন: আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলছি, এখানে এমন কেউ নেই যে আপনাকে তার সম্পর্কে এমনি নির্মম কাহিনী শোনাতে না পারে। এরই জন্য আমরা আত্মসমর্পণ করি না। তাই রাইফেলের বেরেল তেতে না উঠা পর্যন্ত আমরা গুলী ছুঁড়তে বিরত হই না। তাদের মেশিনগানের গুলীতে মরতে আমরা ভয় পাই না। উপবাস বা অন্য কোনো অভাবেই আমাদের দমাতে বা নিরুৎসাহ করতে পারে না। আমরা শেষ লোকটি পর্যন্ত লড়াই করবো। আমরা সবাই আল্লাহ্‌কে ভালোবাসি, কিন্তু এই সব সাদা পশুদের ঘৃণা করি। এরা আমাদের এত অনিষ্ট করে যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। হামিদ, তুমি এখানে কেন?

আমার ভাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

আর আবদুল্লাহ, তুমি?

ওরা আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে যে, এ ধন যে আমার তার কোনো দলিল নেই।

আর তুমি মুহম্মদ?

আমার বাবা আর ভাইকে গুলী করে মেরেছে।

আলী, তুমি?

ওরা আমায় শহরে বন্দী করে রেখেছিলো।

আবদুল্লাহ, তুমি?

ওরা আমায় পঁচিশ বছরের জন্য লবণের খনিতে নির্বাসিত করেছিলো। আমি পালিয়ে এসেছি!

সরদার আবার আমার দিকে ফিরে বললেন: শুনলেন তো সব? এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। আপনি যদি ইটালিয়ানদের বেতনভোগী হতেন তাহলে আপনাকে হত্যা করা কি আমাদের উচিত হতো না?

হ্যাঁ। তবে আমি তা নই। আমার পোশাক দেখেই বুঝতে পারছেন যে, আমি সাইরেনিকা থেকে আসছি না। আমার পোশাক মরক্কোর।

তা আমি অনেক আগেই লক্ষ্য করেছি এবং এরই জন্য আমি আপনাকে কুরআন পড়তে বলেছিলাম। আপনাকে যেতে দিলে কোথায় যেতেন?

ডের্না।

সেখান থেকে আপনি মিসর যেতে চান?

হ্যাঁ, যতো শীঘ্র সম্ভব।

তিনি অন্যদের সঙ্গে কানাকানি করে কথা বললেন। পরে আমায় বললেন: আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি, কারণ আপনি বাস্তবিক সাচ্চা মুসলিম। একথা আপনি আমাদের ভয়ে বলেননি। এখান থেকে আমাদের ক্যাম্প আরো তিন দিনের পথ। আপনি যদি কালই আপনার মোটরের কাছে ফিরে যেতে চান এক শর্তে তা করতে পারেন। আপনি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন যে, আপনি আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছে সিদি ইদরিস সেনৌসীর সঙ্গে দেখা করবেন। তিনিই সাইরেনিকার প্রকৃত আমীর। তাঁকে বলবেন যে, শেষ লোকটি পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করে যাচ্ছি। আপনি প্রতিজ্ঞা করছেন তো?

আল্লাহর নামে আমি কসম করছি।

কাল আহমদ ও আবদুস সালামের সঙ্গে আপনার গাড়িতে ফিরে যাবেন।

তারা সবাই মাটিতে শুয়ে ঘুমালেন। শিশুর ক্রন্দনের মতো হায়েনার চিৎকার নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ভেসে আসছে।

প্রভাতে আমি অন্যদের আগেই জেগে উঠলাম। তখনো বেশ অন্ধকার রয়েছে। একজন মাত্র আমার আগে জেগেছে। আমি সবার দিকে চাইলাম। অঘোর ঘুমে তারা মগ্ন। দেহ তাদের শীর্ণ, কিন্তু এ সত্ত্বেও এই ঘুমন্ত অবস্থায়ও এদের চেহারায় ফুটে উঠেছে অদ্ভুত প্রশান্তিকর ছায়া, আর স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন। বুঝলাম কেমন করে হেলায় এই সব দুর্ধর্ষ বীর মৃত্যুবরণ করতে পারে। এদের সঙ্গে একদিনের সাহচর্যেই বুঝতে পারলাম কতো আন্তরিকতার সঙ্গে তারা তাদের ধর্ম পালন করে। তাদের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন–কোনো অবস্থাতেই তারা আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করে না। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও এরা তাদের জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ জানায়, এবং যে-কোনো দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌র নামে তারা হাসিমুখে সহ্য করে থাকে। এই সব ঘুমন্ত বীর নিতান্ত দরিদ্র আর অজ্ঞ। তারা লেখাপড়া জানে না, এমন কি নিজেদের নামটি পর্যন্ত বানান করতে পারে না, কিন্তু ভদ্রতায় আর বীরত্বে এদের চেয়ে মহৎ লোক খুব কমই দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ফজরের নামাযের সময় হয়ে এসেছে। জাগ্রত আরবটি সকলকে ডেকে জাগালো। নামায পড়ে সবার নিকট ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। আহমদ ও আবদুস সালাম আমার সঙ্গে চললো। বিদায় বেলায় সরদারকে বললাম: আপনার সঙ্গে আসায় আহমর মোখতারের সাথে সাক্ষাৎ হবে বলে আমার খুবই আশা হয়েছিলো।

সরদার মুচকি হাসলেন।

আপনি তাকে দেখতে পেতেন না। এখন তিনি বহু দূরে–পর্বতের কেন্দ্রস্থলে আছেন।

তিনিই কি আপনাদের পরিচালিত করেন?

হ্যাঁ, তবে তিনি সিদি ইদরিস সেনৌসীর ডেপুটি মাত্র।

আপনারা সংখ্যায় কতো হবেন?

আমি নিজেই তা জানি না। হয়তো কয়েক হাজার হবে। সারা দেশে তারা ছড়িয়ে আছে। অনেকেই নিহত হয়েছে। আমরা এসেছিলাম দশজন। এখন বেঁচে আছি এই ছ'জন। আপনার আসার আগে একটি সৈন্যদল মোটরে করে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ছিলো। তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে সেই চারজন নিহত হয়।

হেসে তিনি আমায় করমর্দন করে বললেন: আস্‌সালামু আলায়কুম। আপনি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছেন সেজন্য নিজকে পরম ভাগ্যবান মনে করবেন। আপনিই প্রথম আমাদের হাত থেকে বেঁচে গেলেন।

যা শুনলাম তাতে আপনারা যদি আমায় গুলী করে মেরে ফেলতেন তাতে কোনো অন্যায় হতো না।

ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন: আল্লাহই শুধু আপনার অন্তরের কথা জানেন। আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। ইটালিয়ানদের হাতে আমাদের কেউ পড়লে তার সঙ্গে যে কিরূপ ব্যবহার করা হবে তা আমি বেশ জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

তারা সবাই আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। আহমদ, আবদুস সালাম ও আমি রওনা হলাম আমার মোটরের উদ্দেশ্যে। দুপুরের কিছু আগেই সেখানে পৌঁছলাম। আমরা একসঙ্গে আহার করে বেদুইন সঙ্গীদের কাছে বিদায় নিলাম। বহুক্ষণ তাদেরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তারা একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে রইলো। তারপর তারা অন্তর্হিত হলো। আবার আমি সঙ্গীহীন হলাম।

স্থানটি অত্যন্ত দুর্গম। ছোট ছোট টিলা ও ঝোপঝাড়ের পাশ কাটিয়ে প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগলো হয়তো অন্য কেউ এখনি বুঝি গুলী করবে। যে কোনো অনিয়মিত আরব সৈন্যদলের সঙ্গে যে কোনো মুহূর্তে দেখা হয়ে যেতে পারে। একথা নিশ্চিত করে বলা চলে না যে, এবারও পূর্বের মতো ভালো ও সহৃদয় ব্যবহার পাবো। কিন্তু কোনো বিপদ হয়নি। তিনটার সময় একটা দুর্গে এসে পৌঁছলাম। খুব একটা খাড়া পথে এগিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার বাইরে মোটর থামালাম। ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলেন। উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি আসছেন কোথা থেকে?

ইটালিয়ান ভাষা আমি বুঝি না।

তাতে তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন: বিদেশী! বলে একজন জার্মান ভাষা-জানা ইটালিয়ান সৈনিককে ডেকে তার মারফতে কথা বলতে লাগলেন। সৈনিকটি জিজ্ঞেস করলো: ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

সিরিনি থেকে।

আপনাকে একা আসবার অনুমতি কে দিলো?

আমার পাসপোর্টের বলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পাসপোর্টটি নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে তিনি দেখলেন। পরে বললেন: এতে আপনাকে একা আসবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

একটি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এসেছিলাম। আমার মোটর খারাপ হয়ে পড়ায় তারা আমার জন্য অপেক্ষা করেনি। আমায় পিছনে ফেলে চলে আসে।

বড় অদ্ভুত! কোথায় তা ঘটেছিলো?

সিরিনি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে।

সেখান থেকে আপনি একাকী এসেছেন–সেই ভীষণ বিপদসংকুল স্থান দিয়ে?

ক্যাপ্টেন আরো উত্তেজিত হয়ে বললেন: কোনো বেদুইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো?

হ্যাঁ।

তারা আপনার কোনো অনিষ্ট করেনি?

কিছুই না।

সাহেব কি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সিরিনি এসেছেন?

হ্যাঁ, আমি মিসর যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

আমি তা বলছি না। আরবদের সঙ্গে মিশবার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি?

আরবদের সম্বন্ধে জানবার আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। তা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আপনি আরবী বলতে পারেন?

পারি।

বেশ অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

গতকাল প্রহরীদের চারজন নিহত হয়েছে। কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া বিদ্রোহীরা যে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে তা তো মনে হয় না। আপনার সঙ্গে কি কি কাগজপত্র আছে তা আমায় দেখাবেন কি?

বলে তিনি আমার পকেট অনুসন্ধান করলেন। পরে একজন সৈনিককে ডেকে বললেন: ফ্রানসেসকো, গাড়িতে কি কি আছে তালাশ করে দেখো তো।

সৈনিকটি তন্নতন্ন করে দেখলো, কিন্তু কিছুই পেলো না। শুধু আরবী কুরআন শরীফ পেলো। তাই সে ক্যাপ্টেনের হাতে দিলো। পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি বললেন: এটা কি আপনার?

হ্যাঁ।

এটা আপনার সঙ্গে রাখেন কেন?

কারণ আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

আপনার দেশ কোথায় তা জানি না। সেখানকার অধিবাসী কি মুসলিম?

না। আমার দেশে যে কেউ যে কোনো ধর্ম মেনে চলতে পারে।

সে দেশের সবাই খ্রিস্টান হলে আপনিও খ্রিস্টান হলেন না কেন?

কারণ ইসলামকেই আমি খাঁটি ধর্ম বলে বিশ্বাস করি।

বেশ, আপনাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। আমি ডের্নায় ফোন করতে যাচ্ছি। ফ্রানসেসকো, ততোক্ষণ তুমি এর উপর লক্ষ্য রেখো।

ফ্রানসেসকো আমার গাড়ির পাশে দাঁড়ালো– রাইফেল হাতে নিয়ে। সোয়া ঘণ্টা পর ক্যাপ্টেন ফিরে এসে বললেন: ডের্নার জওয়াব পেয়েছি, কাল সকালে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে। তবে আপনার সঙ্গে কিছু প্রহরী দেবো, তারা আপনাকে কমিশনারের কাছে পৌঁছে দেবে। আজ রাত্রে আপনি কোথায় শোবেন?

আমার তাঁবুতে।

তা বেশ। তাই ভালো হবে।

কাঁটা তারের বেড়ার ভিতর ময়দানে তাঁবু গাড়লাম। সারা বিকেল বেলাটি ইরিত্রিয়ান সৈনিকরা আমার তাঁবুর পরদা সরিয়ে ঘন ঘন আমায় দেখতে লাগলো। তাতে বেশ আমোদ বোধ করলাম। সন্ধ্যায় শান্তিতে থাকতে পেলাম। তবুও চারজন ইরিত্রিয়ান সৈনিক আমার পাহারায় মোতায়েন করা হলো।

পরদিন সকাল দশটায় আমি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলে ক্যাপ্টেন দুজন সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলেন। তিনি তাদেরে আমার গাড়িতে উঠাবার আদেশ দিলেন। একজন ফ্রন্ট সিটে আমার পাশে বসলো, অন্য জন বসলো পিছনের সিটে। আমরা ডের্না রওনা হলাম। প্রহরীদের উপর কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনারের হাতে আমাকে সমর্পণ করতে। এতে আমি কিছু মাত্রও ঘাবড়াইনি। গুবা অর্থাৎ যেখানে গতরাতে ছিলাম সেখান থেকে ডের্নার মধ্যবর্তী স্থানটি বেদুইনদের আড্ডা। এবার যদি তারা আমায় দেখতে পায় তাহলে আর রক্ষা নেই। কারণ, এবার আমার সঙ্গে রয়েছে দুজন প্রহরী।

প্রহরীদ্বয়ও খুব খুশী ছিলো না। সারাটি পথ তারা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছে। আমার পাশে যেটি বসেছিলো সে আমায় জিজ্ঞেস করলো: ওরা বলছে যে, আপনি এল-মাহাফদিয়াকে দেখেছেন?

হ্যাঁ।

তারা সকলকেই হত্যা করে।

তারা আপনাকে হত্যা করেনি কেন?

কারণ আমি মুসলিম।

ক্যাপ্টেনও তাই বললেন। আমরাও তো মুসলিম, কিন্তু তারা আমাদের দেখলেই মেরে ফেলবে।

হ্যাঁ,–একথা ঠিক। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করছি না। তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি তাদের দুশমন নই।

প্রহরীদ্বয় চুপ করলো।– অপরাধীর নীরবতা।

তখনো পর্বতের ভিতর দিয়ে চলছি। গুবা থেকে ডের্না চল্লিশ মাইল। পঁচিশ মাইল পথ আসতেই পর্বত খাড়াভাবে সমতলের দিকে নেমে গেছে। সেই সমভূমিতেই ডের্না অবস্থিত। প্রহরীদ্বয় শক্ত করে তাদের রাইফেল ধরলো। আমার পাশেরটি চিন্তিতভাবে বললো: এ স্থানটিই সবচাইতে বিপজ্জনক–বেদুইনে ভর্তি।

রাস্তা নীচের দিকে চলে গেছে। একদিকে ভীষণ চড়াই, অপরদিকে ঝোপ আচ্ছাদিত খাদ। প্রহরী অস্থির হয়ে উঠেছে। বললো: আপনি কি করে গাড়ী থামান?

কেন?

ওরা যদি পাহাড় থেকে গুলী করে তাহলে তারা প্রথমেই আপনাকে লক্ষ্য করবে। আপনি যদি আহত হন আমরা পড়বো যেয়ে খাদে।

আমি আহত হলে তুমি যেখানে আছো সেখান থেকে গাড়ি থামাতে পারবে না।

ভয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে গেলো। খুব বেগে গাড়ি নীচে নেমে চলছে– ঘন ঘন ঘুরতে হচ্ছে মোড়ের কাছে। আমরা পর্বতের একটা গভীর স্থানের কাছে এসেছি এবং সেখান থেকে এক পাশে ঘুরছি। ঠিক সেই সময় দেখতে পেলাম যে, পনরো গজ সামনেই রাস্তা বন্ধ। বড় বড় পাথর দিয়ে রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। বাঁধটি প্রায় এক গজ উঁচু। দ্রুত ধাক্কা লাগলেই মোটর এবং আমরা নিশ্চিতভাবে চুরমার হয়ে যাবো। বড় মুশকিল। মোটর থামাবার সময় নেই। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার বাম দিকে প্রায় কুড়ি গজ গভীর একটা খাদ–বেজায় খাড়া। রাস্তার একদম কিনারায় গাড়ি ঘুরিয়ে দিলাম। গাড়ি সোজা কুড়ি গজ নীচে নেমে গেলো, কিন্তু উলটে পড়লো না। নীচে গিয়েই একটা বড় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। সামনের দু'টি চাকাই সে ধাক্কায় ফেটে গেলো।

ভীত-সন্ত্রস্ত সৈনিকদ্বয় লাফিয়ে পড়লো। মুখ তাদের পাংশু বিবর্ণ। উভয়েই চিৎকার করে বলে উঠলো: চলো, এক্ষুনি পালাই। বিদ্রোহীরা পাথর দিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা গুলী করা শুরু করতে পারে।

আমি গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করলাম। ইঞ্জিন ভালোই আছে। সামনের বায়ুহীন চাকা দু'টির জন্য মোটর চালাতে পারলাম না। আমি তাদের বললাম যে, প্রথমে চাকা দু'টি মেরামত করতে হবে। তাতে দু'ঘণ্টা লাগলো। ওরা অস্থির হয়ে উঠলো। কিন্তু এল-মাহাফদিয়া দেখা গেলো না। সূর্যাস্তের পূর্বেই তারা কুয়াশার মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গাড়ি চালিয়ে রাস্তায় নিয়ে এলাম। পঞ্চাশ গজ গিয়েই তা সমতল ভূমিতে নেমেছে। পরবর্তী পাঁচ মাইল নির্বিঘ্নে চলে ডের্না পৌঁছলাম।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ডের্নাকে ভূ-স্বর্গ বলা চলে। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত এই শহরটি আবহাওয়ার দিক দিয়ে আফ্রিকায় অতুলনীয়। সুন্দর সুশোভিত ফুলের বাগান আর উৎকৃষ্ট ফলের জন্য তা জগদ্বিখ্যাত।

ইটালিয়ান অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পার্বত্য লোকেরা যেভাবে ইসলামের অনুসরণ করে তাদের সেই ধর্মীয় কঠোরতা এখানে বেশ খানিকটা শান্তভাব ধারণ করেছে। উত্তর আফ্রিকার আর কোথাও এখানকার মতো এমন নিয়মানুগভাবে ইসলামকে অনুসরণ করা হয় না। এখানে সেনৌসীর শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। দয়া ও সৌন্দর্যানুভূতি এখানকার লোকদের মতো আর কোথাও দেখিনি। দয়া ও সৌন্দর্যাবোধকেই তারা সবার উপর স্থান দেয়। এখানে কুসংস্কারকে প্লেগের মতো ঘৃণা করে।

ডের্নার চারদিক উচ্চপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিগত ক'বছর ধরে এটাকে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। প্রাচীর এতো উঁচু যে খুব তৎপর বেদুইনই শুধু তা ডিঙ্গাতে পারে। প্রত্যেকটি মোড়ে একটি করে ফটক। প্রতিটি ফটকেই প্রহরী মেশিনগান ভর্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ইউরেপীয় সভ্যতার কৃষ্ণকায় প্রতিনিধিরা–কেউ যাতে বিনা-অনুমতিতে বাইরে যেতে বা ভিতরে আসতে না পারে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাই এদের প্রধান কর্তব্য। আমি প্রহরীদ্বয়সহ মোটর চালিয়ে গেলাম। এতোক্ষণে তারা তাদের সাহস ফিরে পেয়েছে। আমরা সিরিনির দিকের ফটকে চললাম। তারা আমায় সোজা কমিশনারের অফিসে যেতে বললো।

ডের্নার আরব রাস্তা দিয়ে চলেছি। রাস্তাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তার পরই ইউরোপীয়ানদের আবাস ছিলো। সেখানে মাত্র তিনটি বাড়ী আর একটি হোটেল। আমরা অবশেষে কমিশনারের অফিসে এসে পৌঁছলাম। ফ্যাসিস্ট প্রতীকসহ ইটালিয়ান তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে অফিসের উপর।

এখান থেকেই জনকয়েক ইটালিয়ান সারা ডের্না শাসন করে।

দরজার সামনে গাড়ি থামালাম। একজন প্রহরী মোটরে রইলো, অন্যটি আমার সঙ্গে অফিসে ঢুকলো। তখনই কমিশনারের সঙ্গে দেখা হলো। প্রহরীকে বিদায় করে তিনি আমায় তার সম্মুখস্থ ইজি চেয়ারে বসতে বলেন। ভাঙা ফরাসীতে তিনি কথা বললেন: আমি শুনতে পেলাম যে, আপনি প্রহরী ছাড়াই নাকি এসেছেন?

হ্যাঁ। কারণ আমার গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। সৈন্যদল আমায় পরিত্যাগ করেই চলে আসে।

আপনি নাকি বিদ্রোহীদের দেখা পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনার এই মোটর ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি?

প্রথম উদ্দেশ্য, আমি যা দেখছি সে সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত সারা আফ্রিকা ভ্রমণ করা।

আপনি আরবী ভাষা বলেন এবং আরবী পোশাক পরেন কেন?

প্রথমত আমি আরবদের সম্বন্ধে জানবার জন্য আগ্রহান্বিত এবং দ্বিতীয়ত, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এর জন্যই কি বেদুইনরা আপনার কোনো অনিষ্ট করে নাই?

আমার তো ধারণা তাই। তা'ছাড়া আমি নিরপেক্ষ ব্যক্তি। আরবদের কৃষ্টিগত জীবনেই আমার আগ্রহ, তাদের রাজনৈতিক ব্যাপারে নয়। বেদুইনদেরে একথাও আমি বলেছি যে, তাদের প্রতি আমার কোনো দুশমনি নেই। তাই তারা আমার কোন অনিষ্ট করে নাই।

বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি হাসলেন, বললেন: আমি তবরুকের লোক। সরলভাবেই বলছি যে আমি আপনার কথা বুঝতে পারি নাই। আরবদের মধ্যে এমন কি আছে যা আপনাকে আগ্রহান্বিত করতে পারে? এ জাতটি বড় ভীরু এবং অলস। আপনি এদের মধ্যে কৃষ্টি দেখতে পেলেন কোথায়, যা জানবার জন্য আপনি এসেছেন, বলছেন?

তাদের দর্শন, তাদের সহনশীলতা, তাদের সুন্দর জীবনযাপন প্রণালী, তাদের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এবং পরস্পরের প্রতি সাহায্য আর আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাস, এসব জানবার আগ্রহই আমার এখানে আসবার মূল উদ্দেশ্য।

তাচ্ছিল্যভরে কমিশনার বললেন: দর্শন, তাতে কি আছে? তাদেরে জানতে গেলে দেখতে পাবেন যে, একদল অসভ্য ছাড়া আরবরা আর কিছুই নয়। আমাদের অগ্রগতির পথে এবং দেশকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে ওরা। আমরা চাই এখানে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, এর মতো উর্বর স্থান আর কোথাও পাবেন না। এর উন্নতির প্রতি কোনো লক্ষ্য নেই ওদের। উন্নত প্রথায় চাষ-আবাদ করলে বর্তমানের চেয়ে এখানে বিশ গুণ অধিক শস্য উৎপন্ন করা যেতে পারে। আমরা চাই ডের্নাকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলতে, কিন্তু ওরা তাতে অসন্তুষ্ট। তাদের কাজ করবার জন্য অধিক মজুরী দিতে চাইলেও ওরা কাজ করবে না—এত অলস এই জাতি। বেঁচে থাকবার মতো সামান্য কিছু পেলেই ওরা আর কিছুই চায় না। কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই ওদের।

কিন্তু ওরা তো ছিলো খুবই সুখী। ওদের প্রচলিত পথে ওদের বাঁচতে দিলে সুখ-শান্তিতেই ওরা বাঁচতো।

আপনি কি যে বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি না।

ভালোভাবে জীবন যাপন করতে অস্বীকার করাকেই কি আপনি সুখ-শান্তি বলেন? কোনোরূপ উন্নতির চেষ্টা না করে মসজিদে গিয়ে পাঁচবার হাঁটুর উপর ঝুকে আল্লাহকে ডাকলেই হবে? আপনি যদি এরূপই মনে করেন তাহলে আমাদের এ আলোচনা বন্ধ করাই শ্রেয়।

হ্যাঁ, আমার বলার উদ্দেশ্য তাই। এর কারণ বলছি: যে পন্থায় গত শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়ানরা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সেই পন্থা থেকে প্রাচ্যবাসীরাও উন্নতি ও প্রগতি চায়, কিন্তু ইউরোপীয়ানদের থেকে ভিন্ন উপায়ে। আত্মা এবং আত্মার উন্নতিকেই তারা মুখ্য বলে জ্ঞান করে। আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচেষ্টা, সৌন্দর্যানুভূতি এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা দ্বারাই তারা তাদের আত্মার উন্নতির চেষ্টা করে। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে–তাতে জানতে পেরেছি, সবাই না হোক অন্তত বেশীর ভাগ লোকই দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েও উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়েছে। এদিক দিয়ে তারা ইউরোপীয়ানদের অধিকাংশের চেয়েও অধিক উন্নত।

কমিশনার উঠে পায়চারি করতে করতে বললেন: এ কথাই আপনি আমায় বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছেন? এ নিতান্ত বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তা'হলে আপনি সমস্ত যান্ত্রিক উন্নতিকে অস্বীকার করতে চান? সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল্যকে বাতিল করে দিতে চান?

হাঁ! ইউরোপে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমি এ কথাই স্বীকার না করে পারি না। যান্ত্রিক উন্নতিকে শ্বেত জাতি শুধু একটিমাত্র উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে,–তা হচ্ছে দৈহিক ও বাহ্যিক উন্নতি। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বিশ্বাস করি যে, এই যান্ত্রিক উন্নতি, আগে হোক পরে হোক, একদিন সারা ইউরোপে ভীষণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। কৃষ্টি ও ধর্মকে অস্বীকার করে বস্তুতান্ত্রিকতা টিকতে পারে না।

ঘাড় নেড়ে কমিশনার বললেন: এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। আমরা ইটালিয়ানরা বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পাই না। দুনিয়াতে শক্তিমানেরই বেঁচে থাকবার একমাত্র অধিকার। শক্তিমানই একমাত্র জগতে বড় কাজ করতে সমর্থ। তাই আমরা এ দেশকে জয় করে নিজেদের করে নিয়েছি। শান্তি ও শৃংখলার রাজ্য প্রতিষ্ঠার আবেদনের উত্তর তারা দিয়েছে গুলী করে, আমাদের অগ্রগামীদের হত্যা করে,–আক্রমণ করে আমাদের কাজে বাধা জন্মিয়ে, আমাদের অফিসার ও লোকদের উপর নির্মম উৎপীড়ন চালিয়ে, তাদের বন্দী করে। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা ওদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেছি। কিন্তু আজ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। পৃথিবীর বুকে ইটালীর স্থান করে নিতেই হবে। আমাদের লোকসংখ্যা খুব বেশী। দিন

দিন তা বেড়েই চলছে। আরবরা যদি বাধা দিতে চায় দিক। আমরা এদেশ জয় করবোই। আমাদের দেশের কৃষকদের বিশেষ করে সিদিলির কৃষকদের জন্য এখানে বসতি স্থাপন করতে হবে। এই হলো প্রকৃত ব্যাপার। কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। একটা উন্নত তরুণ জাতির দাবি অস্বীকার করতে চায় কিনা কতকগুলি অসভ্য নোংরা পশু।

আমি এ কথার কোনো জওয়াব দিলাম না। চুপ করে শুধু ঘাড় নাড়লাম। কমিশনার বসলেন; বললেন: আমরা এ সম্বন্ধে একমত হই বা না হই তাতে কিছুই যায় আসে না। তবে বর্তমানে আপনাকে আর যেতে দেওয়া হবে না।

কেন?

ডের্না আর তবরুকের মধ্যবর্তী স্থান নিরাপদ নয়, বেদুইনে ভর্তি। তা ছাড়া বর্তমানে আপনার সঙ্গে দেওয়ার মতো প্রহরীও এখানে নেই।

কিন্তু অনুমতি তো পাসপোর্টেই দেওয়া আছে।

তা জানি! আমি এখানকার কমানডেন্ট। আপনার জীবনের দায়িত্ব আমি নিতে সাহস পাই না। আপনি থাকবেন কোথায়?

ডের্না সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই।

'রোমা'ই এখানকার একমাত্র হোটেল। সেখানেই বন্দোবস্ত করতে পারেন।

আমার নিজ তাঁবুতে থাকতে পারি না?

নিশ্চয়ই না। প্রাচীরের বাইরে আপনাকে শু'তে দিতে পারি না। আর ভিতরেও এখানে কোনো ঘর নেই। আপনাকে রোমাতেই যেতে হবে।

কমিশনারের কাছে বিদায় নিয়ে এখন কি করা যায় তাই ভাবছি। ডের্নাতেই আমার কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে–আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। নিজকে যেনো বন্দী বলে মনে হতে লাগলো। সারা ডের্নাকে একটা প্রকাণ্ড জেলখানা বলে মনে হচ্ছে। প্রতি প্রবেশদ্বারে মেশিনগানের পাহারা।

আরব কোয়ার্টারের খুব কাছেই হোটেল রোমা। মালিক একজন বয়স্ক ইটালিয়ান। হোটেলে অতিথি বড় একটা আসে না। তাই আমার থাকার বন্দোবস্ত নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমায় মস্ত বড় একটা হলে থাকতে দেওয়া হলো। তাতে কালো শার্ট পরিহিত মুসোলিনী, পোপ ও রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের ফটো টাঙ্গানো।

আড়াইটায় আমি মসজিদে যাওয়ার জন্য শহরে গেলাম। কাছের মসজিদটি খুব বড়। এটাই ডের্নার একমাত্র মসজিদ নয়। শহরের বাইরে কিছুদূরে একটা ছোট সুন্দর মসজিদ আছে। সেটি সিদি আহমদ সেনৌসীর সম্মানার্থে নির্মিত। ডের্নার সমস্ত অধিবাসীই তাঁর অনুগত শিষ্য। মসজিদে ঢুকতে একটি লোক আমার কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে বললেন: আমার নাম ইবরাহীম সেরাফী। ডের্নায় আসার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি তাকে বললাম যে, আমি একজন ইউরোপীয় মুসলিম। বর্তমানে মরক্কো থেকে আসছি।

মরক্কো থেকে? তা'হলে আপনি আন্দুলুসিয়াও গিয়েছেন?

অনেকবার। মালাজা, গ্রানাডা, কদিজ, করডোভা–সব স্থানেই গিয়েছি।

আপনার ডের্না আগমন বেশ সুখেরই হয়েছে। এখানকার প্রায় সকল অধিবাসীই আন্দালুসিয়া থেকে এসেছে। আমাদের ভূতপূর্ব মেয়র আবদুল আজিজ সাহেব এবং আরো অনেকেই সেখান থেকে এসেছেন। মুরদেনিক থেকে স্পেনিয়ার্ডরা আন্দালুসিয়া অধিকার করে নিলে তারা সাইরেনিকায় পালিয়ে আসে। এখানে আপনি কতো দিন থাকবেন?

তা আমি বলতে পারি না। আমি মোটরে ভ্রমণ করছি। কমিশনারের অনুমতি ভিন্ন আমি এ স্থান ত্যাগ করতে পারি না।

কেন?

তিনি বলছেন যে, পথে নাকি ভীষণ যুদ্ধ চলছে।

হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। ইটালিয়ানরা বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার শুরু করেছে। একটা গ্রামের সমস্ত লোককে তারা হত্যা করেছে। এজন্যই আহমর মোখতারের লোকেরা ওদের ক্ষমা করে না।

এ সত্ত্বেও তারা আমার কোনো অনিষ্ট করে নাই।

চুপি চুপি সে বললো: আল-মাহাফদিয়ার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরে আসতে পারে না।

পর্বতে আমার অভিজ্ঞতার কথা তাকে বললাম।

আমি লক্ষ্য করেছি যে, আপনি আমাদেরই মতো নামায পড়েন। এও বুঝতে পারলাম যে, আপনি একজন মুসলিম। আপনার কাছে সকল কথা বলতে আমার ভয় নেই। এখানে বাস্তবিকই অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

কি রকম?

প্রায় প্রতিদিনই এখানে কোনো না কোনো লোককে গুলী করে, নয় তো ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়। এই সেদিনও আবদুল ওয়াহিদ নামে এখানকার এক সওদাগরকে ওরা গুলী করে হত্যা করেছে।

কি করেছিলো সে?

তেমন কিছুই না। তার এক ভাই পর্বতে ছিলো। একদিন রাতে তার ভাই তাকে দেখতে আসে। প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সে শহরে ঢোকে। সওদাগর তার ভাইকে যতো দূর সম্ভব খাদ্যদ্রব্য দেয়। তারপর আবার সে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পর দিন ভোরে প্রাচীরের বাইরে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

যাওয়ার বেলায় প্রহরী তাকে দেখতে পেয়ে গুলী করে। সেই গুলীর আঘাত তার শরীরে লেগেছিলো কিনা তা সে দেখে নাই। সকালে লাশটি পাওয়া যায়। সঙ্গে

তার সমস্ত খাদ্যদ্রব্য। ইটালিয়ানরা জোর তদন্ত চালায়। অবশেষে তারা জানতে পারে যে, সওদাগর তাকে ঐ সব খাবার দিয়েছিলো। তাকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

তাহলে যে-কোনো কাজের জন্য লোকদের শাস্তি দেওয়া হয়?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। বর্তমানে অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। ডের্নার যে সমস্ত আরব আত্মসমর্পণ করেছে তারাও এতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতে লাভ কি? আমার মনে হয় ওরা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

রাস্তায় বেরিয়ে চলতে চলতে একটা কাফেতে ঢুকলাম এবং কফির অর্ডার দিলাম। দু'মিনিট না যেতেই ইবরাহীম বলে উঠলো: ঐ যে চেয়ে দেখুন, রাস্তার অপর পাশে ভূতপূর্ব মেয়র আবদুল আজিজ বসে আছেন। ইনি সবার প্রিয়।

আমরা তাঁর কাছে গেলাম। বয়স তাঁর সত্তর বছর, সাদা ধবধবে চুলদাড়ি। তিনি আমাদের বসতে বললেন। আবার কফি চেয়ে পাঠালেন। ইবরাহীম তাঁর কাছে আমার পরিচয় দিলে এবং আমি মিসর যাচ্ছি বললে তিনি পরদিন তাঁর বাড়ীতে আমায় চায়ের দাওয়াত করলেন।

হোটেলে ফিরে খেতে বসেছি। আমার টেবিলের পাশে একজন ইটালিয়ান বসেছিলেন-একজন ইঞ্জিনিয়ার–হোটেলের কাছেই তাঁর কারখানা। তাঁর সঙ্গে একজন কাস্টম অফিসার উপবিষ্ট। তা'ছাড়া দু'তিনটা অফিসারও ছিলেন। খাবার মাঝখানে তারা এটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যাসিস্ট কায়দায় অভিবাদন করলো। ডের্নার সৈন্যবাহিনীর কর্নেল হোটেলে ঢুকলেন।

প্রতি রাতে তিনি হোটেল রোমায় আহার করেন। তিনি আমায় অভিবাদন করলেন। বিদেশী বলে বেশ উৎসুকভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

আমাদের খাওয়া তখনো শেষ হয় নাই। এমন সময় একজন সৈনিক ঢুকে কর্নেলের হাতে টেলিগ্রামের মতো এক টুকরো কাগজ দিলো। কর্নেল তাড়াতাড়ি তা খুললেন, খাবার ছেড়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই তাঁর গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম।

পনেরো মিনিট পর আমি হোটেলের দরজার বাইরে গেলাম। দেখলাম তিনটি সাজোঁয়া গাড়ি দ্রুত চলেছে তবরুকের দিকে।

কয়েদ ও নির্বাসন

চারদিন কাটলো। ১৪ তারিখ আমি ডের্না পৌঁছি। আজ ১৯। আমি আবার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এখন যেতে পারি কিনা জানতে গেলাম। তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম না। তিনি তখন বেজায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সেক্রেটারী আমায় বললেন যে, অবস্থা এখনো এত খারাপ যে আমি রওনা হতে পারি না। আরো তিন দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। হোটেলে তারা আমায় সংবাদ দেবে।

গত তিনদিন ধরে ডের্নার সমস্ত আরবদের সঙ্গে পরিচয় করলাম। তাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব জমে উঠলো–বিশেষ করে আবদুল আজিজ সাহেবের সঙ্গে। ইবরাহীমের সঙ্গেও আমার বেশ বন্ধুত্ব হলো। তিনি যৌবনে তুর্কীদের পক্ষ হয়ে ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। সে কথা তিনি আমায় বললেন। আনওয়ার পাশা ও কামাল পাশা সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি আমায় বললেন। তিনি বললেন যে, এদের তিনি মোটেই পসন্দ করতেন না। ১৯১২ সনের যুদ্ধের সময় তাঁরা উভয়েই সাইরেনিকা এসেছিলেন। সেই সময়ে পার্বত্য যুদ্ধে তিনি যে আঘাত পেয়েছিলেন তার চিহ্ন তিনি আমায় দেখালেন।

এমনি করে দিনগুলি কেটে গেলো। তিন দিন কাটলো তবুও কমিশনারের কাছ থেকে কোনো খবর এলো না। ২৫ তারিখ আবার এখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে ধৈর্য ধরে আমায় অপেক্ষা করতে হবে। তখনো কোনো প্রহরী পাওয়া যায় নাই।

২৮ মে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। প্রাচীরের ঠিক বাইরেই বেদুইনদের একটা ক্যাম্প ছিলো। সেখানকার সমস্ত বেদুইন ইটালিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা আর অস্ত্র রাখতে পারবে না। ইটালিয়ানদের একজন আরব সৈনিক জানতে পারলো যে, সেই ক্যাম্পে চারজন বেদুইন পর্বতে যুদ্ধরত আরবদের রুটি আর তামাক দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই চারজনকে গ্রেফতার করে জেলে দেওয়া হয়েছে।

সারাদিনব্যাপী ডের্নায় এ কথারই আলোচনা চলেছে। সেই বেদুইনরা যে অনাহারে মৃতপ্রায় সে সংবাদ সবাই আলোচনা করছে। একদিকে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য আরবরা তাদের সঙ্গে দুশমনি করছে, অন্যদিকে ইটালিয়ানরা তাদের অস্ত্র রাখতে অনুমতি না দেয়ায় তারা তাদের উট ও মেষ রক্ষা করতে পারছে না। সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বন্দীর বয়স ষাট বছর।

সামরিক বিচারকদের নিকট এদের বিচারের জন্য হাযির করা হলো। জেনারেল গ্রাজিয়ানী এ সব মামলা তাড়াতাড়ি বিচার করবার জন্য একটি বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করেছেন। বিচারক এরোপ্লেনে করে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ান। ২৯ মে বিকেল পাঁচটায় এদের বিচারের জন্য তিনি ডের্না আসেন।

প্রকাশ্যে বিচার হচ্ছে। আমি কোর্টে উপস্থিত হলাম। ইটালীয় ভাষায় তা পরিচালিত হলো। কমিশনারের অফিসের আলী জেবরী দোভাষীর কাজ করলেন। সেই চারজন বেদুইনকে কোর্টে হাযির করা হলো, তাদের জেরা করা হলো। সর্বজ্যেষ্ঠ আহমদ বিন আবদুল কাদেরের জেরা শুরু হলো।

বিচারক: তুমি পার্বত্য বেদুইনদের রুটি আর তামাক দিয়েছো?– এ কথা তুমি স্বীকার করো?

আহমদ চুপ করে রইলো।

বিচারক কঠোর স্বরে বললেন: তুমি স্বীকার করো কি না?

একটা প্রহরী তার পিঠে একটা গুতা দিলো, সে জওয়াব দিলো: হ্যাঁ।

ঠিক হয়েছে। আর একজন!

বিচারক তাকেও একই প্রশ্ন করলেন। একই উত্তর পেলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি কোনো উত্তর দিলো না। প্রহরী তাকে গোটাকয়েক ঘা দেয়া সত্ত্বেও সে উত্তর দিলো না। তাকে আর প্রশ্ন করা হলো না। সবচেয়ে ছোট ইদরিস। তার বয়স মাত্র উনিশ বছর। খুব বুদ্ধিমান।

সে দোষী কিনা জিজ্ঞেস করা হলে সে বললো: না।

কি? কি করে তুমি না বলছো? আমাদের কাছে অনেক প্রমাণ আছে। অন্যেরা তা স্বীকার করেছে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। শত্রুদের সাহয্য করেছো।

না। এবার স্বর দৃঢ় এবং স্পষ্ট।

রুটি আর তামাক না দিলে ওরা আমাদের মেষ নিয়ে যেতো। এদের রক্ষা করবার মতো হাতিয়ার আমাদের নেই। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে তা রক্ষা করতে পারতাম না।

ওরা যখন এসেছিলো তখন ডের্না থেকে প্রহরীদের ডেকে নিলেই পারতে।

কোনো মুসলিমকে বিধর্মীদের হাতে সঁপে দেয়া ধর্মের বিধান নয়।

তোমার কথায় কোনো যুক্তি নেই। তুমি স্বীকার করছো যে শত্রুদের তুমি খাবার সাহায্য করেছো।

হ্যাঁ। কিন্তু–

রায় তখনই দেয়া হলো।

ইটালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনজনকে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। নির্বাক লোকটিকে খালাস দেয়া হল।

ইদরিসের ভাই সেখানে উপস্থিত ছিলো। দণ্ডাদেশ শুনে সে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তার ভাইকে আলিঙ্গন করবার জন্য সে ছুটে গেলো, কিন্তু প্রহরীরা তাকে ঠেলে হটিয়ে দিলো। চিৎকার করে সে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলো। রাস্তায় পড়লো সে মূর্ছিত হয়ে।

আহমদ আলী জেবরীকে বললো: বিচারককে বলো আমাদের অন্য প্রকার শাস্তি দিতে। বাড়ীতে আমার নয়টি ছেলেমেয়ে রয়েছে।

বিচারক শুনে ঘাড় নেড়ে বললো : সামরিক বিচারালয় শুধু খালাস বা মৃত্যু এই দু'টি শব্দই জানে।

প্রহরী তিনটি অপরাধীকে শৃংখলাবদ্ধ করলো।

রাস্তায় নিরবে দাঁড়িয়ে আরবরা তাদের শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যেতে দেখলো। একটা লরীতে তুলে তাদের সমুদ্রের দিকে নিয়ে গেলো। পথে ইবরাহীমের সঙ্গে দেখা। বললাম: ওদের জেলখানায় নেওয়া হলো না কেন?

সমুদ্রতীরে এখনই এদের গুলী করে মারা হবে।

আমি শুনলাম, ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেলো। সমস্ত জনতা মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ। পূর্ণ নিস্তব্ধতায় কাটলো পাঁচ মিনিট। তারপর একসঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের শব্দ শোনা গেলো। আবার কয়েক সেকেণ্ড সব নীরব। পুনরায় একটি মাত্র গুলীর শব্দ শোনা গেলো। ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলাম: এ শব্দটি কেন?

আমরা এ শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। পেছন থেকে গুলী করলে অনেক সময় মৃত্যু হয় না। যার দেহে তখনো প্রাণ থাকে অফিসার তার মাথায় গুলী করে।

সন্ধ্যা হয়ে এলো। শান্ত সমুদ্রের উপর অস্তমান সূর্যের আলো সোনালী রং-এর সৃষ্টি করেছে।

পরদিন একটা বিষাদের ছায়া সদা হাস্যময় আরবদের হৃদয়কে বিষাদময় করে তোলে। সারা ডের্না যেনো বিষাদ-মলিন। ইবরাহীমের সঙ্গে দেখা হলো। সে বললো: আজ যদি আমি আবার কুড়ি বছরের যুবক হতে পারতাম, তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। আজ আমি ভীরু দুর্বল,–বৃদ্ধ। যতো কষ্টই ভোগ করতে হ'তো না কেন আমি আজ পর্বতে থাকতাম।

কাল যা ঘটেছে তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়?

না। প্রতিদিনের ব্যাপার এ। ওরা আমাদের সকলকেই সন্দেহ করে। জানি না কোন্ দিন আমাদের সকলকেই জেলে পুরবে। আহমদকে কাল গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। কে তার নয়টি ছেলেমেয়েকে দেখবে? একমাস আগে একটি স্ত্রীলোককেও এমনিভাবে গুলী করে হত্যা করা হয়।

স্ত্রীলোককে?

হ্যাঁ। এখন সমস্ত ব্যাপারটা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রহরী এটাকে সত্য বলে কসম খেয়েছে। বেদুইনদের ক্যাম্পের নিকট এই স্ত্রীলোকটি থাকতো।

ছ'মাসের একমাত্র শিশুকে নিয়ে তার নিজের তাঁবুতে সে বাস করতো। বয়স ছিলো তার খুব কম–অর্থাৎ পূর্ণ যুবতী। শহরের এক প্রহরী তাকে অনুসরণ করতো। কিছুদিন পূর্বে তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তাকে রক্ষা করবার মতো কেউ ছিলো না। আমি তাকে ভালো জানতাম। তার সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে। প্রহরীটির আচরণ সম্বন্ধে সে শহরের অনেকের কাছে বলেছে। একদিন রাতে দু'জন আরব তার তাঁবুতে আসে। তারা তাকে বলে যে, তারা পর্বত থেকে এসেছে। তারা তার কাছে কিছু খাবার চাইলো। সে বললো যে, তাদেরে খাবার দিলে তার প্রাণদণ্ড হবে। তাই সে তাদের কথায় রাযী হলো না। খাবার না দিলে তারা তাকে হত্যা করার ভয় দেখালো। তাতে সে তাদের কিছু চিনি আর রুটি দিলো। পর দিন সেই প্রহরী দলত্যাগী আরব–বর্তমানে ইটালিয়ানদের ভৃত্য, এসে তাকে বলে যে সে বিদ্রোহীদের চিনি আর রুটি দিয়েছে, একথা সে জানে। স্ত্রীলোকটি তা অস্বীকার করলো। কোনো মুসলিমের সম্বন্ধে এরূপ জঘন্য কথা বলা অনুচিত।

প্রহরী সেই সুযোগ নিয়ে তাকে সে তার দেহ দান করতে বললো। এবং বললো যে তাহলে সে তার কোনো অনিষ্টই করবে না। সে তাতে রাযী হলো না। তাই তাকে বিচারকের সামনে হাযির হতে হলো।

প্রশ্নের উত্তরে প্রহরী বললো যে, সেদিন চাঁদনী রাতে প্রহরারত থাকা কালে একটি বিদ্রোহীকে স্ত্রীলোকটির ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে সে গুলী করে। হয়তো সে আরব হয়ে থাকবে, তাই চিনি আর রুটি ফেলে পালিয়ে গেছে। সেই চিনি আর রুটি সে সেখানে কুড়িয়ে পেয়েছে। যে ব্যাগে তা ছিলো সেটি যে সেই স্ত্রীলোকটির তা প্রমাণ হলো।

বিচারে স্ত্রীলোকটির কি হলো?

অন্যদের মতো তারও প্রাণদণ্ড হলো।

তার সন্তানটির কি হলো?

ইটালিয়ানরা তাকে নিয়ে গেছে। সে এখন কোথায় তা জানি না।

আপনি সমস্ত ব্যাপারটা কি করে জানলেন?

স্ত্রীলোকটি ক্যাম্পের একজনের কাছে তা বলেছিলো এবং এ কথাও সে বলেছিলো যে, যে দু'টি আরব তার ক্যাম্পে এসে চিনি আর রুটি নিয়েছিলো তারা বাস্তবিক বিদ্রোহী ছিলো না। বিদ্রোহীর ছদ্মবেশে সেই শয়তান প্রহরীটিই এসেছিলো–সঙ্গে ছিলো তার এক সাঙাত। একথা সে পরে সেই প্রহরীর কাছেই জানতে পেরেছে।

এটাকে আপনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ। স্ত্রীলোকটি খুব বিশ্বাসী এবং সত্যবাদিনী ছিলো।

আরো অনেক দিন কাটলো। জুন মাসেরও ক'দিন হয়ে গেছে। আরো ক'দিন যে আমায় সেখানে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। টাকা-পয়সাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,

অনুমতি পেতে আরো বিলম্ব হবে। ডেনমার্ক থেকে আমার টাকা কখন আসবে তারও নিশ্চয়তা নেই। কমিশনারের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আরবদের সঙ্গে আমার মেলামেশা দেখে ফ্যাসিস্টপন্থী ইন্‌জিনিয়ার আর কাস্টম অফিসারটি আমায় দেখলেই বিদ্রূপের সুরে বলে: আহমর মোখতারের বন্ধু আসছেন।

৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার স্কোয়ারে বন্ধু ইবরাহীমের সঙ্গে দেখা। তাকে বড় বিব্রত মনে হলো। বললো: ইটালিয়ানদের কি হয়েছে তা বুঝতে পারছি না। তারা তবরুকের তিনজন শেখকে গ্রেফতার করেছে। এই গ্রেফতারের হিড়িক শীঘ্রই ডের্নাতেও শুরু হবে বলে আশংকা হচ্ছে।

ওরা এরূপ করছে কেন?

যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা সেনৌসী পরিবারের লোক। তাঁরা কিছুই করেননি। আহমর মোখতারের সমর্থক বলে তাদের সন্দেহ করা হয়েছে। সাইরেনিকার নেতৃস্থানীয় নাগরিক এঁরা। ইটালিয়ানরা এরূপ ব্যবহার করতে থাকলে আমাদের পক্ষে আর অধিক কাল ওদের অনুগত থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

খানিক বাদে আবদুল আজিজ, ভূতপূর্ব মেয়র, যাঁকে সরিয়ে একজন ইটালিয়ানকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, এসে পৌঁছলেন। তাঁকে বড় বিমর্ষ মনে হচ্ছে। তিনি বললেন যে, যে শেখ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁরা বেনগাজীর বিখ্যাত ব্যক্তি। সবাই তাঁদের সম্মান ও সম্ভ্রম করে থাকে।

তাঁর সঙ্গে দু'জন আরব ছিলো। তাদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। একজন অদূরবর্তী এক ছোট শহরের মেয়র, নাম মুহম্মদ আল-মেরগী, দ্বিতীয় ব্যক্তি ডের্নার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী।

আমি বললাম: কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। মিসর সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু তারা আমায় এখান থেকে যেতে দিচ্ছে না কেন? কয়েকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফটকে আমায় থামিয়ে দেয়া হয়েছে।

ব্যবসায়ী বললেন: ব্যাপারটি অবশ্য অদ্ভুত, কিন্তু কি যে হচ্ছে তা কেউই বুঝতে পারছে না। এখানে কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারছে না।

কিন্তু এখানে আমি টাকা পয়সা পাবো কোথায়? আমি যেতে চাই, কিন্তু কমিশনারের অফিস থেকে আমায় অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

ডিওডিসি যখন এখানে ছিলেন তখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

মেজর নতুন কমানডেন্টের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। তাঁর সময় এখানে সব ঠিক ছিলো। তিনি জনগণের মন প্রায় জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারছি না। গুপ্তচরের ভয়ে কথা বলতে পর্যন্ত ভয় হয়!

সিদি আবদুল আজিজ বললেন: হাঁ, কিন্তু বুঝতে পারছি না বর্তমানে এখানে কি ঘটছে। প্রতিদিন কারো না কারো প্রাণদণ্ড হচ্ছে। গতকাল আমার দু'টি বন্ধুকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। আহমর মোখতারের লোকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিলো বলে ওদের বিশ্বাস।

আমরা তখন সবাই আহমর মোখতারের কথা ভাবছি। এই আহমর মোখতার তাঁর মুষ্টিমেয় লোক নিয়ে বিদেশী পশুশক্তির বিরুদ্ধে পর্বতে থেকে যুদ্ধ করছেন–কিন্তু কেউ সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে সাহস পায় না।

আবদুল আজিজ বললেন: এটা হয়তো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আমাদের তা সহ্য করতেই হবে। আমরা দুর্বল। এখন তারা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছে। তারা এদের নির্মূল করতে দৃঢ়সংকল্প। গরীব লোকেরা অর্ধনগ্ন ও অর্ধাহারে লড়াই করছে।

আমি বললাম: একটা কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই। প্রতিদিনই অস্ত্র বোঝাই গাড়ি শহর থেকে সেখানে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী বললেন: জেনারেল গ্রাজিয়ানী বোধ হয় বিদ্রোহ চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এ অবস্থা বেশী দিন চললে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

ইবরাহীম বললো: ওদের ইচ্ছাও হয়তো তাই।

ব্যবসায়ী: ওরা এরূপ করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

আমি বললাম: না কেন? ইউরোপের কেউ এ কথা জানতে পারে না। রাজ্য বিস্তারের জন্য ইটালিয়ানরা যে-কোনো গর্হিত কার্য করতে পারে। ইউরোপের লোক শুনবে বা জানবে যে সাইরেনিকার শান্তিকামী ইটালিয়ানরা রক্তপিপাসু আরবদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। একমাত্র আমিই স্বচক্ষে দেখছি বর্বর কারা।

ডের্নায় একটা বিষাদের ছায়া। রাস্তায় কেউ কথা বলতে সাহস পায় না।

ব্যবসায়ী উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদের সঙ্গে করমর্দন করে আমাকে বললেন: দয়া করে একটিবার আমার বাড়ীতে আসবেন কি?

উত্তরে আমি বললাম: যাবো।

পরদিন মসজিদে যেয়ে জুমার নামায পড়লাম।

খুতবার সময় ইমাম সাহেব বললেন: আমি একটা ঘোষণার কথা বলছি শুনুন। ইটালিয়ান গভর্নমেন্টের নিকট হতে নির্দেশ এসেছে যে সেনৌসী সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ কেউ করতে পারবে না। তার নির্দেশিত ধর্ম-কর্মও কেউ পালন করতে পারবে না।

শ্রোতাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই–সবাই সেনৌসীর শিষ্য। নামাযের পর তুমুল আলোচনা শুরু হলো।

ইবরাহীমের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম: এর অর্থ কি?

জানি না। বোধ হয় সাইরেনিকায় সেনৌসীর শক্তি ও প্রভাব নষ্ট করে দেয়া। কিন্তু তাতে ওরা সফল হতে পারবে না।

এখানে সেনৌসীপন্থীদের সংখ্যা কি খুব বেশী?

প্রায় প্রতিটি লোক। সেনৌসীর শিক্ষা ইসলামের উন্নত সংস্করণ মাত্র। তাঁর প্রধান শিক্ষা হলো–ব্যক্তিগত উন্নতি দ্বারাই ধর্মীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করা যায়।

কি করে?

ইসলামের বিধান ঠিকমতো অনুসরণ করে। সর্বদা ভালো কাজে ও উপবাসে মনোনিবেশ করে পূর্ণতা লাভ করা যায়। পূর্ণতাই আল্লাহ্।

ইটালিয়ানরা এর বিরোধিতা করছে কেন?

তা বুঝতে পারি না। এ সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভালো মনে করি। এ ধরনের আলাপ করলে হয়তো আমাদেরও শাস্তি পেতে হবে। এর কারণ হয়তো তারা সিদি ইদরিস সেনৌসীকে ধরতে চায়। তিনিই সাইরেনিকার প্রকৃত আমীর। তারা তাঁকে এখান থেকে বিতাড়িত করেছে। এর আর অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে না।

প্রতিদিন আমি কমিশনারের অফিসে যাই, প্রতিদিনই এক উত্তর পাই। হয়তো কালই আপনি রওনা হতে পারেন।

অবশেষে একদিন মের্জে ডিওডিসির কাছে টেলিগ্রাম করলাম। টেলিগ্রাম যায় নাই। দিন যাচ্ছে। আমাকে কম্বল, টাইপরাইটার, ক্যামেরা প্রভৃতি বিক্রি করতে হলো।

১৭ জুন বিক্ষুব্ধ ডের্না চঞ্চল হয়ে উঠলো। চারজন বিশিষ্ট নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর কোনো কারণ জানানো হয় নাই। সন্দেহ করা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে। বন্দীদের মধ্যে একজন আশি বছরের বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী দু'জন সওদাগর এবং আঠারো বছরের এক যুবক শিক্ষক। এ ছাড়া সিদি ইদরিসের নিকট-আত্মীয় একটি তেরো বছরের বালককেও জেলে পুরা হয়েছে। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সারা রাত শহর ভর্তি ছিলো সৈন্য। লোকজন চঞ্চল হয়ে উঠলেও শান্তি ছিলো।

জোহরের নামাযের সময় সৈন্যদল সেনৌসী পরিবারের মসজিদে এসে ঢুকলো। নামাযীদের তাড়িয়ে দিয়ে মসজিদের দরজায় সরকারী সীলমোহর লাগালো। মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনটার সময় হোটেলে সংবাদ এলো যে, পরদিন সাতটায় আমি রওনা হতে পারবো। গাড়ি প্রস্তুত করলাম। আরো কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করলাম। হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে খুব অল্প টাকাই আমার হাতে রইলো। তবে মিসর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে এতেই যথেষ্ট। সালমামে ডেনমার্ক থেকে টাকা আনানো সহজ হবে। শহরে গিয়ে সকল বন্ধুবান্ধব থেকে বিদায় নিলাম। পাঁচটায় একজন প্রহরী আমার কাছে এলো। তখনই তার সঙ্গে আমায় যেতে বললো। ব্যারাকে একজন ইটালিয়ান অফিসারের কাছে আমায় হাযির করা হলো। তিনি বললেন: কাল সকালে রওনা হবার জন্য তৈরি হয়েছেন তো?

হ্যাঁ।

গাড়ির অবস্থা ভালো তো?

হ্যাঁ।

তাহলে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।

কী?

আপনি বন্দী।

কারণ?

আমি তা জানিনে।

কারণ ছাড়া আমায় আপনি গ্রেফতার করতে পারেন না।

গভর্নমেন্টের নির্দেশ। আপনার পাসপোর্টটি দিন তো।

আমি তাকে পাসপোর্টটি দিলাম। সে আমার হাতে হাতকড়া পরালো। আমি বন্দী হ'লাম।

কাগজে কি সব লিখে লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে বললেন: প্রথম আমাকে যেতে হবে আপনার গাড়িতে।

একটা মিলিটারী গাড়ীতে করে আমরা হোটেলে গেলাম। আমার গাড়ির স্টীয়ারিং হুইলের সঙ্গে শিকল দিয়ে আমায় বাধা হলো। মিলিটারী গাড়ি রাখার একটা পার্কে আমাদের যেতে হলো। সেখানে আমার গাড়ি বন্ধ করা হলো গ্যারেজে। লেফটেন্যান্ট অন্য একটা গাড়ি আনলো। তাতে করে আমায় জেলখানায় নেওয়া হলো।

ডের্নার জেলখানাটি বেশ বড়। শহরের মাঝখানে অবস্থিত। কারাধ্যক্ষ একজন ইটালিয়ান সার্জেন্ট। তাছাড়া আর সব কর্মচারী আরব। সাতটায় আমাকে সেখানে নেওয়া হলো। আমার আসবাবপত্র হলো বাজেয়াপ্ত। সমস্ত তল্লাশ করা হলো। আমার নাম জেলের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হলো। তারপর আমাকে রাখা হলো একটা সেলে।

সমস্ত ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেলো যে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি তা ভাববার সময় পর্যন্ত পাই নাই। রাত হয়ে গেছে। অসংখ্য মশার গানের মধ্যেই ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। ভাবতে লাগলাম আমায় ওরা গ্রেফতার করলো কেন? আমি কি করেছি?

পরদিন সকাল সাতটায় একটি আরব এসে আমায় জিজ্ঞেস করলো: রাতে বেশ ঘুম হয়েছে তো?

আমি তার দিকে চাইলাম। বললাম: আমি এখানে কেন, তার কারণ বলতে পারেন?

এজন্য বেশী চিন্তা করবেন না। আপনার পাশের ঘরেই ডের্নার চারজন শেখ ও একটি বালক আছে, তারাও জানে না তারা কি অপরাধ করেছে।

তারাও কি এখানে? তাদের কথা আমি শুনেছি।

সে মুখে আঙ্গুল রেখে বললো: চুপ! এতো জোরে কথা বলবেন না। সে এখনো বাইরে যায় নাই।

কে বাইরে যায় নাই?

ইটালিয়ান। শীঘ্রই সে প্রাতঃভ্রমণে বের হবে। তখন আপনি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে এসে মন খুলে আলাপ করবেন।

এটা কি রাজনৈতিক জেলখানা?

না। তাহলে আপনাকে এখানে রাখতো না।

তুমি এখানে কতো দিন ধরে আছো?

চার বছর।

চার বছর? তুমি কি করেছিলে?

চার বছর তো কিছুই নয়। আপনি যে এখানে সারা জীবনের জন্য এসেছেন। আমি একটা লোককে ভীষণ আঘাত করেছিলাম, তাতে সে মরে যায়! এবার আমায় কাজে যেতে হবে। আপনি বরং বাইরে যান।

খানিক পর সে আমার কামরা পরিষ্কার করে এসে বললো: আপনি এবার ভিতরে যেতে পারেন। আমি জানি, আপনি ইটালিয়ান নন। তাহলে আপনার কামরা এতো ভালো করে ধুয়ে দিতাম না। এবার ভিতরে যান, আমি আপনার খাবার নিয়ে আসছি।

খাবার এনে সে বললো: বেশ ভালো করে খাবেন, কারণ কাল ছাড়া আর খেতে পাবেন না।

দশটায় একজন প্রহরী এসে আমায় অফিসে নিয়ে গেলো। বুড়ো ইটালিয়ান সার্জেন্টটি তার রাইটিং ডেস্কে বসেছিলো। বললো: আজ বিকেলে আপনাকে বেনগাজী যেতে হবে এই নির্দেশ পেয়েছি।

কিন্তু আমি জানতে চাই আমায় জেলে দেয়া হয়েছে কেন?

আমি তার কিছুই জানিনে। আমি শুধু আদেশ পাই–তা আপনার জানা উচিত।

অন্যায় কিছুই করেছি বলে তো জানিনে।

তাহলে সব সময় আপনি আরবদের মহল্লায় কাটাতেন কেন? আর মসজিদেই বা যেতেন কেন?

এতে অপরাধ কি?

আপনার জানা উচিত যে, এখানে যুদ্ধ চলছে।

সে একটা ওয়ারেন্টে আবার আমার নাম লিখলো।

সার্জেন্ট প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গেলো। আমায় পুনরায় নেওয়া হলো সেলে। দশ মিনিটের মধ্যে একটি আরব প্রহরী আমার দরজা খুলে বললো যে, আমি বাইরে গিয়ে দুপুর পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারি। ডের্নার চারজন বন্দীর প্রতি সকলেই, এমন কি আরব প্রহরীরা পর্যন্ত সম্মান দেখায়। ইউনিফরম পরিহিত প্রহরীকে অশীতিপর বৃদ্ধের হস্ত চুম্বন করতে দেখলাম।

ডের্নার একজন প্রহরীকে আমি চিনতাম–খুব ভালো লোক। এঁদের কষ্ট দেখে তার চোখে অশ্রু দেখা দিলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম: ওঁরা কি করেছেন?

ইটালিয়ানদের আইন বড় খারাপ। তাঁদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা সেনৌসী বংশের লোক, এই-ই যথেষ্ট।

এর জন্য কি এদের মৃত্যুদণ্ড হবে?

না, তা নাও হতে পারে। বেনগাজীতে কড়া পাহারায় তঁদের বন্দী করে রাখা হবে।

তাঁরা কি বেনগাজী যাবেন? আমাকেও আজ বিকেলে সেখানে যেতে হবে।

তাহলে আপনারা এক সঙ্গে যাবেন। আমি এখনও নির্দেশ পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, আজ বিকেলেই জাহাজ ছাড়বে। তবরুক থেকে কয়েদী নিয়ে তা আসছে।

তাদের আচরণ তোমার পসন্দ না হলেও তুমি কি করে এই ইটালিয়ানদের চাকরি করছো?

মুসলিম বন্দীদের তদারক করা ইরিত্রিয়ানদের চেয়ে মুসলিমের দ্বারা কি আপনি ভালো মনে করেন না? ইটালিয়ানরা কাছে না থাকলে দেখতে পারি বন্দীরা যাতে ভালোভাবে সময় কাটাতে পারে।

এখানে কতোজন বন্দী আছে?

মাত্র ষোলজন। বারোজন রাজনৈতিক বন্দী আর বাকী চারজন সাধারণ কয়েদী। কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী বেনগাজী যাচ্ছে। তাদের মধ্যে আপনি আর ছ'জন পার্বত্য বেদুইন।

তখন বুঝতে পারলাম যে আমি রাজনৈতিক বন্দী।

সে বললো: একজন প্রহরী বলেছে যে, আপনি আহমর মোখতারকে দেখেছেন।

ওরা তাই বলে নাকি? আমি তাঁকে কখনো দেখি নাই।

কিন্তু আল-মাহাফদিয়াকে দেখেছেন।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

দেখুন কি হয়। তারা আপনাকে গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করতে চায়।

হঠাৎ কাকে যেন কুরআন পড়তে শুনতে পেলাম। বললাম: কুরআন পড়ছে কে?

আমার সঙ্গে আসুন, তাহলে নিজেই দেখতে পাবেন। সে আমায় আঙ্গিনার শেষ প্রান্তে নিয়ে গেলো। একটা সেল থেকে পড়ার শব্দ আসছে। আমি ভিতরে তাকালাম। মেজের উপর বসে আছে দু'জন আরব। তাদের বস্ত্র ছিন্ন, পা খালি; কিন্তু তাদের চেহারা সুন্দর ও তেজোদীপ্ত। তাদেরই একজন কুরআন পড়ছে।

প্রহরী বললো: এরা আল-মাহাফদিয়ার লোক।

তাদের মুখে শান্ত ভাব দেখে তারা যে জেলে আছে তা যেনো মনেই হচ্ছে না। এদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে। কালই হয়তো তাদের গুলী করে হত্যা করা হবে। কারণ তারা বিদ্রোহী।

কিন্তু এরা তো বিদ্রোহী নয়।

ওদের চেহারা দেখে চিন্তাও করা যায় না যে, ওরা মৃত্যুর দ্বারদেশে উপস্থিত। এরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করে না। দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুকে এরা শ্রেয় মনে করে।

সেই মোটা প্রহরীটা আমাদের নিকট এসে বললো: আমি শুনেছি আপনি আল-মাহাফদিয়াদের চিনেন। আপনি তাদের কাছে গিয়ে আলাপ করতে চান কি?

তা চাই, কিন্তু তা কি ভালো হবে?

সেজন্য চিন্তা করবেন না। সার্জেন্ট প্রাতঃভ্রমণে গেছে। তার আসার আগেই আপনি চলে আসতে পারবেন।

সে সেলের দরজা খুলে দিলো। আমি ভিতরে ঢুকলাম। আমার পরিধানে আরব পোশাক। আমায় দেখে তারা আশ্চর্য হলো। মরক্কোর পোশাক বোধ হয় পূর্বে ওরা আর দেখে নাই। পাঠরত লোকটা পড়া বন্ধ করলো।

প্রহরী তাদের কাছে গিয়ে বললো: ইনি একজন নতুন বন্দী। ইনি আল-মাহাফদিয়াদের দেখেছেন বলেই ওঁকে জেলে দেয়া হয়েছে। ইনি আরবদের বন্ধু।

আমি বললাম: বাস্তবিকই আমি আরবদের বন্ধু। আমি যতোই তাদের দেখছি, ততোই তাদের সঙ্গে আমার অধিকতর বন্ধুত্ব হচ্ছে।

প্রহরী বললো: ইনি একজন মুসলিম।

তা'হলে আল্লাহ আপনাকে শীঘ্র মুক্ত করুন–তারা বললো।

আমার চোখে পানি এলো। এসব লোক তাদের নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে ভাবে না মোটেই। তারা আমার মঙ্গল চায়। এই সমস্ত লোকের সম্বন্ধেই ইটালিয়ানদের কাছে শুনেছি যে, এরা বোবা পশুর মতো মৃত্যুবরণ করে। ভালো করেই বুঝতে পারলাম, এই সব লোকের আত্মার পরিচয় ইটালিয়ানরা পায় নাই। এদের উপর ওরা প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়।

যে জাহাজে করে আমাদের ডের্না থেকে পাঠানো হয়েছিলো অবশেষে একদিন সকালে তা বেনগাজী এসে পৌঁছলো।

খাঁচার ভিতর থেকে আমাদের বের করে ডেকে আনা হলো। জাহাজটি বন্দরের মাঝখানে নোঙর করেছিলো। কৌতূহলী দর্শকের ভিড় এড়াবার জন্য তা করা হয়নি। কারণ মুসলমানগণ এর কাছেও আসে না। আর যেসব ইটালীয় যুবক এই সমস্ত নির্বাসিত বন্দীর একমাত্র কৌতূহলী দর্শক তাদের কাছে এ সব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার বৈচিত্র্যহীন হয়ে উঠেছে। এতে তারা তেমন উৎসাহবোধ করে না। গরু-ছাগলের মতো আমাদের তাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করা হলো। সেখানেই উত্তপ্ত রৌদ্রে আমাদের দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। রাইফেলধারী ইরিত্রিয়ান সৈনিকরা আমাদের চারদিকে ঘিরে রাখলো। পালাবার চিন্তাও এ অবস্থায় কেউ করতে পারে না।

শৃংখলিত অবস্থায় দড়ির মই দিয়ে আমরা জাহাজ থেকে একটা নৌকায় নামলাম। সেই নৌকায় করে আমাদের তীরে আনা হলো। পা ফস্‌কে যদি আমাদের কেউ পড়ে যেতাম, তাহলে সেই একজনের সঙ্গে আমাদের সকলকেই পানিতে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে হতো।

তীরে লোহার তারে ঘেরা দু'টি বড় মোটর লরী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আর একটা লরীতে মেশিনগান সজ্জিত। আমাদের দু'ভাগে ভাগ করা হলো। লাথি আর ধাক্কা মেরে মেরে আমাদের লরীতে উঠানো হলো। পরে আমাদের পাঠানো হলো জেলে।

শহরের কিছু দূরে জেলখানাটি অবস্থিত। তার চারটি গম্বুজ–দেখতে ঠিক মধ্যযুগীয়। প্রত্যেকটি গম্বুজে মেশিনগানসহ একজন সান্ত্রী। লোহার মস্ত বড় ফটক খুলে গেলো। লরী তিনটি জেল প্রাঙ্গণে ঢুকলো। আমাদের নামিয়ে তল্লাশ করা হলো। পরে আর একটা প্রাঙ্গণে আনা হলো। সে প্রাঙ্গণটি কয়েদীতে ছিলো ভর্তি। আমাদের সকলকেই একটা বড় সেলে রাখা হলো এবং শোবার জন্য প্রত্যেককে দেয়া হলো একটা করে মাদুর। সেদিনের মতো একটা করে শুকনা রুটি আর সামান্য ঝোল আমাদের খেতে দেয়া হলো।

আমাদের সেলের দরজা খুলে রাখা হলো। প্রাঙ্গণে আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি। এখানে রাজনৈতিক আর সাধারণ কয়েদী এক সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায়। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায় সকলেই শিক্ষিত আরব। ইটালিয়ানরা এদের অত্যন্ত ভয় করে। কারণ অজ্ঞ জনতাকে যেখানে সেখানে সহজেই শায়েস্তা করা চলে, কিন্তু ভয় শিক্ষিতদের নিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে আমি যুবক শিক্ষকটির সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি বললেন যে, ডের্নার এক স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রদের কোনো কিছু জানতে দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাদেরে কিছুই জানতে দেয়া হয় না। পাঠ্য-পুস্তকে এখন তাদের পড়তে হয়– "পূর্বে এদেশে বর্বর এবং অসভ্য লোক বাস করতো, কিন্তু বর্তমানে রোমানরা আবার ফিরে এসেছে।"

আঠারো বছর বয়সে সে শিক্ষকতার কাজ পায়। কারণ বয়স্ক শিক্ষিত প্রার্থীরা হয় গ্রেফতার হয়েছে, নয়তো তাদেরে দেশ থেকে অজ্ঞাত স্থানে নির্বাসিত করা হয়েছে।

তিনটার সময় ইটালিয়ান জেলার আমাদের সেলে ঢোকাবার আদেশ দিলো। সেলটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু সিলিং-এর নীচে একটি মাত্র ছোট জানালা। আমরা সেলে ঢুকতেই বৃদ্ধ লোকটি আমাদের নামায পড়তে ডাকলেন। নামাযের পর তিনি বললেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং সৎপথে চালিত করবার জন্য। দয়ালু ও বিচারক আল্লাহর কাছে আমরা নিবেদন জানাচ্ছি–আমরা আমাদের নিজেদের কোনো অপরাধের জন্য এখানে আসি

নাই–তা দেখবার জন্য। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের হৃদয় পরিষ্কার করবার জন্য এবং প্রকৃত আত্মনিবেদনের জন্য–কারণ, তাই হচ্ছে প্রকৃত মহত্ত্ব। এবং এটাই আমাদের স্রষ্টার নিকট পৌঁছে দেয়। আমরা যখন তাঁর সত্তা অনুভব করি তখন আমাদের কোনো অমঙ্গলই হতে পারে না। তারপর তিনি একটা সূরা আবৃত্তি করলেন।

প্রার্থনা শেষ হওয়া মাত্র দরজা খুলে গেলো। জেলার ভিতরে ঢুকে আমার কাছে এসে বললো: আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

আবার আমি এখানে ফিরে আসবো তো?

তা আমি জানি না। বলে চাবির গুচ্ছ ঘুরিয়ে বললো: জলদি!

আমাকে নিয়ে সে প্রথম প্রাঙ্গণে এলো। সেখানে এসেই বেনগাজীতে যে ডিটেকটিভের সঙ্গে ইটালিয়ান ভাষা না-জানার জন্য প্রথমদিন বচসা হয়েছিলো, তাকে দেখতে পেলাম। তার মুখে বিজয়ের হাসি। বললো: ন্যাকা সেজে আর লাভ নেই সাহেব। ফ্যাসিস্ট ইটালীতে গুপ্তচরবৃত্তি করতে এসে শাস্তি না পেয়ে কেউ থাকতে পারে না।

লোহার একটা সরু শিকল দিয়ে সে আমার হাত দুটি বাঁধলো। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। তাতেই উঠলাম। আমাকে পাবলিক প্রসিকিউটরের কাছে আনা হলো। দু'ঘণ্টা ধরে আমায় জেরা করা হলো।

আমি আমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করলাম। আমি যে গুপ্তচর নই, লিবিয়া সীমান্ত অতিক্রম করার পর থেকে যা যা ঘটেছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

জেরা শেষ হলে আমি প্রসিকিউটরকে জিজ্ঞেস করলাম: আমার আমেরিকান বন্ধু টারবক্স কোথায়?

তিনি হেসে বললেন: আপনার গ্রেফতারের জন্য আপনার তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। আমরা তাকে জেরা করেছিলাম। তিনি বললেন যে, আপনি মুসলিম এবং আরবী বলতে পারেন। তারপরই আপনার সঙ্গে কথা বলবার প্রয়োজন হলো।

বেশ, কিন্তু আমার গ্রেফতারের জন্য আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি অন্যায় কিছুই করি নাই। আরবদের জীবন সম্বন্ধে জানায় কোনো অন্যায় আছে বলে আমি জানি না। আমি শুধু মিসর যেতে চেয়েছিলাম।

বর্তমানে আবার জেলেই ফিরে যেতে হবে।

টারবক্সের সঙ্গে আলাপ করবার অনুমতি আমায় দিতে পারেন কি?

আবার আমায় জেলে ফিরিয়ে আনা হলো। আরো তিন দিন আমায় সেখানে থাকতে হয়। ২৩ জুন আবার আমায় প্রসিকিউটরের কাছে আনা হলো। তিনি বললেন: এবার আপনি মুক্ত।

কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না। জিজ্ঞেস করলাম: কেন?

আপনি যে গুপ্তচর নন তা আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি। আপনার গ্রেফতারের জন্য টারবক্সকে ধন্যবাদ দিতে পারেন। আমার মনে হয় তখন তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না।

ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যজনক বলে মনে হলো। কালবিলম্ব না করে এলবারগো ইটালিয়ায় গেলাম। সিনর মেলভিসিনি আমায় বললেন যে, আগের দিন টারবক্স ইটালী চলে গেছেন। টারবক্সের প্রতি আমার খুব রাগ হলো। আকস্মিকভাবে এই দুর্বোধ্য রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেলো। সিনর গ্রেকোর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন: আপনার বন্ধু গত শুক্রবার দিন এখানে ছিলেন। আপনার মুক্তির আগের দিন তিনি চলে গেছেন। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এজন্য যে আপনার সঙ্গে যাতে তার আর দেখা হবার সুযোগ না ঘটে।

আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বললাম। তাতে তিনি বললেন: আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, আপনার বন্ধু আপনার বিরুদ্ধে কিছু করেন নাই। শুক্রবার দিন তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। আপনার কথা বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন যে, তিনি বুঝতে পারেন নাই ইটালিয়ানরা কেন আপনাকে গ্রেফতার করেছে। এবং এও তিনি বুঝতে পারেন যে, আপনার সঙ্গে তিনি যাতে কোনোরূপ আলাপ করতে না পারেন সেজন্য তাকে ইটালী পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু ওরা আমায় গ্রেফতার করলো কেন?

তা বলতে পারি না। তবে একথা নিশ্চিত যে, একদিন এই রহস্য আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

সেই রহস্য নিয়েই আবার আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

ইফা- ২০০৯-২০১০- প্র ৫৬৮৭/(উ)-৩২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান